চক্র

MOHIRY PUBLIC LIBRARY
সাধারণ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিক, ১৩৫২

—সাড়ে চার টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকালীশঙ্কর বাক্‌চি, এম, এস-সি, কর্তৃক ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস (পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং লিঃ) ৩৮এ, মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

হে আমার শৈশবের সুখময় দিবারাতি !
অম্লান তারকা সম তোদের বিমল ভাতি,
আজিও এ প্রাণ মন রহিয়াছে উজলিয়া।
স্মরণে আসিয়া আজও উঠে চিত উথলিয়া॥
স্নেহময় পিতামহ দেব-দেবী পিতামাতা,
ত্রিজগতে অতুলনা ; দিদির স্নেহের গাথা,
কচি ভাই বোনেদের হাসিভরা চাঁদ-মুখ,
আজিও স্মরণে ভাসে, সুখে ভরে ওঠে বুক।
আজ সবই একে একে আমারে ছাড়িয়া যায় ;
আজ শুধু প্রাণভরা হাহাকার হায় হায়॥
দুঃখের তমিস্রা মাঝে তুই তড়িতের আলো।
তাই আজ সব চেয়ে তোরেই বেসেছি ভাল॥
হে মোর সুখের দিন !—হে মোর সুখের স্মৃতি !
তোদেরই স্মরণে আজি ঢালিনু প্রাণের প্রীতি॥

"চক্র" ১৩২৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার পর দৈববিড়ম্বনায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; সেজন্য আমার স্নেহাস্পদ ভারতী-সম্পাদকদ্বয়ের নিকট আমি অপরাধী হইয়া আছি; কিন্তু এতদিন পরে আবার খাপ্‌ছাড়াভাবে দেখা দিলেও পাঠকবর্গ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারাই সম্ভব বোধে ইহাকে একেবারেই পুস্তকাকারে ছাপাইতে বাধ্য হইলাম।

চক্রের প্রথম অংশটুকু পাঠে কৌতূহলী হইয়া যাঁহারা ইহা শেষ করিবার জন্য অনুরোধ বা অনুযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইলেই আমি সুখী হইব। ইতি—

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৯। অনুরূপা দেবী

চক্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় এক বালকের সঙ্গে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রী ডাকিলেন, "বৌমা! অ বৌমা।" তাঁহার সে উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতা বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল।

শীলেদের প্রকাণ্ড চক-মিলানো বাড়ী—অন্দর-মহলের দ্বিতলের বারান্দার মোটা মোটা জোড়া থামের পাশে কাঠের রেলিং ধরিয়া একটি নবম-বর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়াছিল। বাটীর গৃহিণীর ডাক শুনিয়া সে মেয়েটি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পরিহিত পাঁচপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীর প্রান্তটুকু তাহার মাথার খাটো চুলের উপর ঢাকা ছিল, তাহা সেইরূপই রহিল, আর বেশী বাড়িল না। বালিকার ক্ষুদ্র ললাট ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত হইল, সে তীব্র চঞ্চল নেত্রে শাশুড়ীর সমভিব্যাহারী বালকের পানে বারেক কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

"আজ আবার তুমি বিনুর গায়ে হাত তুলেছ? দেখ দেখি, বাছার মুখখানা আঁচড়ে পিঁচড়ে কি করে দিয়েছ! ছি ছি ছি! তোমায় যত বলি, যত শেখাই, কিছুতেই কি তুমি কিছু শিখ্‌বে না বাছা? এমন কর্‌লে আমি তোমায় কি করে পেরে উঠ্‌বো!"

তিরস্কৃতা বধূমাতা বারেক তাচ্ছল্য-ভরে স্বামীর মুখের উপর নিজের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিয়া লইল। সদ্য নখক্ষত তখনও রক্ত-সরস রহিয়াছে; দেখিয়া সে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না, বরং তীব্র রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে কহিল, "আহা গো! আমিই যেন শুধু ঐ রকম দিয়েছি, ওঁর কচি খোকা ছেলেটি যেন কিছুই করেন নি! এই দেখ না, আমার পিঠে বুকে খামচে ছাল তুলে নিয়েছে কে,—কে? এই বলিয়া সে সত্য সত্যই এমন এক প্রমাণ বাহির করিয়া দেখাইল, যাহার পর বিচারককে বিচারের রায় উল্টাইয়া দিতেই হয়।

"হ্যাঁরে হতভাগা! তুইও তো ওকে কম শাস্তিটা দিস্‌নি। দেখ দেখি, কি করেছিস্, খুনে কোথাকার!"

মাতার সহানুভূতি পাইয়া পুত্র এতক্ষণ রোরুদ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল, এখন মায়ের সহানুভূতির গতি সহসা পরিবর্ত্তিত দেখিয়া নিজের দিক্‌টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়া সে বলিল, "ও যে আমায় আগে মেরেছে, তার বেলায়—?"

"মিথ্যুক! মিথ্যুক! আমি আগে মেরেচি! না মা! ওর সব মিথ্যে কথা! তুমি শুনো না।—ও আগে আমার চুল ধরে টেনেছিল,—এমন জোরে টেনেছিল,—যে, আর একটু হলেই আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।"

"ইস্! চুল ধরে টান্‌লে, নাকি আবার কেউ মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যায়। মুখ থুব্‌ড়ে যে পড়ে, সে তো ধাক্কা খেলে! শুন্‌চো মা! কার কথা মিথ্যে—নিজের কানেই তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ তো!

তা আমি তো আর খুব জোরে চুল ধরে টানি নি,—ও কেন আমার মুখে অত জোরে আঁচড়ে দিলে? উঃ! যা জ্বালা করুচে” বলিয়া বালক আহত স্থানে হাত বুলাইল।

ইহা দেখিয়া মা বলিলেন, “সত্যি বাছা! তুমি একেবারে মুখখানায় আর কিছু পদার্থ রাখো নি। মেয়েমানুষের অত দস্যিপনা কেন?”

বধূ এইবার কান্নায় ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সগর্জ্জনে উত্তর দিল, “ও তোমার আপনার ছেলেটি কি না, তুমি তো ওর দিক টানবেই! ও যখন আমার চুল ধরে টান্‌লে তখন বুঝি কিছু দোষ হোল না?—হ্যাঁ, যত দোষ সব আমার বেলায়।”

“তুই কেন আমার কলম ভেঙ্গে দিলি, রাক্ষুসি?”

“খুব করেছি দিয়েছি—কেন দোব না? তুই আমার কাপড় ছিঁড়ে দিস্‌নি?—হ্যাঁ, এতক্ষণ মাকে সে কথা বলিনি বলে,—না? এই দেখ না মা! আমার কাপড় শুকোচ্ছিল, এই থেকে কতখানি ছিঁড়ে নিয়ে কালি মোছা হয়েছে,—তাই তো আমি কলম ভেঙ্গে দিয়েছি! বেশ করেছি—আবার দেখ্‌তে পেলেই দেব।”

‘আমিও তো তাই চুল ধরে টেনেছি—এবার এমন চুপি চুপি পেছন থেকে এক টান দেব সুবিধে পেলেই যে, ধপাস্ করে পড়ে সখের সব চুড়িগুলি মুড়্‌মুড়্ করে ভেঙ্গে যাবে। দেখ্‌বে তখন মজা!”

“তবে আমিই বা মার্‌বো না কেন?”

“মা! আমিও কিন্তু বলে রাখ্‌চি, এবার ওর যত কাপড় আছে, সব আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রেখে দেবো, ওর চুল কেটে নেব, ওর পিঠের চামড়া বেতের বাড়ি তুলে নেব, তবে আমার নাম—।” এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ঠাকুরাণীর সেই বিনয়-নামধারী পুত্রটি মহাবেগে বোধ করি বেত্রান্বেষণেই প্রস্থান করিল। তখন অপর-পক্ষও মহা আস্ফালনে আততায়ীর বিরুদ্ধে কিরূপে শোধ তোলা যাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থায় জিহ্বায় একেবারে মা সরস্বতীর বৈঠক বসাইয়া দিল। সে তাহার বইয়ে আগুন ধরাইয়া দিবে, ঘুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত ভাঙ্গিয়া আরও কত কি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মাষ্টারের নিকট মার খাওয়াইয়া যে নিজের নাম রক্ষা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃহিণী আর কি করিবেন? তিনি অগত্যাই একটু হাসিয়া “দুটোই সমান জুটেচে!”—বলিয়া বধূর দিকে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, “আয় পাগলি, আয়। আমার পাকা-চুল তুলে দিবি, আয়।”

“হ্যাঃ আমি দিলুম তো! কেন আমি তোমার পাকাচুল তুলে দেব? তুমি কি আমার মা? তুমি যার মা, তাকে তোমার চুল তুলে দিতে বলোগে না, সে দেবে এখন! আমি আমার বাবার চুল তুলে দেব, তোমার তো দেব না,—তুমি ভারী একচোখি!”

“হারামজাদির মুখ দেখ! কি একচোখোমি করেছি রে ক্ষ্যাপার বেটি? নে, আয়, এখুনি আবার দুটোতে লেগে যাবে একদণ্ড যে চোখ বুজে শোব, সে তো হবার যোটি নেই! কাল থেকে দুটোকে দু’ঘরে দোর বন্ধ করে রেখে দিয়ে তবে নিজে শোব। দাঁড়া না।”

“আমি কাল ভাত খেয়েই সইমাদের বাড়ী পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো, তুমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে পা টিপে-টিপে না এসে—”

"আচ্ছা, এখন তো আর নয়,—সে তখন যা হয় করিস্। কি মেয়েই যে তুই হয়েছিস্, ঊর্ম্মিলা! লোকে কি বল্‌বে, বল্ দেখি? লোকেদের বউরা কেমন শান্ত লক্ষ্মী, আর তুই দিন দিন যেন ধিঙ্গি হচ্ছিস্!"

"বেশ কর্‌চি, ধিঙ্গি হচ্ছি তো হচ্ছি! তুমি ওদের লক্ষ্মী-বউ একটা চেয়ে নাও না বাবু, এতই যদি ভাল লেগে থাকে। আমায় না হয় দূর করে তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে।"

"বালাই! ষাট্!"—বলিয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী হাসিতে লাগিলেন। বধূর ধিঙ্গিপদ-প্রাপ্তির আসল হেতুই যে ঐ সর্ব্ব-অপরাধ-সমর্থনকারী সর্ব্বনেশে হাসিটুকুই, এটুকু জানা থাকিলেও ইহাকে পরিহার করিতে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। বালিকা বধূর তাই এত প্রশ্রয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রে শয়ন-মন্দিরে মায়ের দুই পাশ দুই জনে অধিকার করিয়া শুইত। সে রাত্রেও তাই হইল। বিনয় মায়ের গলা জড়াইয়া মাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, ঊর্ম্মিলাও তদনুকরণ করিতে যাওয়ায় সে তাহার হাতটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার, আমার মার গায়ে হাত দিস্‌নে, দিলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।"

ঊর্ম্মিলা এ শাসনে অভ্যস্ত; সে নির্ভয়ে উত্তর দিল, "ইস্, ওঁর একলার মা কি না!"

একলার না তো কি? তুইই তো তখন বলেছিস্, আমি মার আপনার ছেলে—তা' হলেই হলো না, মা তোর পর?"

"হ্যাঁ, হলো বই কি! কক্ষনো হলো না,—হ্যাঁ মা, হলো না? তুমি ওর একলার মা, মা? আমার মা নও?"

জগদ্ধাত্রী বধূকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "নাঃ, কে বলে,—আমি তোদের দুজনকারই মা।"

"শুন্‌তে পেলে! মা তুমি কা'কে বেশী ভালবাস মা?"

মা পুনরায় সেই রকম পরম পরিতুষ্ট স্নেহের হাসি হাসিলেন, উত্তর দিলেন—

"দুজনকেই সমান ভালবাসি রে।"

বিনয় সদম্ভে কহিল, "উঁহুঃ, তোমার মনে নেই মা, তুমি আমাকেই ওর চাইতে একটুখানি বেশী ভালবাস। সেই যে আমার অসুখের সময় তুমি দিন-রাত আমার কাছে থাক্‌তে, কেবলি হরিকে ডাক্‌তে—ওর কাছে শুতে না, আমি ভাল হলে কত সন্দেশ বাতাসা হরির লুট দিয়েছিলে!"

মা শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু অংশীদারটি এ অপমান সহ্য করিল না, সেও তেমনি আগ্রহে আর একটি উদাহরণ বাহির করিল।

"আমার পান-বসন্তর সময় ডাক্তারবাবু মাকে আমার কাছে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, মা কি তা শুনেছিল? তোমার তো শুধু জ্বর, সে তো দোষের নয়, আমার কাছে তবু মা দিনরাত থাক্‌তেন, থাক্‌তে না তুমি, মা?"

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "তা থাক্‌বো না বাছা, তোমার মা বাপ কেউ কাছে নেই,—আমিই তো এখন তোমার মা। সে মা যা কর্‌তো, আমি কি তা না করে থাক্‌তে পারি!

উঃ, যা অসুখ করেছিল—পোয়াতির বাছাকে যে শীতলা, শেতল করে দিয়েছেন, এই আমার মহাভাগ্যি!"

জননী কৃতজ্ঞতা-গদ্‌গদস্বরে এই বলিয়া সেই রক্ষাকারিণী দেবীর উদ্দেশে দুই হাত্ যোড় করিয়া নিজের ললাট স্পর্শ করিলেন। তা দেখিয়া তাঁহার এই দুটি সন্তানও তাঁহার অনুকরণ করিল এবং এই আকস্মিক দেব-ভক্তির অতর্কিত আবির্ভাবে উভয়ের চিত্তেই কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একটা যেন শান্তিরসের প্রবাহ বহিয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরকে হঠাইতে পারা সম্ভব নয় দেখিয়াই হৌক, অথবা যে জন্যই হৌক, একটা মধ্য পথ অবলম্বন করিল। বিনয় কহিল, "আয় তবে আজকের মত দুজনে ভাব করি—বল্ ডাব—"

"ডাব।"

তোর সঙ্গে আমার ভাব। মা! এবার একটা গল্প বলো না?"

'ভাবে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই। ঝগড়া চলিলে গল্প শোনায় বাধা পড়ে। তা এমন ঝগড়া ও ভাব তাহাদের এই বিবাহিত দুইটি বৎসর ব্যাপিয়া নিত্যই চলিতেছে। কতবারই গাড়ী ডাকিয়া আড়ি হয়।—কতবারই ডাব আনিয়া ভাব হইয়া যায়। তা তাহারা তো দুটি কচি ছেলে,—সমস্ত সংসারই তো এইরূপ সন্ধি-বিচ্ছেদ মিলন-বিরহান্তক!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিপিনবিহারী শীল দেশের মধ্যে একজন বিশেষ গণ্য-মান্য বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার চালানী ও তেজারতির মস্ত কারবার। তা ছাড়া সামান্য কয়েকখানি তালুক ইত্যাদিও আছে? ঘরে ছেলেদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ পিতার ন্যায় তিনিও ছেলেদের স্কুল কলেজে লেখাপড়া শেখানোর পক্ষপাতী হইয়া পড়ায়, বড় ছেলেটি প্রথমে কলিকাতা-বাসী হয় এবং পরে পিতার বিনানুমতিতে বিলাত পর্য্যন্ত পলাইয়া গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আর ফিরিয়া আইসে নাই। বিলাতেই প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। টাকাকড়ির নিতান্ত অনাটন হইলে পত্র আইসে এবং রাগ ঙ্কার করিয়াও পিতা তাহার খরচপত্র প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে চালাইয়া দেন। বিদেশে থাকিয়া যে সদভ্যাসটি তিনি করিয়াছেন, নিজের উপার্জ্জনে তাহারই খরচ আঁটে না। তাহার উপরে একটী বিলাতী স্ত্রী।

ছোট ছেলে বিনয়কুমারের উপর আশা ভরসা ইঁহাদের কোনদিনই বেশী ছিল না, এখন ত আরও একটু কমিয়াছে। বড় ছেলে অজয়কুমার বিলাতে বসিয়াই জনৈক মালবার-শোণিত-মিশ্রিত ইউরেশিয় কন্যা বিবাহ করিয়া বসিলে, দশ বৎসরের ছোট ছেলে বিনয়কুমারের এখানে এক সাত বৎসরের স্ব-ঘরের মেয়ের সহিত শুভ-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত নায়ক-নায়িকাই এই শুভ-বিবাহে সম্বদ্ধ দম্পতী-যুগল, বিনয়কুমার ও উর্ম্মিলা। এক্ষণে ইহাদের বয়স বৎসর কতক করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; তবে স্বভাবটা ঠিক তেমনই আছে।

দশটা বাজিলে স্নান সারিতে বাটীর মধ্যে আসা বিপিনবিহারীর চিরন্তন নিয়ম। তা ঘড়িতে সেই দশটা বাজিতে না বাজিতেই পুত্রবধূ উর্ম্মিলাসুন্দরী সেই বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে দর্শন দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "ওগো বাবা! আজ কি তোমার চান কর্‌বার সময় হবে না, নাকি গো?"

এই রকম সে প্রায়ই ডাকিতে আসে। বারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বিপিনবাবু তখন চোখের উপর চশমা লাগাইয়া কি সব কতকগুলো পুরাতন হিসাবের কাগজ-পত্র-পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; সাম্‌নে এক তাড়া খেরো-বাঁধা খাতাপত্র বিছাইয়া তেজারতির গোমস্তা বসিয়া; বধূঠাকুরাণীর সশব্দ আগমন ও সদর্প আহ্বান-শব্দে কুণ্ঠিত হইয়া সে বেচারী মাথাটা একটু হেঁট্ করিল। চব্বিশ-ঘণ্টাই শুনিয়া শুনিয়া কর্ত্তার অভ্যাস, তাই এ ডাক তাঁহার কানে পশিলেও মনে পৌঁছিল না। তিনি দুইটা সই ঠিক এক রকম দেখাইতেছে কি না, একমনে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইতে লাগিলেন।

"বাবা! বলি, ও বাবা, ডাক্‌চি, তা কথা কইছো না যে বড়? শুন্‌তে পাচ্ছনা, না'কি?"

"বিপিনবাবু অর্দ্ধ-অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ? কিরে পাগ্‌লি?"

"মা—গো! এতক্ষণ পরে বলা হলো কি না,—কিরে পাগ্‌লি! চান-টান কর্‌তে হবে না বুঝি আজ?"

"হ্যাঁরে, হবে বই কি। এই যে যাই।"

জবাব দিয়া বৃদ্ধ যথাকার্য্যেই ডুবিয়া রহিলেন। তখন উর্ম্মিলা বিশেষ রাগিয়াছে, সে দরজায় ধাক্কা দিয়া একটা চমকপ্রদ শব্দ করিয়া সরোষ-গর্জ্জনে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবারে বাবা! ছেলে যেন এক্‌জামিনের পড়া পড়্‌চেন! এই চল্‌লুম্ আমি, থাকো তুমি তোমার বই নিয়ে বসে।"

বিপিনবাবু তটস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ খাতাপত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৎর্সিত বালকের মত করুণ-কণ্ঠে প্রস্থানোদ্যতা বালিকা বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, "ওরে না রে না, যাস্‌নি, যাস্‌নি—এই যে আমি উঠেছিরে! ওহে গোষ্ঠ! তুমি ওসব এখন তুলে টুলে রেখে দাও। এরপর এক সময় ওসব নিয়ে আবার বসা যাবে এখন, এখন আর হচ্চে না, আমার ছোট্ট-মা-টী এখন বেজায় ক্ষেপেছে।"

উর্ম্মিলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে শ্বশুরের মন্তব্যটুকু কানে ঢুকিতেই সদ্যঃস্নাত স্কন্ধবিলম্বী ভিজা চুলের রাশি নাড়া দিয়া ঝাঁকিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আবার বলা হচ্চে,—ক্ষেপেছে! ক্ষেপ্‌বে না তো কি? সেই কখন্ থেকে ডাকাডাকি করে গলা ফাটাচ্চি—বল তো রাগ হয় না বুঝি?"

বিপিনবিহারী চটি-জুতা দুইটার মধ্যে পা গলাইতে গলাইতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আয় তো দেখি, গলাটা কতখানি ফাট্‌লো? কৈ, কোথাও দেখ্‌তে পাচ্চি না তো!" এই বলিয়া হাসি-হাসি-মুখে সমীপবর্ত্তিনী বধূর কণ্ঠমালা-পরা কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং অল্প একটু মাথা নাড়িয়া যেন আত্মগতভাবেই কহিলেন, "হায় রে, ও শানায়ে গলা না কি আবার ফাট্‌বে!"—মন্তব্য শুনিয়া উর্ম্মিলা খিল্ খিল্ করিয়া এবং বৃদ্ধ গোমস্তা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল।

উর্ম্মিলা শ্বশুরের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, "যাও, তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছ। অমন করে কথা বলো ত তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, তা কিন্তু বলে রাখ্‌চি।"

"তা হলে আমি যদি বসে বসে কাঁদি?" বিপিনবিহারী ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। উর্ম্মিলা শ্বশুরের হাত

ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধ-বালকটির মুখে সেই সঙ্গীন উত্তর শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং দুষ্টামি-মাখানো সমস্ত মুখখানিকে তাহার এক মুহূর্তেই গভীর করুণামণ্ডিত স্নেহে উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণনেত্র শ্বশুরের মুখে স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! বাবা! তুমি কেঁদো না। একটুও কেঁদো না। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে আড়ি করে থাক্‌তে পারি? তুমিই বল তো, পারি কি? সে বরং মার সঙ্গে হলেও হতেও পারে, তোমার সঙ্গে হবে না।"

বিপিনবিহারীর চোখের কোণগুলা হঠাৎ যেন সত্যকার বালকের মতই তাঁহার এই ক্ষুদ্র মায়ের এই সান্ত্বনা-স্নেহ-প্রকাশে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনিও নিবিড় স্নেহভরে ভিন্ন নীড়ের ক্ষুদ্র পাখীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের উপর নত হইয়া চুম্বন করিলেন; তারপর মমতামথিত মৃদুকণ্ঠে কেবল মাত্র কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন, "তুমি যে আমার মা!"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে বাটীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাবুকে আসিতে দেখিয়া চাকর মধু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তেলের বাটি ও তেলধুতি-হাতে ছুটিয়া আসিল। তখন শীতকাল, রৌদ্রে সেবিত বারান্দায় ছোট একটী পাটি পাতিয়া তেল মাখা বিপিনবাবুর নিয়ম। গড়গড়ায় তামাক সাজা ছিল, আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আগুন ঈষৎ নিষ্প্রভ। ঊর্ম্মিলা সেদিকে বারেক চাহিয়াই মধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ও তামাক সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা, তুই শীগ্‌গির এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বাবুকে তেল মাখাই।"

বলিয়া তেলের বাটি টানিয়া লইয়া শ্বশুরের পায়ের খানিকটায় সে তেল মাখাইয়া দিল। মধু কি বলিতে যাইতেছিল, ঊর্ম্মিলা বাম হাত নাড়া দিয়া অপ্রসন্ন-স্বরে বলিল, "না, ও পুড়ে গেছে তুই ভাল করে সেজে নিয়ে আয় গে'যা।—যা' বলি তাই কর্‌ দেখি!"

এই ক্ষুদ্র মনিবটীর হুকুম যে কত-বড় অলঙ্ঘ্য মধুর, মধু'র তাহা ভালরূপই জানা ছিল, সে অসন্তুষ্ট হইলেও আর দ্বিরুক্তি করিল না। কলিকাটা উঠাইয়া লইয়া অপ্রসন্নতা-ব্যঞ্জক সশব্দ চরণে চলিয়া গেল এবং ফিরিতেও যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিল।

মধু দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে শ্বশুরের নগ্ন পিঠের উপর তেলমাখা হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বধূ ডাকিল, "বাবা!"

বিপিনবাবু তখন তামাকের তৃষ্ণায় ঈষৎ বিষণ্ণ। মুখের নিকট প্রসারিত চুম্বন-প্রয়াসী আলবোলার নল মুহুর্মুহু সাদরে আহ্বান করিতেছে—অথচ প্রেয়সী প্রাণময়ী নহেন! অন্যমনস্কভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "মা!"

"সত্যি, বাবা?"

"কি মা?"

ঊর্ম্মিলা একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে বলিল, "এই যে তুমি বল্‌লে?" বিপিনবিহারী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌লুম, রে?"

"মা গো! তুমি বড্ড ভুলে যাও! "এই এখুনি বল্‌লে না?"

"হ্যাঁ, বলেছি তো রে! তবে বুড়ো হয়েছি কি না, তাই কি যে বলি, মনে থাকে না। তবে আর মা হয়ে কি হলো, যদি বুড়ো ছেলের ভুলটুলই না শুধ্‌রে দিবি!"

উর্ম্মিলা মুখের আপ্রান্ত কল্যাণময় স্নেহ-হাস্যে মণ্ডিত করিয়া জোরে জোরে পিঠের উপর তৈলাক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঐ কথা। ঐ কথাটা কি সত্যি বাবা?"

"কই, কোন্ কথা রে?"

"আঃ, বড্ড বোকা তুমি!" এই বলিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াই হঠাৎ বিনীত ও কোমল-কণ্ঠে ঈষৎ লজ্জার সহিত যেন সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "সত্যি কি আমি তোমার মা হই?"

বিপিন বাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন একবার কথা! মা হয়ে আবার বেটি বলে কি না, 'সত্যিকারের মা হই'?—মা বুঝি কারু আবার মিথ্যেকারের হয়?"

উর্ম্মিলা এই উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইল। আনন্দাতিশয্যে সে যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খুব খানিকটা তৈল লইয়া সেই স্বত্ব-সাব্যস্ত হওয়া বৃদ্ধ ছেলের সঙ্কীর্ণ পৃষ্ঠে সে চাপড়াইয়া দিল। বিপিন বাবু হাসিয়া কহিলেন, "মা গো, আবার কি আমায় তুই তেলে-রোদে শক্ত কর্‌ছিস্ মা? কত তেল ঢালছিস্, বল্ দেখি?"

তখন নিজের কীর্ত্তি চোখে পড়িতে লজ্জা পাইয়া মা-ঠাকুরাণী ছেলের সেই তৈল-সিক্ত পিঠের উপরই নিজের লজ্জিত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, এবং এই উপায়েই তাঁহার পিঠের তিনভাগ তেল বধূর মুখে মাথায় ও কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া উঁহাকে রক্ষা করিল। এদিকে ততক্ষণে তামাক সাজিয়া মধুও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন এম্‌নি করিয়াই কাটিতে লাগিল। মানুষের শরীরের মধ্যে কোথাও যদি একটা মস্তবড় ঘা থাকে ত, বাহিরে হাজার চাপা দিলেও একটু নড়া-চড়াতেই তাহাতে চাড় লাগে। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস সেটাকেও কালে সহনীয় করিয়া তোলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকটে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতারিত হইয়া বিপিনবিহারী ও জগদ্ধাত্রী মর্ম্মে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রচণ্ড একখানা ক্ষতের মতই সে আঘাতের বেদনা তাঁহাদের চিত্তে চিরসঞ্চিত হইয়াই রহিল; কিন্তু কালের প্রলেপ যে উহার দাহজ্বালা অনেকখানি প্রশমিত করিয়া দিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মুখের সুস্থভাবেই ব্যক্ত হইতেছিল। বিশেষ জগতের সর্ব্বপ্রধান শোক চিরাপগত প্রিয়তমের অভাবও মানুষ যখন সহনীয় করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন এ'তো তবু তাঁহাদের অপ্রতিবিধেয় দুঃখ নয়। ছেলে বাঁচিয়া আছে, হয় ত সে সুখেই আছে। চাই কি—এমনও আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে একদিন সে নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মা-বাপের কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিবে। অবশ্য অজয়কুমারের কোন ব্যবহারে সে আশা পূর্ণ হইবার মতই কোন লক্ষণ এ যাবৎ দেখা যায় নাই।

কয় বৎসরে বিনয় ও উর্ম্মিলার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। বিপিনবাবুকে বুড়ি করিয়া যদিও এখনও তাহাদের চোর চোর বা জলডেঙ্গাডেঙ্গি খেলা হইয়া থাকে, তবু সদরের বাগানে এখন আর সে খেলা চলে না; তাহার পরিবর্ত্তে অন্দরের সুবৃহৎ আঙ্গিনা বা ছাদ রঙ্গভূমির স্থান অধিকার করিয়াছে। কলহ-বিবাদ উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র কমে নাই বটে, তথাপি মারামারি এখন তাহাদের নিত্য-কর্ম্ম নয়, কদাচিৎ তাহা ঘটে। এদিকে উর্ম্মিলার খাটো চুল লম্বা হইয়া প্রায় পিঠ ছাড়াইয়া পড়ে, সেই চুলে আজকাল সে সোণা-বাঁধান কাচের চিরুণী গুঁজিয়া

মাথাজোড়া খোঁপা বাঁধে। তাহার সর্ব্বশরীরের অপূর্ণতা এখন দেখিতে দেখিতে বর্ষায় ঢল-নামা পাহাড়ে নদীর মত ভরিয়া উঠিতেছিল।

উর্ম্মিলার মামার বাড়ী নিকটেই,—ঘণ্টা-কয়েকে ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাস। মামাতো ভাইয়ের বিবাহে দিন-কয়েকের জন্য সে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতরের কয়েকটা ভাল ঘরের মধ্যে একটার সাজসজ্জায় আগাগোড়া পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘরখানা অব্যবহার্য্যরূপে কতকগুলা সিন্দুকবাক্সের ও ছেঁড়া গদিবালিসের গুদাম হইয়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়াছিল। হঠাৎ আজ সেখানে বেশ একটী লোভনীয় শোভনতা বিরাজ করিতেছে। উর্ম্মিলা কৌতূহলী হইয়া ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল, এবং ইহার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

তা ঘরখানায় দেখিবার জিনিষও নেহাৎ কম ছিল না। প্রশস্ত কক্ষের এক পাশে একখানা ঝক্‌ঝকে পালঙ্ক, তাহাতে একটী ধব্‌ধবে বিছানা—দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে—মসারিটা—মা এই সেদিন যেটি সেলাই করাইয়াছেন।—ওঃ ঐ মতলবে বুঝি তৈরি করা হইয়াছিল? ঘরের অপর দিকে খাটখানার ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি ঘরের মেজেয় খুব বড় গোছের একখানা আগ্রা বা লক্ষ্ণৌ জাত কার্পেট পাতা। তার কোণ চারিটায় ফুটন্ত গোলাপ এবং মধ্যস্থলে একটা সতেজ সবল আরবী ঘোড়া আঁকা। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকাইয়া সাম্‌নের এক পা তুলিয়া দৌড়িবার জন্য উদ্যত-ভঙ্গীতে অঙ্কিত হইয়াছে। এখানা সচরাচর মায়ের বিছানা-তোলা 'চালুনিতে' তোলা থাকে। কার জন্য নামানো হইয়াছে গো? এ আবার কিঁ! বাহিরের ঘরের একটা ছোট টেবিল মাথায় কালো বনাত-আঁটা, এদিকে সেদিকে সাতটা খাপখুবরি, টানা, দেরাজ, সেটাও যে আসিয়াছে।—উর্ম্মিলা চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে দেখিল, সেই টেবিলটার উপর বিনয়কুমারের সযত্ন-সঞ্চিত এবং উর্ম্মিলার বহুদিনকার বিশেষ লোভনীয় অনেকগুলি পদার্থ,—যথা, আগ্রার শ্বেতপ্রস্তরের তৈয়ারী প্রবাল কারু-খচিত কাগজ-চাপা, দোয়াতদান, কাশী হইতে শ্বশুর কর্ত্তৃক আনীত পিত্তলের দোয়াত-কলম, চুনারের ফুলদানি ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে?

"বাঃ বাঃ! ও হচ্ছে কি? দেখো, যেন আমার জিনিষপত্র সব লোপাট করে ফেলো না"

"আমি যেন চোর! তোমার জিনিষ চুরি কর্‌তেই এসেছি! না?"

ভীষণভাবে ভীষণ অভিযোগের এই প্রত্যুত্তর দিয়া উর্ম্মিলা স্প্রিং-এর মত ছিট্‌কাইয়া ফিরিয়া আততায়ীর সহিত ঠিক মুখামুখী দাঁড়াইল। তাহার মুখেচোখে যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে আহতের আঘাতটা যে কোন্‌খানে, সেটুকু বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। সহস্রবার পূর্ব্বারোপিত চৌর্য্যাপবাদ যে উর্ম্মিলাকে এমন অতর্কিত অগ্নিশিখায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিল, তাহার স্বামীটীর মনের প্রান্তে এক লহমার জন্যও এমন অন্যায় বিশ্বাস জাগে নাই। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল,—

"তার পরে উর্ম্মিলাসুন্দরি চুপি চুপি কখন আসা হলো? টুক্ টুক্ করে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চো কি?—এ আমার ঘর!—শুধু আমার একলার—এই টেবিলে বসে এবার থেকে আমি একলাই লেখাপড়া কর্‌বো!—ঘুম পেলে ঐ খাটে শুয়ে একা একাই ঘুমিয়ে পড়্‌বো।—"

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া বারেক টেবিলের সাম্‌নে চৌকিখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, এবং আবার তখনই উঠিয়া সগর্ব্ব-পদক্ষেপে খাটের সম্মুখে আসিয়া চটিজুতা জোরাটা খুলিয়া ধপাস্ করিয়া তদুপরি শুইয়া পড়িল। তারপর পরাজিত এবং একান্ত বিমর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে গৌরবদীপ্ত সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লে তো? এ সব আমার!"

উর্ম্মিলার মুখ ঈর্ষায় কালো হইয়া উঠিল। সে সন্দিগ্ধ ভগ্ন-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে এ সব দিলে?"

"কে আবার দেবে! আমার মা দিয়েছে।" শুনিয়া উর্ম্মিলা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়া উচ্চ চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "মা! ও মা!—"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক দ্বারের বাহির হইতেই যেম্‌নি মায়ের সাড়া আসিয়া পৌঁছিল, এবং সুস্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখে ও সস্নেহ চোখে চাহিয়া যেম্‌নি তিনি ঘরে ঢুকিলেন, অম্‌নি দুর্জ্জয় ক্রোধে ও অভিমানের সমুদ্র উর্ম্মিলার অপমানাহত ক্ষুব্ধ বক্ষে উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং এইরূপেই শাশুড়ীকে জানাইয়া দিল যে, সে তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে।

জগদ্ধাত্রী এ সব মান অভিমানে বেশ অভ্যস্ত আছেন। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিত যে, "আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি।" এখন আর সেরূপ করে না, কিন্তু এই একটা সুস্পষ্ট ভাবে এখনও নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করে।

কাছে আসিয়া খপ্ করিয়া বধূর মাথাটা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "রাগ হলো কেন রে?"

উর্ম্মিলা জবাব দিবে না মনে করিয়াছিল; তবুও স্বভাববশতঃ আচম্‌কা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "যাও—তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কথাই কবো না।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে পাগ্‌লী? কথা কবিনে' কিসের জন্যে? কি করেছি বল্‌তো?"

"'কেন্ রে পাগ্‌লি' বই কি!—কিচ্ছু যেন জানেন না!"—উর্ম্মিলা নিজের পুঁটে-ঘেরা খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা শাশুড়ীর কবল হইতে মোচন-চেষ্টায় একটা ঝটকা মারিল। খোঁপায়-আঁটা পানকাঁটার ঘুমুরগুলা অমনি ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

খাটে শুইয়া বিনয় এতক্ষণ হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিল। সে মায়ের পরাভব দেখিয়া অধিকতর আনন্দ অনুভব করিয়া হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "বুঝ্‌তে পারচো না? আঃ, আমার এই ঘর দেখে তোমার পাগলী যে এদিকে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মর্‌চেন!"

"হ্যাঁরে মা?"

"যাও, যাও, আমি তোমার মা নই,— আমি আমার বাবার মা। তুমি নিজের ছেলেটীকে ঘরটর সব দিয়েছ। আমায় দিয়েছ কি?"

গৃহিনী হাসিয়া সস্নেহে বধূর ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "নে' পাগল কোথাকার! তোরই তো সব রে। তোকে আবার আলাদা করে আমি দোব কি?"

উর্ম্মিলা সবেগে মুখখানা সরাইয়া লইয়া উদ্ধত-কণ্ঠে বলিল, "ও-সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে

চাইনে। আমায়ও তুমি এই রকম একটা ঘর দেবে কি মা, শীগ্‌গির করে বলো ?"

বিনয় তাড়াতাড়ি খাট হইতে উঠিয়া মার দিকে ছুটিয়া আসিয়া দুইহাত যোড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "দিও না মা ! তোমার পায়ে পড়ি মা ! ওকে একটা ঘর দিও না।"

মা বলিলেন, "সে কি রে ! ও যে আমার ঘরের লক্ষ্মী ! তা এ ঘর তো তোদের দুজনকেই দিয়েছি। এইখানে আজ থেকে তুইও তো রাত্রে শুবি'রে পাগলি !"

বিনয় অমনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও বাবা রে ! সে হচ্ছে না। ওকে আমি আমার ঘরে শুতে দেবো না। ওর মাথার তেলে আমার ঘরের বালিস নোংরা হয়ে যাবে, ওর মল-পরা পা মাঝরাত্তিরে আমার ঘাড়ে এসে যে চড়ে বস্‌বে—সে আমি পার্‌বো না রে, বাবা ! তার চাইতে গাছতলায় শুতে যাব সেও বরঞ্চ ভাল।"

মহা অবমানিত ও কোপে আরক্ত হইয়া উঠিয়া উর্ম্মিলা শাশুড়ীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সতর্জ্জনে বলিল, "মা ! "তুমি জানো ত, ঘুমুতে ঘুমুতে কে কার ঘাড়ে এসে পড়ে ? সারা রাত তোমায় পাশ বালিস করে আঁকড়ে ধরে কে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় ? তবু কি না তুমি বল্‌চো আমায় তার সঙ্গে শুতে ? বেশ ত তুমি মা !"

মা বলিলেন, "ওরে তোরা যে বড় হচ্চিস্‌। চিরদিনই কি মার আঁচলের তলায় থাক্‌বি ?"

বিনয় বলিল,—"তা থাকি আর নাই থাকি, তা বলে তো আর ওই রাক্ষুসীর আঁচল ধর্‌তে পারিনে।"

ইহার শোধ লইবার জন্যই উর্ম্মিলা পাল্‌টা গাহিল, "বাপ্‌রে বাপ ! ছেলে যা ষাঁড়ের মতন নাক ডাকান ! রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কতদিন যে আমি সেই ডাক শুনে ভয় পাই, তা বল্‌তে পারিনে। আমি অমন সাপের গর্ত্তয় শুতে চাইনে, মা ! আমায় একটা আলাদা ঘর তুমি দেবে কি না, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বলো ? না দাও আজ থেকে তোমার ঘরেও আমি আর শোব না। বামুন-মেয়ের কাছে, নিস্তারের কাছে, গিয়ে শোব।—দেবে ?—আচ্ছা, তবে এক্ষণি দেবে, এসো।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"বাবা, তোমার আজ চান করতে আস্‌তে অনেক বেলা হয়েছে। হবেই তো, এখন তো আর আমার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমায় ধরে আন্‌বার যোটি নেই।"

"নারে পাগ্‌লি ! না, বেলা কেন হবে ? ঠিক সময়েই এসেছি।"

"কখ্‌খনো নয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বরং ঘড়ি দেখ।—আন্‌বো ঘড়ি ?"

"না, না, থাক্‌। আচ্ছা কাল থেকে—"

"সে তোমার দ্বারা হবে না বাবা ! দেখই না একবার কতখানি বেলা হলো।"

"তবে আন্‌।"

উর্ম্মিলা উৎসাহ সহকারে ঘড়ি আনিয়া সম্মুখে ধরিলে বিপিনবিহারী দেখিলেন, বহুমূল্য ও সুদৃশ্য সুইস্‌ ঘড়িটী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গা !—বিস্মিত হইয়া বধূর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ! ঘড়ি কেন ভাঙ্গা, মা ? তুই ভেঙ্গে ফেল্‌লি নাকি ?"

বধূ নীরবে মাথা নাড়িল,—"না।"

বিপিন বাবু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে ভাঙ্গলো কেমন করে? একেবারে দফা রফা হয়ে গেছে যে! জানো, কে ভেঙ্গেছে?"

বধূ মস্তক হেলাইয়া জানাইল, যে, সে জানে। আর কিছুই বলিল না।

তখন বিপিনবাবু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া হাঁকিলেন, "বিনে! নিশ্চয় এ সেই বিনে হতভাগার কাজ। কই, রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

বিনয় অত্যন্ত গম্ভীর-মুখে আসিয়া বলিল, ঘড়ি সে ভাঙ্গে নাই। কে তাহাকে ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে?—রোখ করিয়া এই কথা বলিয়াই উর্ম্মিলার চোখের উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ সে থতমত খাইয়া ঢোক গিলিতে লাগিল!

ঘড়ি-ভাঙ্গা এবং মিথ্যা বলা,—এই দুইটা অপরাধের জন্যই বিপিনবাবু যৎপরোনাস্তি তীব্র ভৎর্সনা করিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। দোষ স্বীকার এবং মিথ্যার জন্য ভৎর্সিত হওয়ায় অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিয়া ইহার যে মূল তাহার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিরই অনুরূপ একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া দুম্‌দুম্‌ শব্দে পা ফেলিয়া সে চলিয়া গেল। পুত্র ঘরের অন্তরালে গেলে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিনবাবু আত্মগতভাবেই বলিলেন, "দুটোই সমান গোঁয়ার। এটারও মানুষ হবার লক্ষণ দেখ্‌চি নে!"

স্বামীর সেই কোপদৃষ্টি এবং নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সেদিন সারাদিনই উর্ম্মিলা লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইল। কিন্তু এখন আর যেন সে এমন করিয়া অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেও পরিতেছিল না। এইবার স্বামীর নিকট ধরা দিয়া কৃতকার্য্যের শাস্তি বহন করিতে প্রাণ তাহার উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। রান্না-বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। অন্তরালে থাকিয়া আততায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে চিত্ত তাহার বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এই জন্য যে, এই একটু পূর্ব্বেই এরূপ স্থলে যেমন ঘটিয়াছে, এবার তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিনয় তর্কে তর্কে উর্ম্মিলার সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে এবং তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই বাঘের মত গর্জ্জিয়া আসিয়া তার ঘাড়ে পড়ে। তারপর দুইজনে হুড়াহুড়ি মারামারি—সে সব অনেক কাণ্ডই ঘটিয়া যায়। কিন্তু আজ তার তো কিছুই হইল না! গোপন আবরণ ছাড়িয়া অবশেষে এমন কি সারা বাড়ীটাই উর্ম্মিলা ঘুরিয়া বেড়াইয়া অধীর আগ্রহে খুঁজিয়া আসিল, শত্রু-পক্ষের যে দেখাই নাই! ব্যাপারখানা কি? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও যে ভরসা হয় না।—যদি ঠিক সেই সময়টীতেই সেই অন্বেষিত ব্যক্তিটী আসিয়া পড়িয়া তাহার কথাগুলা শুনিতে পায়!

সন্ধ্যার পর কি একটা দরকারে উপরতালার ভিতরকার বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে উর্ম্মিলা দেখিল, বিনয়ের ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়াই তাহার বিষণ্ন-মুখে অমনি আশার আলোই জ্বলিয়া উঠিল এবং হৃৎপিণ্ডটা একেবারে উৎসাহে লাফাইয়া ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিন লাফে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়াই সে ঝনুঝন্‌ রবে মলের শব্দ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি পুস্তকের পৃষ্ঠায় অখণ্ড মনোযোগ-নিবন্ধন বিনয়কুমারের দৃষ্টি

তাহার পানে ফিরিল না। বোধ করি চারগাছা মলের সে খন্ খন্ রব তাহার কর্ণগোচর না হইয়াই বা থাকিবে?

উর্ম্মিলা নিজের প্রতি উহার মনোযোগ আকর্ষণের কোন সুযোগ খুঁজিয়া না পাইয়া খোলা দরজাটাকে টানিয়া ঝনাৎ করিয়া বন্ধ করিল। তারপর তাহাতেও বিপক্ষ-পক্ষকে অটল দেখিয়া অসহিষ্ণু ধৈর্য্য-হারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া যে চৌকিখানায় সে বসিয়াছিল, সেইখানার হাতা ধরিয়া বিপুল বলে একটা ধাক্কা মারিল। পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইয়া বিনয় তখন বিদ্যুতের মতন তাহার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "খবরদার! আমার ঘরে ঢুকেছ,—কি ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি।"

উর্ম্মিলা আসিয়াছিল বিনয়ের কাছে ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত সঙ্কল্প নিজেই যখন মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকীটুকুর কথাও বিস্মৃত হইয়া গিয়া তেমনি খর-দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, "ইস্—তোমারই না কি একলার ঘর? জানো,—মা বলেছে, আমারও এতে সম্পূর্ণরূপ ভাগ আছে।—শুধু তাই নয়; তোমার সব জিনিষেই আমার ভাগ আছে, মা বলেছে।"

বিনয় নিজ নামের সম্মান সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়া ভীষণ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া তেম্‌নই স্বরে গর্জ্জিয়া বলিল, "বেরোও বল্‌ছি, এ ঘর থেকে। ভাল চাও তো এক্ষনি বেরোও।—আমি 'স্পাই'কে আমার ঘরে ঢুক্‌তে দিইনে।"

এ কথায় উর্ম্মিলার অহঙ্কার-প্রদীপ্ত মুখের ছবি এক মুহূর্ত্তে রাহুগ্রাস-কবলিত শশাঙ্কের মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিসে যে কি ঘটে কেহ জানে না, এই যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, একেবারেই ইহা অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক! সারাদিন ধরিয়া উর্ম্মিলা যে ভয়ে চোরের মতন চুরি করিয়া লুকাইয়া বেড়াইয়াছে, সে কিন্তু এ' নয়।

ইতঃপূর্ব্বে আর কখনই কি এমন ঘটনা ঘটে নাই? তা' ঘটিয়াছিল বই কি। বিবাহের পরদিন হইতেই তো এ দম্পতির মধ্যে কলহ-বিবাদ নিত্যই চলিতেছে—তবে এবারেই বা এমন কি বিশেষ ঘটনা ঘটিল, যাহাতে চিরন্তন বিধির সবটাই ওলোট্ পালোট্ হইতে বসিয়াছে? আরও একবার ঠিক এই রকমে সে বিনয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তখন অবশ্য তারা দুজনেই আরও দু'তিন বছরের করিয়া ছোট। সেবারেও শ্বশুরের কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই উর্ম্মিলা তার জলতরঙ্গ মলকে ঝল্‌মল্ খন্‌খন্ শব্দে বাজাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দেয় এবং প্রাণপণে ছুটিয়া গিয়া, তরকারি কুটিতে ব্যস্ত শাশুড়ীর ঘাড়ের উপর আশ্রয় লয়।

জগদ্ধাত্রী বলিষ্ঠা বধূর—আচম্‌কা জড়াইয়া ধরার প্রবল উচ্ছ্বাসে সবেগে বঁটির উপর মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িতেছিলেন; কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া বঁটি কাৎ করিয়া দিয়া কহিলেন, "এক্ষুণি দুজনেই কেটে মরেছিলুম গো! মা গো মা! কি দস্যি-মেয়ে তুই উর্ম্মিলা! প্রাণে একটু ভয়-ডরও কি নেই রে?"

ঊর্ম্মিলা অদূরে বিনয়ের গুম্ গুম্ পায়ের শব্দ অনুভব করিয়াই প্রাণপণ-বলে শাশুড়ীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁর কোলের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিল, "প্রাণে ভয়-ডর' আছে বলেই তো তোমার কাছে এসেছি রে বাপু! ঐ দেখ না, এক্ষুণি তোমার গুণধর ছেলে এসে আমায় ঠেঙ্গাবেন। ওমা! আমায় তোমার আঁচল দিয়ে ঢেকে দাও,—ওমা! ঐ আস্‌চে।"

মা ঈষৎ হাসিয়া বধূর উত্তমাঙ্গটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুই কি কচি খুকি আছিস্ রে উমি! যে তোকে আঁচল-চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবো?"

বলিতে বলিতেই এদিকে তাহার শত্রুপক্ষ ততক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছে, সে খরগোসের মতন মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষায় চেষ্টা-পরায়ণার সকল চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়া তার পা দুইটা ধরিয়া টান দিতে দিতে আস্ফালন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল,—"আমায় মার খাইয়ে এসে মজা করে মা'র কোলে লুকুনো হয়েচে! বার কর্‌চি থাকা,—দেখনা একবার কি দশা আজ করি! কীচকবধ কর্‌বো। মা! দাও ওর মাথাটা তোমার কোল থেকে ভুম্ করে মাটিতে ফেলে, যাক্ এক্ষুণি পাকা বেলের মতন সেটা ফেটে। দিলে না! আচ্ছা তা' হলে এই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাই।"

জগদ্ধাত্রী আশ্রিতাকে রক্ষার চেষ্টায় তাঁর যথাসাধ্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জোয়ান্ ও দুর্দ্দান্ত ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়েমানুষ আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? হেঁচ্‌কা টানের চোটে ঊর্ম্মিলার মাথাটা বাস্তবিকই আছ্‌ড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া সেটাকে তিনি নিজেই মাটিতে আস্তে আস্তে নামাইয়া দিলেন। তা দেখিয়া ঊর্ম্মিলার সকল ধৈর্য্যই টুটিয়া গেল। প্রবলের কাছে পরাভূত হইলে যা হয়;—সে সব দোষ শাশুড়ীর পুত্র-প্রীতির ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের সেই প্রচণ্ড আক্রমণের ভিতরেই তাঁহার উপর অনুপায় ক্রোধের জ্বালা প্রশমিত করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনুযোগ করিয়া বলিল, "তুমি আমায় কোল থেকে ফেলে না দিলে, ও কক্ষণো আমায় এত লাগিয়ে দিতে পারুতো না। তোমারই তো দোষ, তোমার নিজের ছেলে বলে তুমিই তো তাকে জিতিয়ে দিলে। বা-রে আহ্লাদে মেয়ে!"

তারপর নাকে-কানে খত দিয়া ও দাঁতে কুটি ধরিয়া যখন বিনয়ের সঙ্গে মিট্‌মাট্ হইয়া গেল, দুই সখা-সখীতে হাত-ধরাধরি করিয়া রান্নাঘরে ভাত খাইতে আসিল, তখনও ঊর্ম্মিলা শাশুড়ীর উপর মুখখানা ফুলাইয়া রহিল এবং তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রূকুটী করিয়া থাকিয়া উত্তর এড়াইয়া গেল। তা' দেখিয়া জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বামুন-মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কলি কাল কি না! দেখলে মেয়ে! বেটীর আমার বিচারটা দেখলে?"

এবারেও ঊর্ম্মিলা সেই রকমেরই আর একটা অভিনয়ের আশঙ্কা ও প্রত্যাশা করিতেছিল। চারগাছা মলকে হাঁটুর নীচে গুঁজিয়া সে যে সারাদিনই চোরের মতন এখানে সেখানে লুকাইয়া ফিরিতেছিল; এর মধ্যে সব সময়েই তার বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল যে, হঠাৎ কোন সময়ে বিনয় কোথা হইতে বাঘের মত লাফাইয়া আসিয়া তার টুঁটিটা টিপিয়া ধরে, অথবা পিঠের উপর দুড়্‌দাড়্ করিয়া কিলের বস্তা ছুটাইয়া দেয়! তা বরং দিক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, পাছে তার সারি-বেঁধান কানের ঝিক্‌মিকে তীরকাটা মাকৃড়িতে হেঁচ্‌কা টান মারিয়া রক্তগঙ্গা করিয়া দেয়,

পাছে টানের চোটে কান কাটিয়া দিয়া শেষে নিজেই আবার তাহাকে 'কান-কাটা' বলিয়া ক্ষেপায়,—সেই সব ভয়েই সে তখন অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন তার মনে হইল; এর চেয়ে দশ-দশটা মাকৃড়ি-সমেত দুই দুইটা কানই যদি তার বিনয় তার পেন্‌সিল-বাড়া ছুরী দিয়া কাটিয়া লইত, তো যেন এর চেয়ে সেও অনেক ভাল ছিল! লজ্জা যে এত বড় হইয়াও সংসারের কোথাও জমান থাকিতে পারে, এ যেন উর্ম্মিলার ধারণাতেও ছিল না।

সেই যে সেদিন উর্ম্মিলা শ্বশুরকে ঘড়ি-ভাঙ্গার কথা জানাইয়া স্বামীকে লাঞ্ছিত করাইয়াছিল, তাহার পক্ষে এ কিছু নতুন নয়; কিন্তু এবারে এ কাজটা সে যে কি অশুভক্ষণেই করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা যিনি তাহার বুদ্ধিকে ওই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। তবে ইহার ফলটা যে এতখানি কটু হইয়াই দেখা দিবে, সে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ রাখিলে নিশ্চয়ই এমন কর্ম্ম সে কখনই করিতে যাইত না। সেই যে সেদিন সুগভীর ঘৃণাভরে গুপ্তচর বলিয়া বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে ঢুকতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই উর্ম্মিলার দুই পায়ে কে যেন জোর করিয়া একগাছা মোটা লোহার বেড়ি আঁটিয়া দিয়াছে। বিনয় সেই একটিবার মাত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক হানিয়াই সেই যে আবার পিছন ফিরিয়া বই লইয়া বসিয়াছিল, সেই যে বিদ্যুৎ সে হানিয়াছিল, তার কাছে জগতের আর কোন রকমের মৃত্যুবাণই বুঝি বেশী নির্ঘাত নয়। শুনা যায়, তাড়িতের প্রবাহের মতন অত শীঘ্র মানুষ মারিবার শক্তি নাকি আর কাহারও নাই। বিদ্যুৎস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের চেয়েও অল্প সময়ে দেহের প্রত্যেক লোমকূপটিকে পর্য্যন্ত স্থির রাখিয়াই জীবন চলিয়া যায়। তা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার মত কেহ সেখানে ছিল না তাই, থাকিলে দেখিতে পাইত যে, এই চঞ্চলা মেয়েটীরও অবস্থা প্রায় সেই এক রকমই হইয়াছে। ওই একটী মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড তিরস্কারের লজ্জায় তাহার বুকটা যেন কালো হইয়া পুড়িয়া গেল এবং তাহাকে মরিয়া যাইবার জন্য যেন প্রলয়-ঝড়ের গর্জ্জনেই সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল। এর চেয়ে সে যদি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণভূষা-সমেত কান দুইটা বেশ কঠিন-হস্তে মুচ্‌ড়াইয়া ধরিত,—যেমন কতবারই করিয়াছে—কান কাটিয়া খানিকটা রক্তও যদি ইহাতে ক্ষরিয়া পড়িত,—চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া পিঠে অজস্র-ধারায় কিল-ঘুষি লাগাইত—বুঝি, ঠিক এইটী ছাড়া আর যা-কিছু করিত, তাহাতে উর্ম্মিলাকে এমন করিয়া মরার বাড়া হইতে হইত না। কতক্ষণ সে সেই দরজাটা ধরিয়া আড়ষ্ট আকাট্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে কতটা সময়, সে অনুভব-শক্তিও বোধ করি ঠিক তাহার ছিল না। তারপর সেইরূপ থাকিয়া অনেকক্ষণ পরে কতকটা আত্মস্থ হইয়া যখন সে মুখ তুলিল, তখনও তাহার আততায়ীকে তাহার সেই নিজস্থানেই ঠিক সেই একই অবস্থায় নিবিড় মনোযোগের সহিত পাঠমগ্ন দেখিয়া সহসা তাহার সেই মৃত্যুবাণাহত অন্তরের উপর যেন আবার একবার নূতন করিয়া তপ্ত শেলের আঘাত লাগিল। এই অকথ্য লজ্জার যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এবার সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে অন্ধকার বিছানার মধ্যে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

সে রাত্রে শীলেদের বাড়ীর বাঁধা-নিয়মেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বিপিনবাবুকে আজ আর কেহ আহার করিতে ডাকে নাই। জগদ্ধাত্রী কাজ-কর্ম্মের

তদারক সারিয়া বামুন-মেয়েকে ডাকিয়া কার পাতে মাছের মুড়া, কার পাতে ল্যাজাখানা, ঝোলে বা অম্বলে কোন্ বড়িগুলি দিতে হইবে, সে সবের পুরাদস্তুর হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া মালা লইয়া যেমন বসেন, তেমনি বসিয়াছিলেন, কর্ত্তা যখন বাড়ীর মধ্যে খাইতে আসেন; তাঁহাকেও উর্ম্মিলা আসিয়া খবর জানায়, আজ আর উঠিবার কোন তাগিদ্ই নাই। মালার পর মালা ফিরিয়াই চলিল। বামুন-মেয়ে এদিকে রান্নাঘরে রান্না সারিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে বিরক্তিতে অস্থির হইতেছে, শেষকালে আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরের ঝিকে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া, গৃহিণীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া আসিয়া হাঁক পাড়িল, "বলি, হ্যাঁগা মা! আজ আমাদের বৌরাণী কি বাড়ী নেই না কি গা? সব খাওয়া দাওয়া হবে কখন?"

গৃহিণীরও মনটা যেন এই রকম একটা কিসের সন্দেহের আমেজে জপের সংখ্যা ভুল করিতেছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ 'নামের' মালা যোড়-করশুদ্ধ মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আহ্নিকের সজ্জা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, "কি জানি মেয়ে! আমিও তো তাই ভাব্‌চি। বলি, পাগ্‌লীর বেটী আজ গেল কোথায়?"

এমন সময় চটিজুতা ফট্‌র ফট্‌র করিতে করিতে আসিয়া তীক্ষ্ণ-গলায় বিনয় হাঁকিল, "বামুন-মেয়ে! বলি আজ কি খেতে পাবো না, পেট যে জ্বলে গেল।"

"এই যে দাদা! এই যে খাবে এসোনা ভাই! ওরে দাদাবাবুর আসন দে। হ্যাঁগা দাদা! আমার বৌদি'মণি আজ সন্ধ্যে থেকে কোথায় গা? অন্য দিন সাতবার যে রূপকথাই শুন্‌তে ছুটে ছুটে আসে, আজ যে বড় সাড়াটী শুদ্ধ নেই? তানার জন্যে বসে বসেই তো এত রাত হয়ে গেল। বলি সময় হলেই তিনি আপনাদের ডেকে ডুকে আন্‌বেন' খন।"

জগদ্ধাত্রীও ব্যস্ত হইয়া বিনয়কে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, বৌমা কোথায়?"

বিনয় ততক্ষণে আসনে গট্ হইয়া বসিয়া সাবহিতচিত্তে আহারে মনোনিবেশপূর্ব্বক গম্ভীর-মুখে উত্তর দিল,—"হার-হাইনেসে'র টুরের প্রোগাম আমার জানা নেই।"

তল্লাসে যখন জানা গেল যে উর্ম্মিলা তার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিতা, তখন গৃহিণীর আর ভয়-ভাবনার পরিসীমা রহিল না। ওই দস্যি মেয়েটীর চক্ষে ঘুম যে কত দুঃখেই আনিয়া দিতে হয়, সে ত তাঁহার বিলক্ষণই জানা আছে। নিশ্চয়ই বড়-বেশী অসুস্থ হইয়াই সে এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে! স্থূল শরীর ও ব্যস্ত মন লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপর-তলায় উঠিয়া "উর্ম্মিলা"! "উর্ম্মিলা"! হাঁক পাড়িতে পাড়িতে তিনি তাহার ঘরে আসিলেন।

"ওমা, তুই ঘুমুচ্ছিস্! এমন সময় কেন ঘুমুলি মা?"—বলিতে বলিতে হৃদয়-ভরা অগাধ স্নেহ লইয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী বধূর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

উর্ম্মিলা বোধ করি বা ঘুমাইয়াছিল, ডাকাডাকিতেই যেন তাহার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল; এমনভাবেই গা ভাঙ্গিয়া নিদ্রালস-জড়িত-কণ্ঠে "উ?"—বলিয়া একটা উত্তর দিয়াই সে আবার ভাল করিয়া শুইল এবং শাশুড়ীর অজস্র প্রশ্নের, অনুরোধের, শাসনের উত্তরে শুদ্ধমাত্র একই উত্তর দিল যে, তার বড় অসুখ করিতেছে।—সে আজ খাইবে না, উঠিবে না।

মা চমকিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া শেষে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "নাঃ! বেশ আছে!

নে' বাপু, ভঙ্গি রাখ্, গা'তো তোর কন্‌কন্ করছে। অসুখ হয়েছে না ছাই হয়েছে। সারাদিন দস্যি-বৃত্তি করিস্, রক্ত-মাংসের শরীরে আর কতই সয়? তাই ঘুমিয়ে পড়েছিস্। ওই জন্যেই তো বলি বাছা! যে, বড় হচ্চিস্, দুপুর-বেলা আমার কাছে এসে দুদণ্ড শো' বোস, তা' ত তোর কুষ্টিতে লেখেনি। কাল থেকে দুপুর-বেলা ঘুমুস্ দেখি একটু, গায়েও তা'তে 'গত্তি' লাগ্‌বে।"

উর্ম্মিলা শাশুড়ীর হাতখানা নিজের গায়ের উপর হইতে ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিল এবং একটু চুপ হইয়া থাকিয়া তিক্ত-কণ্ঠে বলিল, "জ্বর তো আর আমার হয় নি, যে, তুমি গা হাতড়াচ্চো! আমার যা ভয়ানক রকম পেট ব্যথা করছে।"

গৃহিণীর বিলম্ব দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বামুন-মেয়ে উঁহাদের সন্ধানে আসিয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কামড়াবে না পেট? বলি, পেট তো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নয়, যে, যা খুশী তাতে ভরে দিলেই হলো! বল্‌বো কি মা, তোমায় বল্‌লে না পেত্যয় যাবে, দাদাবাবু আর এই আমাদের বৌ-রাণীটী মা আর জন্মে যে, কে ছিলেন, তা দেবতারাই জানে! এমন-সব অখাদ্যি দেখিনে মা! যা ওঁদের পেটে যায় না। কাল দেখি না আমড়া-পাতাগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খেতে লেগেছেন। আমি বারণ কর্‌লুম বলে বৌরাণী তো আমায় ভেংচে টেংচে এক কর্‌লে; দাদাবাবু আমার বলে কি, জানো? বলে কি না, খেয়ে দেখ তো বামুন-মেয়ে, এ খেলে আর কখনও ভুল্‌তে পার্‌বে না। তা ও-সব খেলে আর পেট ব্যথা—"

উর্ম্মিলা হাতপা ছুঁড়িয়া অধৈর্য্যসহকারে চেঁচাইয়া উঠিল, "মা গো, বাবা গো, সব্বাই মিলে এই ঘরের মধ্যে চেঁচাতে ঢুক্‌লো! যাও শীগ্‌গির তোমরা, না হলে আমি এখুনি ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে শুয়ে থাকবো, তা বলে দিচ্ছি। অসুখ করেচে বল্‌চি, তা একটু ঘুমুতেও দেবে না।"

জগদ্ধাত্রী একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তা'হলে একটু জোনে-মুনে খা দেখি, না হয় তো—"

বধূ এবার উঠিয়া বসিয়া সরোদনে "না হয় তো খানিকটা উনুনের ছাই এনে দাও, খাচ্ছি—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনশ্চ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিল; এবং কান্না-ভাঙ্গা-স্বরে বলিতে লাগিল, "বলচি আমার কিচ্ছু ভাল লাগচে না, আমায় সব ছেড়ে দাও, তোমাদের সে হবে না। আমার অত আদরে দরকার নেই গো, দরকার নেই! যাও দেখি তুমি আমার ঘর থেকে।"—বলিতে বলিতেই পুনশ্চ দ্বিগুণ বেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন অপ্রতিভের এক-শেষ হইয়া স-পার্ষদ গৃহকর্ত্রী বধূর ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু সে রাত্রের অবশিষ্ট কাজকর্ম্মের মধ্যে আর যেন তিনি নিজের মনটাকে কোনমতেই লাগাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কর্ত্তা আজ সন্ধ্যাবেলায় আফিম খাইতে পান নাই, তাঁহার শরীর বিষম বে-এক্তার হইয়া রহিয়াছে—পদসেবা হয় নাই, বাতের শরীর, ব্যথায় আড়ষ্ট। তার উপর বধূর অসুস্থতার সংবাদ, মনটা যেন তাঁহার কি এক রকম হইয়া গেল। সে রাত্রের খাওয়ার মধ্যে কোন রসই তিনি পাইলেন না,—সাতবার করিয়া গৃহিণীকে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাগা, পাগলী বেটির যদি সত্যি সত্যি বেশী অসুখ হয়? হ্যাগা, হরিদাস ডাক্তারকে না হয় একবার ডাকাওই না।"

বিনয়কে সাইকেল লইয়া যাইতে বলায়, সে গুম্ হইয়া জবাব দিল, 'আমি কি তোমার বউএর খানসামা নাকি যে তাঁর চুল টন্‌টন্ করচে বলে এই রাত্রে অমনি সাপের মুখে- বাঘের মুখে পড়তে দৌড় দোব? ভাল এক আদুরী জুটেচে।"

ভয়ে আর জগদ্ধাত্রী স্বামীকে এ কথা জানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার মনটা এ-রাত্রে শুধু একটু পেট-ব্যথার জন্য ডাক্তার ডাকার হাঙ্গামা আর পোহাইতেও খুব বেশী রাজী হইল না! তিনি বলিলেন, "দেখা যাক্, চুপ করে থেকে ঘুমিয়ে যদি সেরে যায় তো আর অত নেঠা কেন।

কেবল বিনয়ই শুধু এ বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে আহার-কার্য্য সমাধা করিয়া নিজের স্বতন্ত্র শয়নাগারে নিদ্রা দিতে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর হইতে চক্রের গতি যে কেমনই সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে যেন এক ইন্দ্রজাল! ঊর্ম্মিলা সে দিনের সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসহ লজ্জার বেদনায় এমনই মুস্ড়িয়া পড়িল এবং নিজের মনের সঙ্কোচে বিনয়ের সান্নিধ্যকে সে এমন করিয়াই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, যে, এক এক সময়ে তাহার নিজের কাছেই এটা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মতই অদ্ভুত ঠেকিল। বিস্ময়ে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা' শত চেষ্টাতেও কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই, কেমন করিয়া সেই এত বড় দুরূহ কার্য্য আপনা হইতে সে করিতে পারিতেছে? ইহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা যেন একটা অকথ্য ও প্রচণ্ড ব্যথায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। কতবারই বিষয়টাকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া চিত্তকে লঘু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া নিজেকে ভীরু বলিয়া গালি দিয়াছে। নিতান্ত সহজভাবেই ঝড়ের মত ছুটিয়া বিনয়ের পাঠাগারে ঢুকিয়া পড়িয়া ভালয়-মন্দে কলহেকাতরতায় এই বিষম অভিশপ্ত মৌন-বিদ্রোহের একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য যে সে নিজের সমস্ত শরীর-মন-প্রাণকে কিরূপ উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত বুঝি সে নিজেও তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যে সেদিনের বজ্রপাত করিবার পর হইতেই বিনয়ের মুখখানা নিরেট্ মেঘের মতই কঠিন হইয়া আছে, অতি গোপন-সন্তর্পণে সেই মুখখানার দিকে চুরি করিয়া চোখ তুলিলেই ঊর্ম্মিলার অটল হৃদয় কেনই যে পদ্মপত্রের সঞ্চিত জল-বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকে, সে কথাও ঠিক বুঝা যায় না। আসল কথা যে কখনও সত্যকার কোন পাপ করে নাই, সে যদি একটা যথার্থ অন্যায় আচরণ করিয়া বসে, তো তার শাস্তি যতটা বাহির হইতে সে পায়, তদপেক্ষায় সহস্রগুণে উপভোগ করিয়া থাকে সে নিজের মনে। এই যে অজ্ঞাত তাড়নাটা সে অহরহই ভোগ করিয়া চলিল, এটা যেন তার নিজেরই বিবেকের তাড়না।

আবার ওদিকে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের বহর দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়ের মতটাও ইদানীং বেজায় রকম কড়া হইয়াই উঠিয়াছিল। কোন যুদ্ধের একজন পাণ্ডা লিখিয়াছেন, শত্রুপক্ষকে ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর গৃহ-শত্রুকে দণ্ড দিতে কত ক্রোশ পার্ব্বত্য-পথ ছুটিয়াছিলেন; এই অসতর্কতার সূত্রেই এদিকে তাঁদের পরাভব ঘটে। ইত্যাদি। সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়াই স্থির করিল যে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য ইতিহাস-সম্মত ভাবে যখন ঊর্ম্মিলাকে তার প্রাণদণ্ড দিবার উপায় নাই, তখন অন্ততঃ উহারই একটুখানি কাছাকাছিও পৌঁছান আবশ্যক। গুপ্তচরকে ছেলেরা একেই একটু বিশেষরূপে ঘৃণা করিয়া থাকে, তার উপর বিনয়ের আবার সেই ঘৃণার মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তার

উপর আবার যখন সে দেখিল, দিনের পর দিন কাটিলেও সেই অপরাধিনী,—সেই ঘৃণিত জীব, তাহার দুই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পর্য্যন্ত আসিল না,—বরং তেজ ও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া দূরেই সরিয়া রহিল, তখন সে সেই অন্তরস্থ তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের বশে একরকম পাগল হইয়াই নিজের মনের কাছে শপথ করিয়া বসিল যে, এ-জন্মে আর কখনও উর্ম্মিলাকে তাহার ক্ষমা করা হইবে না, এবং এই প্রতিজ্ঞার পর হইতেই অসম্ভব মনোযোগ-সহকারে সে বিদ্যালাভে যত্নবান্ হইয়া বই ঘাঁটিয়া, বই পড়িয়া গৃহবাসী সকলের ও স্কুল-মাষ্টারদের চমক লাগাইয়া দিল।

কয়েকটা দিন এম্‌নি করিয়া কাটিল। উর্ম্মিলার পেট যদিও গাঁদালপাতার ঝোল ও বিট্‌নুণ দেওয়া জোয়ান-বড়ির ভয়ে আর কামড়াইতে পথ পায় নাই, তথাপি অ-ক্ষুধাটা তার খুবই জোর করিয়াছিল। দিনে রাত্রে বার পাঁচ-ছয় পেট চিরিয়া খাওয়াইয়াও যার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইত না, সারাদিনই তেঁতুল, কুল, কাসুন্দি, আলুপোড়া, ভুট্টাভাজা, চানাচুর, কুল্‌পি বরফ ইত্যাদির মতলবে মতলবেই যাকে ঘুরিতে দেখা যাইত ; সে মেয়ে এখন নিতান্ত সুবোধ বালিকার মত নিজের খাবারটুকু খাইয়া যায়, আবার তাও খানিক খানিক পাতে পড়িয়া থাকে। কচি আম কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে পিষিয়া ঝালের চোটে দু'চোক ভর্ত্তি জল লইয়া সে যখন তাহার সঙ্গীটির সঙ্গে পরমানন্দে উপভোগ করিত, জগদ্ধাত্রী তা' লইয়া অবশ্য অনেক রাগারাগিও করিয়াছেন, কিন্তু এই যে বৈশাখী ঝড়ের পড়্‌তি আম ভাণ্ডারের ডালায় রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল, অথচ উর্ম্মিলা তার একটাতেও হাত দিল না, এতে যে তাঁর মনটা কতই কাঁদিল, সে যে অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেউ জানিল না। নাঃ, যে বয়সে কাড়িয়া লুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার কথা, তখন যদি ছেলেমেয়েরা গো-বেচারী বা বুদ্ধদেবে পরিণত হইয়া বসিয়া পড়ে, সে আর যার ভাল লাগিতে হয় লাগুক্, মায়ের কখন তা' লাগে না।—তাঁরা দুই স্বামী-স্ত্রীতেই তাঁদের এই পাগ্‌লী বউটীকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া রহিলেন। কবিরাজ বলিলেন, নাড়ীতে কোন রোগের চিহ্ন নাই, পেটও আর কামড়ায় না যে তাকেই একটা বড় রকম আক্রমণ দেওয়া যায় ; অথচ ওই যে মুখটী ভারভার, চোক দুটি ছল্‌ছলে, হাসি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, যে লাফালাফি মারামারির চোটে বাড়ীর লোকে অতিষ্ঠ থকিত, সে সবের কিছুই নাই, এ কি কখন ভাল লাগে? বিপিন শীলও এই শুষ্ক ও মৌন প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হন, প্রান তাঁহার ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠে, সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাগা মা! অমন করে রয়েছিস্ কেন? তোর কি হয়েছে রে?"

এই স্নেহ-সম্ভাষণে উর্ম্মিলার অবমানিত বক্ষ যেন উথলাইয়া উঠিতে থাকে। নাক চোক জ্বালা করিয়া জলের প্লাবন বাহির হইয়া আসিতে চায়। গলায় ঠেলিয়া ওঠা কঠিন আবেগটাকে কোন মতে নিরুদ্ধ রাখিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া হাসির ধরণ দেখাইয়া সবেগে মাথা নাড়ে,—"কিছুই না"—এবং আত্ম-গোপনের জন্যই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া পালায়।

ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তো এমনটা ঘটে নাই, তাই এতবড় কাণ্ডটা ঘটিতে থকিলেও এই বালক-দম্পতীর প্রবীণ অভিভাবকদ্বয়ের চিত্তে কোন সন্দেহের রেখাপাতই করিতে পারে নাই। উর্ম্মিলা মুখ ফুলাইয়া থাকে, বেশার ভাগ সে বিছানাতেই পড়িয়া থাকে, এই বলে পেট ব্যথা, এই বলে মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ গেল, ভাল কথাটি বলিতে গেলেও সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দশটা মন্দ কথা শুনাইয়া দেয়। শ্বশুর শাশুড়ী তো বউ লইয়া একরকম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ছেলের যে

আজকাল তার পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যেই অখণ্ড মনোযোগের সঞ্চার হইয়াছে, কোনরকম বদ্‌মায়েসীর মধ্যে আজকাল আর তাহার সাড়াটা অবধি পাওয়া যায় না; হঠাৎ একদিন এই তত্ত্বটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইহার মূল তথ্যটাও জানা গেল—অর্থাৎ কি না, তাহার ঘাড়ের অবিদ্যাটীর স্কন্ধ ত্যাগ করাতেই এই সুযোগটুকু ঘটিয়াছে; এ টুকুও জানিতে বাকী রহিল না,—তখন এই একমাত্র কারণেই শুধু প্রিয়তমা বধূটীর 'রুগিয়া' পড়াটাকে তাঁহারা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইতে পারিলেও মনে মনে তাহার জন্য তাঁহাদের আর উদ্বেগের অন্ত রহিল না। রোগের কষ্টেই যে সে তাহার স্বামী-রত্নটীকে ভূতের মত অনুসরণ করা হইতে মুক্তি দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের ছিলই বা কি? ইহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ যে, কবি-বাক্যকে সার্থক প্রমাণ করিয়া তাহাদের "যখন হতো ঝগড়া-ঝাঁটি, হতো প্রায়ই লাঠালাঠি,—গতিক দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌তো"—গোছের হইয়াছে। আজ সহসা তাহারা এত কি বড় হইল যে—

কিন্তু একটি পুরা দিন-রাত্রির অবসানে এই হেয় অবজ্ঞের 'গুপ্তচরী'টার 'বিরহ'-বেদনা তার বিচারককে এমন করিয়াই পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা প্রায় অসাধ্য হইয়াই উঠিল। তার ঘুম ভাঙ্গা হইতে ঘুম আসা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটার সকল কিছুই যেন নিরুপদ্রবে, সুনিয়ন্ত্রিততায় অসহ্য বিরক্তিকর হইয়া পড়িল। কানের মধ্যে 'টু' করিয়া, অথবা দুই পা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আর কেহই ঘুম ভাঙ্গায় না। যখন ভাঙ্গে, আপনি ভাঙ্গে। পড়ার সময় পিছন হইতে অলক্ষিতে আসিয়া চোক চাপিয়া ধরা, আচম্‌কা আসিয়া পড়িয়া ফস্ করিয়া বই কাড়িয়া লওয়া এবং তাই লইয়া খানিকটা মারামারি হুড়াহুড়ি ও তদুপলক্ষে কোন কোন দিন তিরস্কার লাভ, কোন কোন দিন পাঠ্য-পুস্তক-খানাকেই ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করা, ভাতের থালা সাম্‌নে লইয়া যে কোন একটা তুচ্ছ বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া—আর তো তেমন করিয়া ভাত ছড়া-ছড়ি, জলের গ্লাস উল্টাইয়া কত না অনাসৃষ্টি অকর্ম্মের সৃষ্টি করা এবং সেই সব অন্যায় অপচয়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে উভয়েরই ভর্ৎসিত হওয়া। এ সব যেন কোন্ সুদূরের কাহিনী হইয়া উঠিল যে! বিনয়ের প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। উর্ম্মিলার সেদিনকার সেই ভীত মুখচ্ছবি স্মরণে আসিয়া তাহাকে তাহার উপর যেন অকস্মাৎ মমতায় ভরাইয়া দিল। উর্ম্মিলার দোষের বিচার করিয়া সে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছে; কিন্তু কত দিনই যে এই উর্ম্মিলা তার কত অন্যায় অত্যাচারকে নিজের বুকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই প্রাপ্য তিরস্কার নিজে সহিয়া গিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজ হইতে সে যে কতবার বলিয়াছে—"তুমি করেছ জান্‌লে বাবা বেশী রাগ কর্‌বেন, তার চেয়ে বলি যে আমি করেছি।"—বিনয়ের এই সতের বৎসর বয়সের জীবনে হঠাৎ আজ সে সব কথা মনে পরিয়া গিয়া অত্যন্তই লজ্জাবোধ হইল। এতবড় কাপুরুষতা তার কোথা হইতে জাগিয়াছিল, যে, মেয়েমানুষের আড়ালে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে—তার বোধ হইল, তবে তো উর্ম্মিলার তাহাকে ধরাইয়া দিবার ন্যায়-সঙ্গত একটা অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সে যে তার কাছে নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছিল! এই কথা মনে হইতেই নিজের পরে ক্রোধে উর্ম্মিলার সম্বন্ধেও বিরক্তিটা প্রবল হইয়া দেখা দিল। তা' যাই হোক্, 'স্পাই'কে'তা' বলিয়া কোনমতেই ক্ষমা করা চলে না। আবার তার উপর দোষ করিয়া—অতবড় দোষ করিয়া উর্ম্মিলা আবার উন্টিয়া কি না এম্‌নি ভাবখানা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন,

যেন বিনয়ই তাঁর কাছে কত বড়ই অপরাধী! বেশ থাকুন। এ জন্মে আর কখনই সে উহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিবে না। সে এই জন্মের মতই শেষ হইয়া গেল।

অকস্মাৎ এই সময়টাতেই একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।—বিনয় আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে চাই, আমাদের স্কুল থেকে চারজন ছেলেকে পাঠাচ্চে, আমারও খুব ইচ্ছা যে যাই, আমায় যেতে দিন্।"

বিনয়ের একজন অধ্যাপক নিজে আসিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন; এবং বিনয়কে পাঠাইবার জন্য বিশেষ ভাবেই অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, "পড়া নিয়ে বসে কাটাবার চেয়ে আর সকল বিষয়েই ওর শক্তি বেশী। বিশেষ, আপনার ঘরে পয়সার দুঃখ নাই; এ অবস্থায় বিনয়ের মতন ছেলেরই ভাল ডাক্তার হবার সুযোগ অধিক, আমি দেখেছি ওর দয়া ধর্ম্মটা খুবই প্রবল। পথের ভিখারীদেরও ও ডেকে কথা কয়, তুলে বসায়। ওকে জীবন সার্থক কর্‌বার এ অবসর দান করুন। বিশেষ এমন সুযোগ পাচ্চে।"

বিপিন-শীল ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনুমতি দিয়া ফেলিলেন।

জগদ্ধাত্রী কাঁদো-কাঁদো-গলায় বলিলেন, "হ্যাগা, ছেলেটাকে আবার তুমি কাছ-ছাড়া কর্‌তে চাইচো? তোমার কি ভয় নেই প্রাণে একটুও?"

বিপিন বাবু মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্দিগ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন, "সে ত বটেই, সে ত বটেই। কিন্তু কি জানো, ছেলেটা পড়াশোনায় তো তেমন নয়, অথচ এদিকে বেশ একটু শক্তি আছে, দেখ্‌লে না, সেদিন চট্ করে সেই ভারা-ছিঁড়ে পড়া মিস্ত্রীটাকে এক মুহূর্ত্তে কেমন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রক্ত বন্ধ করে দিলে, আর ওর মাষ্টাররাও সব্বাই বল্‌চেন যে, ওদিকে ওর যখন একটা স্বাভাবিক শক্তিই রয়েছে, ও-বিষয়ে আবার এমন একটা সুযোগও উপস্থিত, তখন আর বাধা দেওয়াটা উচিত হয় না। দেখ, গোবিন্দ কি আর বারে-বারেই আমাদের কাঁদাবেন! তাঁর নাম নিয়ে যাতে ওর মঙ্গল হয়, তাই হতে দাও।"

তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। মা ছেলের কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমি কাকে নিয়ে থাক্‌বো রে? তোর মুখ দেখেই যে শুধু পাষাণে প্রান বেঁধে বেঁচে রয়েছি।"

ছেলে হাসিমুখে জবাব দিল, "কেন, তোমার তো আর একজন রয়েছে। তাকে নিয়েই থেক, আমার যেতেই হবে।"

শুনিয়া উর্ম্মিলা চিলের ছাদের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া খানিক কাঁদিল, তারপর দিনে রাত্রে এদিক-সেদিকে উস্‌খুস্ করিয়া ফিরিতে লাগিল যে, যদি এই বিদেশ-যাত্রা উপলক্ষেও তাহাদের মধ্যকার এই সহসাগত, অথচ ইহারই মধ্যে যেন প্রায়দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিরাট্ মৌনতার নির্ম্মম প্রাচীরটা কোন মতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! যদি তেমন ঘটিতে পারে, তবে বুঝি উর্ম্মিলার কাছে এই দীর্ঘদিনের ছাড়াছাড়ির নিদারুণ ভীতিও আনন্দ-সংবাদের মতই মধুর হইয়া উঠে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়কুমারের কলিকাতা গমন উপলক্ষ্য করিয়া তাহার নিজের বাড়ীতে ও পড়সী-গৃহে যখন যাত্রার আয়োজনের ছোটখাট ঘটা করিয়া উঠিয়াছে; উর্ম্মিলার মনের ভিতরে সে সময়ে

নিয়তই একটা অতি ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত চলিতেছিল। তার মনে হইল, তার উপর রাগ করিয়া বিনয় যেন এই রকমে তাহাকে জন্মের মতন ফেলিয়া যাইতেছে। তার অপরাধেরই এ যেন প্রায়শ্চিত্ত। আর এই যে তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে, এরপর আর কখন—কোন দিন কোথাও দিয়াই বা যেন তাহাদের মধ্যের এই ব্যবধান ঘুচিবে না, এম্নি একটা প্রবল আতঙ্কমিশ্র দুঃখ সে তাহার বালিকাচিত্তে এতই তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহা সহ্য করিয়া থাকা তার পক্ষে একান্ত দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল। এবার আর নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার চেষ্টামাত্র না করিয়াই সে যেন একান্ত অসহায়ভাবেই অন্তর্ভেদী দুঃখের হস্তে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া কান্নার আবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিছানা লইল। বামুন-মেয়ে ভাত খাইবার জন্য ডাকিতে গিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত যখন জানাইল, "আহা গো! দাদাবাবু কল্‌কাতায় 'থাক্‌তে' যাচ্চেন কিনা, তাই জন্যে বৌদিমণি কান্‌তে নেগেচে গো! আহা, তানারও মুখটি এতটুকু হ'য়ে শুকিয়ে গেছে।"—তখন উর্ম্মিলার সকল দুঃখ যেন বাঁধ-ভাঙ্গা বর্ষাজলের মত তার বুক ছাপাইয়া পড়িয়া দামোদরের বন্যার মতই হুহু শব্দে ছুটিয়া বাহির হইল। কান্নায় কান্নায় সে যেন আপনাকে এবং দর্শককেও অবসন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া তুলিল।

কিন্তু বিনয় তার এই নীরব কান্নার কোন খবর না জানিয়া অথবা বামুন-মেয়ের মুখে শুনিতে পাইয়াও এটুকুকে পর্য্যাপ্ত বোধ করিতে পারিল না। তার কলিকাতা যাওয়ার খবরেও যখন অপরাধিনীকে লজ্জা-বিপন্ন ও ভয়ত্রস্ত করিয়া তার পায়ের তলায় টানিয়া আনিল না; তখন তার ক্রোধটা যেন দশগুন বাড়িয়া গেল এবং সেই ক্রোধ যতটা হইল, তদপেক্ষায় চারিগুণ বেশী হইয়া দেখা দিল অভিমান। 'উর্ম্মিলা'—যে উর্ম্মিলার জন্য সে তার মা বাবারও কত সময় অবাধ্যতা করিয়া থাকে, তার ছোট-বেলার বন্ধু মাধব, কালু, সুশীল এ সবাইকে যার জন্য সে কত দূরেই সরাইয়া দিয়াছে—পাঠশালায় অগ্রাহ্যের তো সীমাই নাই; সেই উর্ম্মিলা নিজে অত বড় দোষে দোষী হইয়াও কিনা, তার উপর রাগ করিয়া মুখ ফুলাইয়া বসিয়া রহিল! সে কত দিনের মতন চলিয়া যাইতেছে, তা দেখিয়াও তার কাছে ঘাট মানিতে আসিল না! এই উর্ম্মিলার জন্যেই সে স্কুল পালাইয়া আসে! এরই জন্য টিনের ছাদে উঠিয়া আকাচা-কাপড়ে মায়ের সাধের আচার চুরি করিয়া আনিয়া মাকে মনঃক্ষুণ্ণ করে! নাঃ! এ জন্মে আর নয়—যদি মরিবার পরেও এক জায়গায় থাকিতে হয়, তখনও—সে কোন মতেই আর উর্ম্মিলাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।—

তখন অত্যন্ত দৃঢ় ও নিবিষ্টচিত্তে সে নিজের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া লইতে বসিল। অদূর ভবিষ্যতের কলিকাতাকে সে নিজের হৃদয় দিয়া গঠিত করিল। সেখানে কত হাসি, কত আমোদ কতই না বন্ধুজনের সাদর-কোলাকুলি। তারপর পড়া-শোনা, কতই নূতন নূতন শিক্ষা, নব নব সমাজের মধ্যে মেলা-মেশা; দরকার কি তার মধ্যে উর্ম্মিলার কথা ভাবিবার?—শেষকালে যখন বিনয়—ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে, খুব নামজাদা মস্ত ডাক্তার। দু-তিনখানা মোটর, চার-চারটে কম্পাউণ্ডার, মস্ত বড় ডিস্পেন্সারী, আরও কত কি! ভোর হইতে তার দরজায়—উঃ! সে কি ভিড়, —কি ভিড়! আবার বৈকালেও ওম্নি। ওদের দেখাশুনা করিয়া তৈরী মোটরে এই এখানে—ওই সেখানে, সারা সহরটাতেই যেন ঘোড়দৌড় করিয়া বেড়ানো, বাড়ী ফিরিয়া দুটি নাকে-মুখে গুঁজিতে না গুঁজিতেই তখনি আবার দেশের সব চাইতে বড় লোকের বাড়ী হইতে ডাকের উপর ডাক।

বাড়ীর লোকেরা তার পরিশ্রম দেখিয়া কাতর হইয়া বলিতেছে, হাঁগা, দেশে কি আর কোনই ডাক্তার নেই? তাদের কারুকে ডাক না, বাবু যে খেটে খেটে মারা যাচ্ছেন! উত্তর হইল, "আজ্ঞে ডাক্তার তো ঢেরই আছেন, কিন্তু অমন মরা-বাঁচানের শক্তি তো আর তাদের নেই। কাজেই ওঁকে আমরা ছাড়তে পরি নে। দোহাই ডাক্তার-বাবু, শীগগির করে একটীবার চলুন না হলে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়!" আর কি থাইতে পারে? বিনয় উঠিয়া ছুটিল, সে জুতা পরিবার ত্বরা সহে না। তার মাঝখানেই বা তার উর্ম্মিলাকে কিসের প্রয়োজন? নাঃ, কিছু দরকার নাই।

আচ্ছা, উর্ম্মিলার যদি অসুখ করে? ভারি কঠিন পীড়া, তাহাকে তার মা আসিয়া খবর দিলেন, সে কি করিবে?—সোজা মার মুখের উপর—বলিয়া দিবে যে, "আমি কি জানি! তোমাদের বউমার অসুখ, তোমরা ভাল ভাল দেখে ডাক্তার আনাও না; আমি ছাড়াও তো অনেক আছে। আমি আর এমন কি ভাল!"

ভাল ভাল ডাক্তাররা আসিল, রোগ নির্ণয় হইল না; শেষে এমন হইল যে উর্ম্মিলার আর জীবনের কোনই আশা রহিল না, একদিন তো তাকে ঘেরিয়া এ বাড়ীর ও তার বাপের বাড়ীর হইতে আগত লোকেরা কাঁদা-কাটা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন, তখন বিনয় কি করিবে? সে তখন নিশ্চয়ই তার বাপকে গিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, এখন আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি; অবশ্য জীবন-মরণের জন্য দায়ীত্ব এ অবস্থায় আমি লইতে পারি না!—এবং তারপর বিনয়কুমার শীলের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য চিকিৎসা-কৌশলে সেই মৃত্যুমুখীন্ রোগীকে সে অবলীলাক্রমেই বাঁচাইয়া তুলিল! তখন! উর্ম্মিলা তরুণ, কি করিবে? ডাক্তারবাবুর দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া আর পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া—নাঃ, ক্ষমা সে তাহাকে তবুও করিবে না! খাড়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টস্বরে তাহাকে জানাইবে যে, তুমি মরিতে বসিয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমার প্রাণ দিলাম, তাই বলিয়া যে সেই সঙ্গে ক্ষমা করিতে হইবে, তেমন কথা—অন্ততঃ আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে তো লেখে না।

উর্ম্মিলাকে ক্ষমা, সে তো কোন দিনই করা চলিবে না—তার যেমন কর্ম্ম তেমনই তো ফল হওয়া চাই। নতুবা ঈশ্বরের আইন যে ভাঙ্গিয়া যায়। জগৎ হইতে পাপের প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্ত যে উঠিয়া যায়।

এদিকে যেদিন ভোরের ট্রেণে বিনয়কে তার প্রফেসরের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, তার পূর্ব্বরাত্রে উর্ম্মিলা তার অত্যন্ত নিদ্রাশক্তিস্বত্ত্বেও কোন মতে একটী বারের জন্য চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না।

জগদ্ধাত্রীর ক্লান্ত শরীর মন সারাদিনের কান্নাকাটি ঘোরাঘুরির পর গভীর রাত্রে বিছানায় পড়িতেই ঘুমে এলাইয়া পড়িল। তখন উর্ম্মিলা উঠিয়া চুপি চুপি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া চোরের মত পা টিপিয়া ছাদে উঠিল এবং সেখানের একটা কোণে প্রাচীরের গায়ে মিশিয়া বসিয়া মুক্তহৃদয়ে কাঁদিয়া বাঁচিল।

রাত্রি গভীর, চরাচর নিস্তব্ধ-ঘুমন্ত। শীলেদের নিদ্রাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বাড়ীটার পিছনে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি লইয়া সুবৃহৎ উদ্যান। তার শেষ দেখা যায় না, কেবল চারিদিক দিয়া বড় বড়

গাছের মাথাগুলা স্থানটাকে প্রাচীরের মতন ঘিরিয়া আছে, এইটুকুই দেখা যায়, বাতাস আছে কি না বুঝিতে পারা কঠিন, কিন্তু কদাচিৎ একটা সরল দেবদারুর উন্নত-শীর্ষ ঈষৎ নত হইয়া অতি-মৃদু-মর্ম্মর শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। চাঁদের আলো নাই, কিন্তু অতি উজ্জ্বল ও অসংখ্য নক্ষত্রের আলোয় একটা অস্ফুট জ্যোৎস্নার মতই আলো ফুটিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার মৃদু ও স্নিগ্ধ আলোকে উদ্যানের সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকাটা যেন একখানা প্রকাণ্ড রূপার পাত্রের মতন স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নার আলোয় মিশিয়া আলো-আঁধারের জাল বুনিয়া যেন সেখানের সহস্র শীর্ষ বৃক্ষ-রাজীর মাথায় উপরের লজ্জা-বস্ত্রের মতই বিছাইয়া ধরিয়াছিল। উর্ম্মিলা অনেক-খানি শান্ত হইয়া তাদের চিরদিনের শত সঞ্চয়পূর্ণ সেই পাথরে-বাঁধান ঘাটের দিকে চোক স্থির করিয়া চাহিয়া রহিল। ঐ বাগানে কত লুকোচুরি, কত জল ডেঙ্গাডেঙ্গি, কত কানা-মাছি খেলা, আর ঐ পুকুরের জলকে গ্রীষ্মের প্রভাত অপরাহ্ণে তারা কি তোলপাড়ই না করিত। দত্ত-বাড়ীর দু'জন মেয়ে তাদের সঙ্গে খেলিতে আসিত, কিন্তু তারা তো আজ তার মতন এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে না, উর্ম্মিলারই যে সব গেল!

প্রকৃতিকে যতখানি সুপ্ত ও শান্ত বোধ হইয়াছিল, ঠিক যেন ততখানি নয়। প্রকাণ্ড ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা পুরাতন বটগাছের মাথায় কান্নার অনুরূপ একটা কর্কশ চীৎকারে উর্ম্মিলার বুকের মধ্যে ভীতি উদাহরণ পাঠাইয়া দিয়া কালপেঁচাটা ঝট্‌পট্ শব্দে ডানা ঝাড়িয়া উড়িয়া গেল। উর্ম্মিলা ইহাতে আচম্‌কা অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই ও-পাশের রাস্তা হইতে বিশ্ববখাটে তাদের পাড়ারই একটী ছেলে গোবরার গানের শব্দ সে শুনিতে পাইয়া যেন অনেকখানিই আশ্বস্ত হইয়া আবার সেইখানেই যেমন তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই অন্তর-বাহিরের সর্ব্বশূন্যতার মাঝখানে একটা জঘন্য মানুষের ওইটুকু সাড়াকেই তার আজ যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল; নতুবা গান শুনিবার মতন মনের অবস্থা বা সাধ সে সময়ে তার একেবারেই ছিল না।

কিন্তু থাক্ বা না থাক্ গানটা তার কানে আসিয়া পৌঁছিল।—

"কেন রাই একলা বসে বয়ান ভাসে নয়ন জলে,
কেঁদে কি পাগল হবি, শ্যাম কি লো তোর আস্‌বে ফিরে?"

গানটা তার পরিচিত। বিনয়ের গান গাওয়ার যথেষ্ট সখ ছিল এবং বোধ করি এই গোবর্দ্ধনের মুখে শুনিয়া তার অর্দ্ধেকটী সঙ্গীতের সংগ্রহ। বাগানের ঐ বাঁধাঘাটে বসিয়া কতদিনই যে সে তার এই ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটীকে নিজের নূতন নূতন শেখা গানগুলি সাগ্রহে শুনাইয়া গিয়াছে। শুনিয়া উর্ম্মিলা মুগ্ধ তো হইয়াছেই, অধিকন্তু নিজেও সেগুলি গোপনে গোপনে আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইয়া নিষ্ফল হওয়ায় ক্ষুব্ধও বড় কম হয় নাই। সেই গানেরই একটা আজ এমন অসময়ে অন্যের মুখে শুনিয়াই তার বুক যেন ফাটে ফাটে হইল। 'কাঁদিয়া পাগল' হইবারই বুঝি সে আবার উপক্রম করিল। গায়কের সন্দেহের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি নিষ্ঠুর শব্দে তাহারও অন্তরের মধ্য হইতে কে যেন প্রতিশব্দ করিতে লাগিল,—আর কি তার কাছে সে ফিরে আসবে? কল্‌কাতায় কত কি আছে। সে কি সেখানে থেকে উর্ম্মিলাকে আর কখনও মনে করিবে? আবার আবার সুদূর হইতে নৈশ-সঙ্গীতের একটুখানি শব্দ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিয়া তার কানের তারে ঘা দিল।—

"যমুনা-পুলিনে বসে, কাঁদে রাধা-বিনোদিনী,—
বিনে সেই—বিনে সেই—রাকা শশী—বাঁকা শ্যাম।"—

এ কি! কান্নায় কি আজ সারা-জগৎ শুদ্ধই ভরিয়া গিয়াছে না কি? উর্মিলার প্রাণের ক্রন্দন কি আজ সমস্ত বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শুদ্ধ মূর্চ্ছনা তুলিতেছে? তার আসন্ন-বিরহের অপরিসীম ও অসহ্য-বেদনা-জ্বালা কি আজ চির-বিরহ-বিধুরা রাধার অফুরন্ত অশ্রু-জলের মধ্য দিয়াই এমন করিয়া তাহাকেই কাঁদাইতে দেখা দিল। এ কান্নার কি তার কখন আর শেষ হইবে না? সেই ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি চির-যুগযুগান্তর ধরিয়া চির-সাধকের সাধনার মধ্য দিয়াই অফুরন্ত এই অশ্রু-নির্ঝর অনন্তকালের জন্যই কি ঝরিতে থাকিবে? এ অশ্রু-সাগরের কূল-কিনারা কি এই ত্রিযামা-যামিনীর মধ্যযামে এই নিদ্রামগ্ন বিশ্বের অনন্ত কেন্দ্রের অতল অন্ধকারে আজ চিরদিনের মতই হারাইয়া গেল? ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি এই পরিত্যক্তা অনাদৃতা উর্মিলা সে সীমা সন্ধিহীন বিপুল বেদনা সমুদ্রের তীরে আর কোন দিনই পৌঁছিতে পারিবে না?—ঠিক এই কথাগুলি নাই হোক্—ঠিক এই ভাবেরই একটা এলোমেলো ও খাপছাড়া রিক্ততা ও আতঙ্কতায় ক্ষুদ্র বক্ষকে যেন নির্দ্দয়ভাবেই ওই অশ্রুসজল গানের সুর দিয়া চাবুকের পর চাবুক মারিয়া গাহিয়া চলিল,—

"শুকাল কমল-মালা, বাড়িল বি-রহ-জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বি-নে-কালা গুণমণি।"—

উর্মিলা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া দমবন্ধ হইয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—তার মনে হইল, তার সঙ্গে যেন সবাই কাঁদিতেছে। ঐ পশ্চিম-দিগন্তে নব আগন্তুক কলাবশেষ ক্ষীণ দেহচন্দ্রই যেন কাঁদিয়াই অমন হইয়াছে, নক্ষত্রদেরও আর সে জ্যোতি নাই, বাতাস বিলাপের মর্ম্মরে—দেবদারু ও চাঁপা গাছের কাছে বুঝি তারই কথা বলিল? তাহারই সাড়ায় এই শোকের সভায় যোগ দিয়া যেন ভোরের পাখীরা অধীর কূজনে ডাকিয়া উঠিল। বকুলে অশোকে গলাগলি করিয়া ফুলের জলে ঝর্‌ঝর্ করিয়া সহানুভূতির জল ঠেলিল। তার উপর অদূর পূর্ব্বাকাশে উষার সিন্দূর-বিন্দুর লোহিত আভায় ফোটো ফোটো হইতেই তাঁর বেদনাশ্রু শিশিরবিন্দুর রূপে সারাজগতের বুকের উপরেই পড়িতে লাগিল। গভীর বেদনা, বিলাপ ও দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত প্রকৃতি যেন এতটুকু একটী বালিকার সেই অব্যক্ত ও অকথ্য লজ্জামিশ্রিত শোকের উচ্ছ্বাসে পরিতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া রহিল। কিন্তু মানুষ তার সে বুকভাঙ্গা দুঃখ চাহিয়াও দেখিল না!

তারপর অনেকখানি শান্ত হইয়া উর্মিলা উঠিয়া বসিয়া একান্তমনে হরি স্মরণ করিতে লাগিল। যোড়হাত করিয়া সে বলিল, "এক্ষুণি যেন আমার কলেরা হয় ঠাকুর! হে ঠাকুর! আমি তা' হলে তোমায় পাঁচসিকার হরির লুট দোব। এক্ষুণি আমার কলেরা করে দাও, তা' হলে ওর কল্‌কাতা যাওয়া বন্ধ হয়। আমি না হয় মরেই গেলুম, তবুও তো আমার উপর রাগ করে চলে যেতে পারবে না। আর আমি মরবার সময় তো ওকে বলে যেতে পারবো যে, তুমিই আমার সঙ্গে রাগ করে থাক্‌লে বলে আমি হরিকে ডেকে ডেকে ইচ্ছে করেই মরে গেলুম। তা' হলে তো সে জব্দ হবে!—ঠাকুর! ওগো ঠাকুর! তুমি তাই করগো তাই করো।"

পূর্ব্বাকাশে ঊষার খোলা কনকদ্বারের মধ্য দিয়া দিব্যোজ্জ্বল-বেশধারী ভাস্করের ভাস্বর মূর্ত্তি দেখা দিল। তখন জগতের অন্ধকার শোকতমো কাটিয়া আলোকোদ্ভাসিত আনন্দের রূপ ব্যক্ত হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

জগদ্ধাত্রী বাঁ-হাতে চোখের জল মুছিতেছেন, ডান-হাত তাঁর ছেলের খাবারের বাক্সে তার তিন দিনের খোরাক ঠাসিতেছেন; তার পাতে সন্দেশ, পানতুয়া, কচুরি, লুচির স্তূপ সাজাইয়া দিতেছেন।

বামুন-মেয়ে ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল, "জোটের পায়রা দুটি একসঙ্গে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতো—গো; আহা, এমন জোট্ ছাড়া হয়ে দুটীতে দু জায়গায় কেমন করে থাক্‌বে! তাই ভাব্‌চি গো!"

বিনয় এক মুখ খাবার ঠাসিয়া ভারিগালে হাসিয়া বলিল, "বামুন-দিদি! সেখানে আমার খুব মজায় দিন কাট্‌বে; কত কি দেখ্‌বার, শোন্‌বার, শেখ্‌বার আছে! সে কি এমন জঙ্গল! থাক্‌বার আবার ভাবনাটা কি সেখানে?"

"হাজারও থাক্ ভাই! তবু ঘরের চাইতে কি আর কোথাও কিছু ভাল লাগে রে দাদা! নতুন তো দু' দিনেই পুরনো হয়ে উঠ্‌বে, তখন আবার দেখ্‌বে ওই পুরণো! এই জন্যেই প্রাণের মধ্যে হিচড় লেগেছে। এখানে যে বৌদিমণির রাঙ্গা মুখটুকুন্ বাঁধা রইলো, সেটি তো আর ওখানে পাচ্ছো না।"

বিনয় এতবড় দার্শনিক রসিকতাটাকে ফুলান ঠোঁটের সাব্যস্ত অহঙ্কারে উড়াইয়া দিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, রাঙ্গা মুখ না কালা-মুখ!"

"ষাট্ ষাট্! অমন কথা ঠাটার ছলেও মুখে এনো না দাদা! আহা, আমার সোনামুখী মেয়ে!"

আড়ালে দাঁড়াইয়া উর্ম্মিলার বক্ষ দীর্ঘশ্বাসের ভারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

সেদিন শেষ-মুহূর্ত্তেও উর্ম্মিলা আশা করিতেছিল, শেষ-মুহূর্ত্তেও হয়ত বিনয় তাহাকে কাছে ডাকিয়া বিদায় লইবে।

কতবার নিজেই সে তার কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে মনে মনে প্রস্তুত হইল, কিন্তু কিছুতেই কি পারা গেল না।—

কিন্তু তাহা ঘটিল না। উর্ম্মিলার বিষম লজ্জার বেদনাকে প্রচণ্ড গর্ব্বে ভুল করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুপ্তচরের কার্য্যের সহিত তুলা-মূল্য করিয়া তুলিয়া বিনয়কুমার স্ত্রীর নিকটে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ করিল।

বিনয় মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, চারিদিন পরে কলেজ খুলিবে, এই কয়দিনের জন্য সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী সে আসিয়াছে বটে; তথাপি এ কয়দিনে কলিকাতা ফেরৎ বিনয় এম্নি গণ্যমান্য হইয়া আসিয়াছিল যে সমস্ত পাড়া ঘুরিতেই তার দিন কাটিয়া যায়। নূতন গান সে থিয়েটার বাড়ী হইতে শিখিয়া আসিয়াছে, উর্ম্মিলাকে শোনাইবার জন্য প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম,

অথচ বাড়ীতে গাহিলে পাছে বিপিনবাবু শুনিতে পান, সেই ভয়ে গাহিবারও উপায় নাই, অগত্যা কালুদের বাড়ী গিয়াই গাহিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে পুনর্বিদায়ের দিনও দেখা দিল।

জনে জনে বিদায় লইয়াও হঠাৎ যেন কতই প্রয়োজনীয় কি একটা মস্ত কথাই মনে পড়িয়া যাওয়ায় বিনয়কুমার আবার একবার ছুটিয়া আসিয়া নিজের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। তারও যে এই যাত্রা-কালটায় সহিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলা! এখনও তোমার অন্যায় ও অসঙ্গত রাগ পড়িল না! ক্ষমা চাহিলে না!—আচ্ছা, জব্দ হও তুমি, বিনয় কখন আর এজন্মে তোমায় ক্ষমা করিবে মনে করিয়াছ? অসম্ভব! অসম্ভব!

একি রে বাবা!—সে প্রায় নাচিয়া লাফাইয়া উঠিল। তার টেবিলের উপর প্রায় সাইন-বোর্ডেরই লেখার সাইজের অক্ষরে পূরা একখানা ফুলস্কেপ কাগজে গোটা কতক কি যেন লেখা পড়িয়া রহিয়াছিল। তাই দেখিয়া দৌড়িয়া সেখানা বিনয় গিয়া একরকম যেন ছোঁ মারিয়াই তুলিয়া লইল। তাহাতে শুধু এই কয়টা কথা লাল-কালিতে জল্ জল্ করিতেছে,—আমি ঘোর অন্যায় করেছি। আর কখন এমন কাজ করবো না। এবার করলে আমায় তুমি তক্ষণি দূর করে বাড়ী থেকে তাড়াইয়ে দিও। এবারকার মতো আমায় ক্ষমা করো। উর্ম্মি।

বিনয়ের হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন আহ্লাদে দোল খাইয়া উঠিল। তার মনে হইয়া গেল, সে যেন ধর্ম্মাসনে আসীন মুকুটধারী কোন রাজা আর এই উর্ম্মিলা তাহার বিচার-সভায় আনীতা অনুতাপিতা অপরাধিনী। করযোড়ে সে নিজ দুষ্কৃতিজন্য ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিতেছে। একালের সঙ্কীর্ণ মত তখনও সে উত্তমরূপে শিক্ষা করে নাই। তাই দোষ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হইলেও যে ফাঁসি দেওয়া রদ্ হয় না—তেমনতর অনুদারতা তাহার জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ খোস্-মেজাজে সেইটার উল্টা-পিঠে উহারই অনুকরণ করিয়া লিখিল—

"এবারকার মতন ক্ষমা করিলাম। আর কখন এমন কাজ করিলে তোমার প্রস্তাবমত কার্য্য করা যাইবে।" অত্যন্ত লঘুচিত্ত এবং তেমনি লঘুতর ও দ্রুতগতি লইয়া মায়ের কাছে আসিয়া তাঁর গলাটা দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল, "থেকে যাই, কি বলো মা! কলকাতায় আর যায় না।"

মা চোখ মুছিতেছিলেন, আবার সেই রাঙ্গা দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তখনই তো বারণ করেছিলুম বাছা, কেন অমন বিদ্‌কুটে সখ করলি! তা না হয়—কর্ত্তার কাছে একবার বলে দেখ না।"

বিনয় কানে হাত দিয়া লাফাইয়া উঠিল, "ওরে বাবা! তা হ'লে আর রক্ষা আছে!—তক্ষুণি গলা-ধাক্কা!—দেখ মা! এ বেলা আর যাবো না, ভারী মাথা ঘুরুচে, জ্বর হবে না কি! ভাল থাক্‌লে ওবেলা তখন যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি কিন্তু বাবাকে বলো? বলবে তো? আচ্ছা!"

ক্ষণপরে শীলেদের বাগান-বাড়ীর বাঁধাঘাটে বিনয়শীলের তরুণ-কণ্ঠের স্বভাব-মধুর সঙ্গীত লহরের আর উর্ম্মিলার প্রশংসাসূচক মিষ্ট-হাস্যের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া রহিল। তাদের সেই অনেক দুঃখের পরের পাওয়া সুখের মিলন দেখিয়া পাখীরা আনন্দের গান গাহিতে লাগিল, বাতাস সুখের মর্ম্মর তুলিল, ফুলেরা সুরভিশ্বাস ছাড়িল।

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

একজন বিশিষ্ট রাজ-আত্মীয়ের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে দেশে দেশে সমারোহ চলিতেছিল; তাহারই একটা বড় রকমের ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছিল ভূতপূর্ব্ব ভারত-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপরে। সহরে পত্র-তোরণে পুষ্পমাল্য, রক্তনিশানে স্তুতিবাক্য, উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত ভক্তি-অর্ঘ—কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ঘরের দৈন্য এবং অন্তরের বিষাদ-ব্যথা আলোক-লহরে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সারা সহর একটা আলোকোৎসবময় নাট্যশালায় পরিণত হইয়াছে।—

এই রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য কলিকাতার কোন বড় রাস্তার উপরকার একটা বড় বাড়ীতে এক ধনাঢ্য গৃহস্বামীর পরিচিত জনকয়েক আত্মীয়-বন্ধুর নিমন্ত্রণ ঘটিয়াছিল। নিমন্ত্রিতগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু সামান্য পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়া দেখিলেন যে গৃহস্বামী তাঁহাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। রাস্তার ধারের চওড়া বারান্দায় সারি সারি কেদারা পাতা, দেবদারুর মালা ও গাঁদাফুলের স্তবক-ঝুলান খিলানের ভিতরদিকে যে সকল পাতলা নেটের পরদা একটুখানি করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহার দুই ধার রেশমী-ফিতায় বেশ শোভন করিয়া বাঁধা; মধ্যে মধ্যে দু'তিনটা মার্ব্বেল ত্রিপদীতে রৌপ্য-আধারে ফুটন্ত গোলাপের তোড়া, তাহারই একাধারে কটকী রূপার থালায় সুগন্ধি সিগারেট ও সিগার, ঐ দেশজ স্বর্ণমণ্ডিত উত্তম কারুকার্য্যযুক্ত ডিবা ও রেকাবে সোনালি পাতজড়ান পান, দেশী এবং বিদেশী কায়দার আতিথ্য-পালন সম্বন্ধীয় সকল জিনিষই প্রস্তুত রহিয়াছে। অতিথিবর্গ আসন গ্রহণ করিবামাত্র বিলাতী-ধরণে গরম চায়ের সহিত রসনা-রস-সঞ্চারী কেক্ বিস্কুটেরও আমদানী হইতে বাকী থাকিল না।

অভ্যাগতদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বড় বেশী নয়; মাত্র জন পাঁচ-ছয়। নামজাদা প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ করের তরুণী গৃহিণী মিসেস্ কর সিঁড়ি উঠিবার সময় একবার এবং বারান্দায় পৌঁছিয়া আর একবার আশে পাশে চাহিতে চাহিতে আত্মগতই প্রশ্ন করিলেন—"কই 'বেবি'কে দেখ্‌ছিনে যে!"—পরক্ষণেই তন্মুহূর্ত্তে সম্মুখে আগতা দ্বিতীয়া মহিলাটীকে [তিনি পাটনা হাইকোর্টের নূতন জজ মিঃ নিয়োগীর স্ত্রী মিসেস্ নিয়োগী] সম্বোধন করিয়া সাগ্রহ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "এ' কি রকমটা হলো! মিঃ লাহার বাড়ী নেমন্তন্ন, আর বেবিই আসেনি?"

সম্বোধিতা মিসেস্ করের এই বিস্ময়-বিপন্নতা লক্ষ্যে ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "এখনও যথেষ্ট সময় আছে, এলা! এর মধ্যেই তুমি হাল ছাড়্‌চো কেন?"

দুজনেই মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল; ঠিক পার্শ্বেই দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তিটীর কর্ণও ইহাদের আলোচনা হইতে বিরত ছিল না, ইহাদের হাসির আভাস তাঁহার মুখকেও একটুখানি রঞ্জিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

রাস্তার দু'সারি বন্দুকধারী সিপাই ঠিক এক হাত অন্তর সারি দিয়া চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া

আছে। তা ছাড়া গুপ্ত পুলিসের যে কতজন লোকই বিভিন্ন সাদা পোষাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তার হিসাব পুলিসের বড় কর্ত্তারা ভিন্ন আর কেই বা জানে? তাঁদের বোধ করি মরিবার মত 'ফুরসুৎ' ছিল না, দ্রুত-পরিচালিত মোটরে সমুদয় রাস্তাটার আপ্রান্ত না হইবে তো অন্ততঃ এক শতবারও তাঁহারা পরিক্রমণ করিয়া অটুট শান্তিরক্ষার একান্ত অশান্তিতে নিজেকে অস্থির ও অন্যকেও বিব্রত করিয়া তুলিতেছিলেন, গাড়ী ঘোড়া লোক-চলাচল বন্ধ হইবার সময় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রাস্তার দু'ধারের ছাদ ও বারান্দা লোকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, যেদিকে চোখ ফিরাও কেবল নরমুণ্ডেরই লহরী।

মিসেস্ করের চঞ্চল-দৃষ্টি পুনঃপুনঃই দৃশ্যমান রাজপথটার এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতেছিল; এইবার আরও একবার সে নিজের মনের উদ্বেগ-কৌতূহল প্রকাশ করিয়া ফেলিল— "বেবি তা' হলে আর এলো না। বলি তার আজকে আবার হলো কি? অ্যাঁ! কতদিন ধরে এই সব যোগাড়-যন্ত্র সেই তো করে রেখে গ্যাছে!"—

আর একটী কম বয়সের মেয়ে ইহার ঠিক পাশেই আসন লইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেবি, কার বেবি, এলাদি? তোমার বেবিকে বুঝি নিয়ে আস্‌তে বলে এসেছিলে?"

এই কথায় দু-চারিজন শ্রোত্রী কলঝঙ্কারে হাসিয়া উঠিলেন, শ্রোতাদের অধরপ্রান্তও ঈষৎ হাস্য-কুঞ্চিত হইল, তবে ভদ্রতার খাতিরে হাসি তাঁদের ঠোঁটের বাহিরে আসিতে পাইল না, এলা লজ্জাবিপন্নতায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মৃদু-তিরস্কারে কহিয়া উঠিল, "আহা মরে যাই! আমার 'বেবি' কেন হ'তে গেল! মিস্ মল্লিককে সবাই 'বেবি' বলে ডাকে না?"

এলার প্রবাস-প্রত্যাগতা বন্ধুটী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর করিল—"তা কেমন করে জান্‌বো ভাই! তিনি আবার কে?"

এলা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল—"আহা মিঃ লাহার বাড়ী নেমন্তন্ন এসেছেন, আর 'বেবি'কে চেনেন না! ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে কৃষ্ণা মল্লিক গো, চেনো না নাকি?"

"ওঃ, তাই বলো, কৃষ্ণা মল্লিক। সেই যে উৎকৃষ্ট পিয়ানো বাজাতে পারে তো? ক'বচ্ছরই উপর উপর লরেটোয় মিউজিকের পরীক্ষায় ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছিল না? সেবারে তখনকার প্রিন্স্ এখানে আস্‌তে সেই যে ছোট মেয়েদের দিয়ে 'প্লে'টা করান হয়েছিল; তাইতে অফিলিয়া সেজে কি সুন্দর অভিনয়ই যে করেছিল! সে যেন আমার আজও চক্ষের ওপর ভাস্‌ছে। মা গো, মরণটা অবধি যেন আশ্চর্য্য সুন্দর!—করেছিল অতটুকু মেয়ে।..." এই বলিয়া সমুজ্জ্বল পূর্ব্বস্মৃতিকে আর একবার স্মৃতিপথে আনিয়া উৎফুল্ল-মুখে মেয়েটি এবার সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তা কৃষ্ণা—মিস্ মল্লিক আসবেন তো? একবার দেখাও হয়ে যাবে তা হলে! ও কিন্তু আমাদের চেয়ে কিছু ছোটই হবে। আমার তো দু-ক্লাস নীচেই পড়্‌তো তখন। দেখ্‌তেও অনেকটা ছোট্ট ছিল। পাতলা একহারা গড়ন, টক্‌টকে কাঁচা সোনার মতন গায়ের রং, একপিঠ কোঁকড়ান চুলে প্রায়ই একটা সাদা না হয় খুব হাল্‌কা রংয়ের ফিতে-বাঁধা, সাদা ভিন্ন কোন রংয়ের ফ্রক্ পরতে কক্ষণো দেখিইনি, আর তাতেই যেন তাকে পরীটির মতন দেখাত। মেমগুলো তো ওকে আদর করে করে অস্থির করে দিত। রূপটাও খুব বেশী ছিল, আবার তার সঙ্গে গলাও ছিল কি তেম্‌নি চমৎকার! ওকে বুঝি বাড়ীতে 'বেবি' বলে ডাকে? সে আমি জানতুম না, আসচে না কেন? আসবে তো?

আচ্ছা কি যে বল্‌ছিলে, ওই যে মিঃ লাহার বাড়ী এসে 'বেবি'কে না জানাটা কি নাকি একটা ঘোর অপরাধের সামিল না কি ?—"

"নিশ্চয়।"

মেয়েটির নাম মুরজা, মুরজা কিছু সরলা অর্থাৎ বোকা,—সে বিস্মিত হইয়া কহিল—"তার মানে ?"

এলা হাসিয়া ফেলিল, "তার মানে কিচ্ছুই না, আবার সবই, অর্থাৎ কি না—"

পাশের ঘরে বুট-জুতার খটাখট্ শব্দ দ্রুত ধ্বনিত হইল, এক মুহূর্ত্ত পরে গৃহস্বামী মিঃ লাহা ঘরের পরদা সরাইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"আপনাদের সব অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রাখ্‌তে জোর করেই বাধ্য হয়ে প'ড়েছিলুম—মাপ কর্‌বেন, মিসেস্ নিয়োগী !—মাপ কর্‌বেন মিঃ ব্যানার্জী ! মিঃ ঘোষ ! আপনাদের সব্বাইকার কাছেই হাত যোড় কর্‌চি,—কটা দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি, অথচ কাজ এখানেও ছুটে তাড়া করে এসেছে করি কি বলুন ?

ওঃ, এই যে মিসেস্ আতর্থি ! আপনিও অনুগ্রহ করে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। তোমায় এতক্ষণ চিন্‌তেই পারিনি যে, কে,—সতীশ ? মুরজা ! এই যে তুমি ! আগ্রা থেকে কবে এসে পৌঁছিলে ? কই মিঃ চৌধুরীকে দেখ্‌চিনে যে ?—ওঃ, তিনি ছুটী পান্‌নি ! তুমি একাই এসেছ ? যাই হোক্, অনেক দিন পরে দেখাটা তো হ'য়ে গেল ! তুমি আমার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ, এতে কত যে আনন্দ হলো বল্‌তে পারিনে।"

মিঃ লাহা যতক্ষণ ভদ্রতার আদান-প্রদান করিতেছিলেন, কাহারও সহিত করমর্দ্দন, কাহাকেও নমস্কার, কাহারও প্রতি শুদ্ধমাত্র একটুখানি টানিয়া আনা ভদ্রতার হাসি ইত্যাদি যথাযোগ্য আদর আপ্যায়নের মধ্যেও সকল সময়েই তাঁহার উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। গহন বনে হারাইয়া যাওয়া রত্নের মতই তাঁহার সেই হারান ধন কিন্তু খুঁজিয়া মিলল না। আগ্রহ ও আবেগে আরক্ত ও উৎফুল্ল মুখের ছবি তাহার সমস্ত উজ্জ্বলতা হারাইয়া অকস্মাৎ ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। সমাগত সম্মানিত বন্ধুবর্গের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা না দেখাইতে পারিলেও, তাঁরা যে ইঁহার নিকট একান্তই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছেন, সেটা বেশ বুঝা গেল।

রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক এম্‌নি সময়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের বাঁশী বিপুল শব্দে বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে সেই কালো রংয়ের প্রকাণ্ড "মিনার্ভা" গাড়ী-খানাকেও দেখা গেল। গাড়ীটা চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে লাহা-প্রাসাদের সম্মুখীন হইয়া থামিবার উদ্যোগ করিল, এবং ততক্ষণে মিঃ লাহা ছুটাছুটি নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার লোকেরা, কি মেয়ে—কি পুরুষ—একটু ব্যগ্র কৌতূহলের সহিত লোহার রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই নব আগন্তুকদের দেখিতে লাগিলেন। যাঁরা কিছু দূরে ছিলেন, আগ্রহ-দমনে অপারগ হইয়া উঠিয়া আসিলেন। কেহ কেহ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে পার্শ্ববর্ত্তীকে শুনাইয়া অথবা নিজেকেই শুনাইতে চাহিয়া মন্তব্য করিল, "নিশ্চয়ই 'তাঁরা',"—

পুরুষ-দলের মধ্যে মুরজার মতন আর কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন; "কারা হে ?"

"কেন, মিষ্টার আর মিস্ মল্লিক, তা' ছাড়া আবার কে হবে ?"

লোকটী একটু অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার আর মিস্ মল্লিক ওঁর কে' হন ?"

ভদ্রলোকটী একটুখানি মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "হন না—হবেন 'কেউ' শীঘ্রই।"

"ওঃ, মিস্ মল্লিকের সঙ্গেই বুঝি তরুণের বিয়ে হবে ?"

"সেই রকমই তো উভয় পক্ষের চেষ্টা—আজ ক'বছর ধরেই চলে আস্‌ছে

"এতদিন তবে হয়নি কেন ?"

ভদ্রলোকটী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সমধিক মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "বাঃ ! হবে কেমন করে ? সে গুড়ে যে বালি ! তরুণ ছেলেটী তো আর জাত-সাহেব নয়, ও যে সক্বত-ভঙ্গ !"

"সে কি রকম ?"

"বাপ ওর হিন্দু-সমাজের লোক। বিয়ে হয়েছিল ওর ঠিক সতের বচ্ছর বয়সে এক এগার বছরের মেয়ের সঙ্গে। তারপর বয়স হতে না হতে তরুণ হঠাৎ সাহেব হলো, বাপকে গিয়ে বল্‌লে সে বিলাত যাবে। বিস্তর কান্না কাটুনা রাগ দুঃখ, শেষে প্রাচীনের পরাভব। তরুণচন্দ্র বছর কতক পরেই অ্যাসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ টি, সি লাহা হয়ে ফিরে এলেন।"

শ্রোতা কিছু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "আর বউটার ?"

"বউটা তার শ্বশুরের বাড়ী রৈল। মৃগী রোগী আধ-পাগলা মেয়েটা তরুণ চলে যাবার পর থেকেই প্রায় অন্ন-জল ত্যাগ করে পড়ে থাক্‌তো, মাথা আরও খারাপ হয়ে গেছ্‌লো। তরুণ যখন ফিরে এলো, তখন সে "আন্‌ডার সেন্‌টেন্‌স্ অফ্ ডেথ্", ' অর্থাৎ ?" [মৃত্যুদণ্ডের অধীনে।]

"তার দুর্ব্বল শরীরে মনের অত্যন্ত আঘাতের ফলকে ডাক্তারে কন্‌জম্‌সন্ বলেই স্থির করে দিয়েছিল। দিনে দিনে ক্ষয় হতে হতে সে তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দোরের কাছেই বসেছিল। শুনেছি, সে দৃশ্য সইতে পার্‌বে না বলে—তরুণ তাকে একবার চোখের দেখা দেখ্‌তেও যায়নি। বাপের সঙ্গে দেখা করেই চাকরী-স্থানে চলে গেছ্‌লো। বাড়ীর লোকেও ভয়ে বউকে কিছুই বলেনি ; কিন্তু তবু সে নাকি ওর পায়ের শব্দ দূর থেকে শুনে চিন্‌তে পেরেছিল, ও তাই নিয়ে মহা হাঙ্গামা করেছিল। সে যাক্, এ বিয়ে তারই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় এখনও হ'তে বাকি আছে। বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গেছে, বিলাত যাবার আগে থেকেই নাকি এদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে ; মেয়েটী তখন অবশ্য কনভেন্টের ছাত্রী। আর ছেলেমানুষও ছিল। বাপের টাকা ও ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি দেখে বাপ তখনই মতলবে পড়ে—ওকে ভজন সজন দিয়ে বিলাত পাঠায়,—তখন অবশ্য জান্‌তো না যে, ও বিবাহিত।"

"তরুণ কিছু বলেনি ?"

"না।"

"তারপর কি করে জান্‌লে ?"

"তরুণের ফির্‌তে কিছু দেরী হয়, সেখানে ক'বচ্ছর চাকরী করে—তারপর কাজে পাকা হয়ে না ও এলো, ফিরে এসেই সব ফাঁস্ হলো। মেয়ে ততদিনে ডাগর হয়েছে, বিয়ের কথা উঠ্‌তেই ও বল্‌লে আরও কিছুদিন যাক্। মল্লিক তা'তে আপত্তি তুল্‌লে। তখন আধমরা

স্ত্রীটার খবর দিতেই হলো এবং প্রথম একটুখানি মন কষাকষির পর অগত্যাই সেটাকে মরুতে সময় দিতে হচ্চে। শুনেছি, মল্লিকের মেয়ে নাকি একদিন অনেক জেদাজেদি করে স্ত্রীটাকে দেখ্‌তেও পাঠিয়েছিল।"

"তা মেয়েটা তো তা' হলে ভাল বল্‌তে হবে?"

"ওঃ, ও-সব ডাইনীর মায়া হে! মনে মনে মতলব বোধ হয় যে, মরুতে কত দেরী, সেইটাই যাচা।"

"বউটা কি কর্‌লে?"

"ঠিক জানিনে। তবে শুনেচি, সেই দিন থেকেই তার রোগ খুব বেড়ে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, সে এখন মরণাপন্ন।—এর উদ্দেশ্য হয়ত মন্দ নাও থাকৃতে পারে; কিন্তু ফলটা হ'লো ওরই সপক্ষে। কারণ, ডাক্তারে বল্‌চে—হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনার জন্য অতিশয় দুর্ব্বল লাংএর—"

"—ওরা বোধ হয় আস্‌চে।—"

মোটর থামিতেই একটী উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে নামিয়া পড়িল এবং তাহার প্রসারিত কোমল হস্তের অবলম্বনে যিনি কষ্টে নামিয়া আসিলেন, তিনি একজন পলিত-কেশ বৃদ্ধ। প্রথম-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বয়সের চেয়ে জরা তাঁহাকে অনেক বেশী প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে এবং তিনি অন্ধ।

"আসুন, আসুন—মিঃ মল্লিক! ওঃ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনিও আজ এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন!—এত দেরি করে আস্‌তে হয়...!"

মিঃ লাহা প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই নিজের সর্ব্বক্ষণ প্রতীক্ষিত অতিথিদ্বয়ের সহিত উল্লিখিত সম্ভাষণ করিলেন। শেষ-কথাটা অবশ্য একটু নিম্নস্বরে অপরার প্রতিই প্রযুক্ত হইল, বৃদ্ধকে নহে। মিঃ লাহার সুন্দরী অতিথি তাঁহার ঔৎসুক্য-চঞ্চল ও আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে একটা চকিত কটাক্ষ করিয়াই মুহূর্ত্তে ঈষৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া গিয়া ত্বরিৎ-কণ্ঠে উত্তর দিল—"বড্ড দেরি হয়ে গেল, মাপ কর্‌বেন। আচ্ছা আপনি বাবাকে নিয়ে উপরে যান,—আমি এক্ষণি যাচ্চি।"—এই বলিয়া সে গাড়ীর সোফারকে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ইসারায় ডাকিল।

মিঃ লাহা এই সংক্ষিপ্ত ক্ষমা-প্রার্থনা ও কৈফিয়তে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; মল্লিকের সান্নিধ্য হইতে একটুখানি সরিয়া আসিয়া মৃদুমন্দ স্বরে তিনি ক্ষমা-প্রার্থনাকারিণীকে অনুযোগের সহিত কহিলেন—"আমায় তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে, তার শাস্তি নিতে হবে, অম্‌নি ছেড়ে দেবো না, এম্‌নি মনে হচ্ছিল, কার জন্য এ সব বল তো?"

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া চাহিল। তখন তাহার মুখের ঈষৎ বিবর্ণ ম্লানিমা ভেদ করিয়া ভোরের পাণ্ডুতার উপর সূর্য্যালোকের মতই প্রসন্নস্মিত-হাস্যের আলোকদীপ্তি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকে যেন সুন্দরতর দেখাইতেছিল। সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল দীর্ঘ পক্ষ্মে ঘেরা দুটি চোখে বিপুল কৃতজ্ঞে আনন্দ ভরিয়া সেই যে সে বারেক চাহিয়া দেখিল, সেইটুকুতেই যেন ইঁহার সমস্ত হৃদয় প্রাণ একেবারে তারে তারে বাজিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সমুদয় অন্তর বাহির যেন সেইটুকু হাসি চাহনিতেই একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া কানায় কানায় উপছিয়া পড়িতে গেল। স্থানকাল সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়া তিনি মিস্ মল্লিকের

কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত শুক্তি-শুভ্র মৃণাল বাহুমূলে একটা অতি মৃদু সোহাগের টিপুনি দিয়া আদরে-গলানো মৃদু সুরে কহিয়া উঠিলেন, "আবার দুষ্টুমী করে হাসি হচ্চে!"

বারন্দার উপরে যেখানে শত চক্ষু অদম্য কৌতূহলে চাহিয়াছিল, সেইদিকে বারেক চোক তুলিয়াই কৃষ্ণা উহাকে সলজ্জ শাসনে অনুচ্চকণ্ঠে সাবধান করিয়া দিল—"ওঃ—ডোণ্ট মেক ইউ ফুল্! কত লোক চেয়ে আছে দেখ দেখি!"

মিঃ লাহা দিব্য সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমাদের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত কার? যদি কারু থাকে, সেও আজ ভাল করে জানুক্, তাতে আমার লাভ বই লোক্সান নেই।"

মন্মথের ফুলধনু তুল্য ভ্রূযুগলে গুণ চড়াইয়া বক্র-কটাক্ষে চাহিয়া সে কলঝঙ্কারে ধমক দিয়া উঠিল, "যান্, যান্, অত আর কথা বল্তে হবে না!"

তারপর ড্রাইভারটাকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে লাগিল। ততক্ষণে গৃহস্বামী তাঁহার গৃহাগত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর পরিচর্য্যা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ-অভ্যাগতের শোভাযাত্রা রাজোচিত ধূমধামের সঙ্গেই বাহির হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম বিশালকায় ভীমকান্তি দেশবাসীর ভীতিদায়ক কলের কামানের সারি, তারপর অশ্বারোহী ও তৎপরে পদাতিক অস্ত্রধারী গোরা-সৈন্যের শ্রেণী, সূর্য্যকিরণে তাহাদের মাথার মুকুট-প্রতিমা ধাতুময় শিরোস্ত্রাণ ও হস্তধৃত মুক্ত কিরীচ শত সূর্য্য-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাদের দর্পিত গতি, নির্ভীক ও নির্ম্মম দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের বক্ষে কি যেন এক অজ্ঞাত শঙ্কায় একটা শিহরণ স্বতঃই আনিয়া দিয়া যাইতেছিল। শত শত রাজন্যবৃন্দের বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণের বহুতর শরীর-রক্ষীর মধ্যগত হইয়া রাজাত্মীয়ের যান দেখা গেল, হিন্দুর দেবপ্রতিমার মতই তাহা নীরব নিশ্চল; চারিদিকের সুখে-দুঃখে নির্ব্বিকার উদাসীন,—উচ্চনাদে জয়ধ্বনি উঠিয়া বাদ্যধ্বনি ঢাকিয়া দিল। মন্থরগতি চলন্ত ট্রেনের মতই শোভাযাত্রা নিজের গতিপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে চলিয়া গেল।

আড়ালে বসিয়া 'রাজা-উজির-মারা' চিরন্তন রীতি; এই সনাতনপ্রথার ব্যতিক্রম কেহই আশা করিতে পারে না।—তারপর আর একটা কাজের কথা উঠিল।

"তোমার দরবার দেখ্তে যাবার কি হলো?"

এলা মুখভার করিয়া জবাব দিল, বলো কেন? পরশু যাবার দিন, এখন পর্য্যন্ত এর নিয়ে তর্ক করতে করতে প্রান বেড়িয়ে যাবার যোগার। আমার মামাত-দেওর সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরে আমাদের ওখানে এসে উঠেছে না? সে এই শুনে পর্য্যন্ত একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে। বলে 'পুরুষদের না হয় চাকরীর খাতিরে যেতে হয় হলো; কিন্তু তোমরা কেন অনর্থক ওই সব বড় বড় সভা-সমিতিতে অনর্থক ফ্যাসান কিনতে চাল খারাপ করতে যাও? এই সব রাজা-রাণী লাট-দরবারে মেশামেশি করে শুধু মেজাজগুলো বড় হয়ে ওঠে; খরচের অন্ত থাকে না এবং তোমাদের

দেখে সমস্ত সমাজে বিলাসিতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব জন্যে এখন ধনীর ধন দেশ-হিতকর কোন কাজেই লাগ্‌তে পায় না'।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাঁর মতে কি দেশ-হিতের জন্য সর্ব্বস্ব খয়রাৎ করে দিয়ে, দেশশুদ্ধ লোক ফকিরী নেবে? যার আছে, সে কেন ভোগ করবে না? মেয়েরাই বা কেন চিরদিন ধরে কূপ-মণ্ডুক হয়ে থাক্‌তে যাবে? এসব ওঁদের বাড়াবাড়ি।"

এলা কহিল, "বাড়াবাড়ি না বাড়াবাড়ি! এঁকেও কি কম বল্‌চে। বলে যারা আমাদের জাতকে জাতশুদ্ধ তুলে গাল দিতে ছাড়ে না; যাদের কাছে দেশের সর্ব্বপ্রথম-শ্রেণীর বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী-মানী ও ধনী-ব্যক্তিদেরও সমস্ত সম্মান—তাদের দেশের অতি সাধারণ শ্রেণীর একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর দ্বারাও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে বাধে না; এবং তার ন্যায়-বিচার না হয়ে অন্যায় অবিচারই হয়, তাদের দরবারে যে আমাদের কতটা মান, সে যে একজন শিশুতেও বুঝ্‌তে পারে! এই যে জাতের গায়ে জুতোর ঠোক্কর মেরে তোমায় বা আমায় একটু আপ্যায়ন করা, এতে কি স্পষ্টই বলা হয় না যে, 'তোমার সাতগোষ্ঠি সব পাজি; তবে তুমি? তা যখন আমার সেবা করতে ইচ্ছুক তখন কতক ভদ্রলোক,' এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বল্‌বে, তুই যাবি বোধ হয়?

কৃষ্ণা কিছু উষ্ণ হইয়া কহিল, "হ্যাঁ ভাই, আমি যাবো আমার গায়ে লতমোসিয়া লিজসের হাওয়া লাগেনি তো! ভগবান্ যাদের ছোট-বড় করে তৈরী করেছেন, তারা সব্বাই ঠিক এক হবে কেমন করে? ভুল বিশ্বাস! আমি বলে এরই সাত'শো টাকা দিয়ে একটা নতুন বেনারসীর স্যুট্ই করালুম! আর এই মুক্তটাও এইজন্য কেনা!"

এলা নিজের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া ব্যগ্র হইয়া কৃষ্ণার কণ্ঠশোভিত মুক্তামালাটি পরীক্ষা করিতে লাগিয়া গেল।—"ভারি চমৎকার তোকে মানিয়েছে ভাই! তাই বা কি বল্‌বো, তুই যা পরিস্ তাতেই মনে হয়, অমন সুন্দর বুঝি আর কিছুই দেখাত না! তোর দেখে দেখে অমন কত জ্যাকেট শাড়ী গহনা তৈরী করিয়ে শেষে পরতে গিয়ে হেসে মরি। আমাদের গায়ে তেমন করে মানাবে কেন? আচ্ছা, সেদিন ভাই তুই যে আস্‌মানী রংয়ের শাড়ী আর ব্লাউজটা পরেছিলি, সেই যে খুব হাল্কা কালাপত্তুর কাজকরা, সেটা ভাই কোথায় তৈরী করিয়েছিস্ বল তো? চুনির ব্রেস্‌লেটাও তোর খুব সুন্দর হয়েছে! কত পড়্‌লো বল্ তো?"

"সে ভাই বেনারস থেকে বাবা আনিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই চুড়িটা ওটা—ওটা—"

"বুঝেছি গো, বুঝেছি! ওটা তোমার একজনের 'প্রেজেণ্ট' করা! তা সেটা স্পষ্ট করে বল্‌লেই তো হয়, আমার কাছে আবার অত লুকোচুরি কেন শুনি?"

শরৎকালের রজত শুভ্র-মেঘের কুঞ্জ যেমন অস্ত-সূর্য্যের রক্তালোকে রঞ্জিত হইয়া উঠে, সখীর পরিহাসে কৃষ্ণার শুভ্র-মুখ তেমনি লোহিতাভা ধারণ করিল, "না ভাই, ওরকম করে বল্‌ছিস্ কেন? এবারকার জন্মদিনে তোরাই কি আমায় 'প্রেজেণ্ট' করিস্‌নি? উনি দিলেই বুঝি যত না দোষ হয়? যাঃ! আবার হাস্‌ছিস্! যাঃ ভাই! তোর অত হাসি আমার ভাল লাগে না!"—

এলা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা তুই রাগ করছিস্ কেন বল্‌তো বেবি?

বেশ তো করেছেন, দিয়েছেন তার হয়েছে কি? হ্যাঁ ভাই! লাহাদের শুনেছি নাকি কতকাল পূর্ব্বের একটা মুক্তামালা আছে, এখন নাকি সেটার দাম দু'তিন লাখ টাকাও উঠ্‌তে পারে, সত্যি?"

কৃষ্ণা আরক্তমুখে উত্তর দিল, "কি জানি ভাই, শুনেছি তো তাই।"

"তোর খুব আনন্দ হচ্চে বোধ হয়! একদিন সে ত সব তোরই হবে!"

কৃষ্ণার মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল, "যাঃ!—তা' সে ভাই যখন হবে তখন হবে, এখন তার কি? তবে উনি আমাদের সঙ্গে খুবই বন্ধুর মত ব্যবহার করে থাকেন; কিছুতেই তাই না বল্‌তে পারিনে! বল্‌লেও এত দুঃখিত হন, সে কি বল্‌বো।—এই দেখ না, দরবার দেখ্‌বার ইচ্ছে জানিয়েছিলুম, একেবারে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেচেন; বল্‌চেন, ওঁর সঙ্গে যেতে হবে,—"

"তা কি এমন অন্যায় করেছি, বলুন তো মিসেস্ কর! আমাদের দেশেও যে ইউরোপীয়ানদেরও লজ্জা দেবার মত সৌন্দর্য্য থাক্‌তে পারে, সে সম্বন্ধে এক আধটা অভিজ্ঞতা কি ওদের পাওয়া উচিত নয়? মণিমাণিক্য সবই যদি আমাদের লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকে, তা' হলে অগত্যাই ওদের ধারণা না জন্মাবে কেন যে এটা শুধু—"

এলা হাসিয়া ফেলিল, "কয়লারই খনি,—কেমন না? শোন্ বেবি! শোন্! মাই ফ্রেণ্ড! লজ্জা পাবার কিছু নেই, উচিত কথাই তো বলেছেন! সত্যি আমাদের মত রূপ নিয়ে মেমসাহেবদের মহলে গিয়ে দাঁড়ান শুধু দেশকে হাস্যাস্পদ করা। তা সত্যি, বেবির মত রূপই রাজারাজড়ার দেখ্‌বার যোগ্য!—"

"যাঃ! তুইও আবার তেমনি। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! রাজা-রাজড়াদের তো আমাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখ্‌বার জন্যে ঘুম হচ্চে না!"

"আহা, বড় দুঃখ যে গো! মিষ্টার লাহা! শুন্‌চেন তো বেবির দুঃখের কথাটা! সাবধান!"

"যাঃ তুই খালি খালি যা' তা' বল্‌বি তো আমি এক্ষুণি চলে যাব।"

"ওগো না না, তা যেও না, এখনই একজন চক্ষে সব অন্ধকার দেখ্‌বেন। তুমি যখন আসোনি, সে কি মুখই যে হ'য়ে উঠেছিল! ওমা! ওরা কে গো! কি স্পীচ্ কর্‌চে শোন্ তো।"

রাস্তা খোলা পাইয়া ততক্ষণে আবদ্ধ জনতা জনস্রোতের মতই গতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল, দু'একটা পুলিশ ভিন্ন অস্ত্রধারী রক্ষীদলের আর কাহাকেও দেখা যায় না। সেই জনতার একধারে, অপর দিকের ফুট-পাথের উপর তরুণ-বয়সীদের একটা ছোটখাট ভিড় জমিয়াছিল, এবং তাহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটী সুদর্শন যুবক উচ্চ-কণ্ঠে সেই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছে দেখা গেল! কি বলিতেছে, শুনিবার জন্য সকলেই একটু কৌতুহলী হইয়া চুপ করিতেই এই কথাগুলা কানে আসিল।

"দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি, বন্যার সহচর, মহামারীর মহানন্দ ক্ষেত্র,—আর এ সকল দুর্ব্বিপাকের মূলীভূত বিবিধ কারণসমূহ যে দেশকে উৎসাদিত করিতে বসিয়াছে, তার সেই রোগ-বিক্ষত শরীরে এত সজ্জা দেখিলে দর্শকের সন্দেহ জন্মানও আশ্চর্য্য নয় যে, হয় ত তাহার মস্তিষ্কেরই স্থিরতা নাই! যে দেশ দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ রোগ-শোকে অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে, সে দেশে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সেই রোগ দারিদ্র্যনাশের কথঞ্চিৎ চেষ্টায় ব্যয় না করে, আলোক-মালায় বাজী-বাজনায় ভস্মীভূত কর্‌তে দেখলে শরীর মন কি শিহরিয়া উঠে না? আর—যে দেশের মেয়ে বিবস্ত্রা হবার ভয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন, তারই দেশ-ভগিনীগণ সহস্র সহস্র মুদ্রা নিজের বিলাসব্যসনে অকাতরে ব্যয় করে, দরবার দেখ্‌তে চলেছেন! এই কি সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ? এরই

ত্যাগের মাহাত্ম্য না একদিন সমস্ত পৃথিবীময় বিঘোষিত হয়েছিল? আর আজ? হায় মা ভারত-লক্ষ্মীগণ! তোমরা পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে পড়ে এর স্বাভাবিক দয়া-ধর্ম্মকেও কি পৃথিবীর সকল দেশেরই পায়ের তলায় বিসর্জ্জন দিলে?—"

শ্রোত্রীবৃন্দ ঈষৎ অসন্তোষের সহিত প্রায় ঔষধ গেলার মতন করিয়া এই ধৃষ্ট বক্তার ধৃষ্টতা সহ্য করিতেছিল। এলা হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল,—"ওরাই তো ওই সব বলে বলে দেশের লোকেদের মাথা বিগ্‌ড়ে দিচ্চে। ধরে—ছেলেটাকে পুলিশে!"

কথাটা জনতার এবং জনতার মধ্যবর্ত্তী সেই ছেলেটীর কানে গেল। গৌর ললাট তাহার এক মুহূর্ত্তে টক্‌টকে লাল দেখাইল, ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞার তীব্র-হাস্যে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর বিভাসিত হইয়া উঠিল, উচ্চ ও অকম্পিত-কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল,—"দেশের যখন ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, নারীর পতনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! যে ভারতনারী স্নেহে প্রেমে ভক্তিতে কারুণ্যে—নিষ্ঠায় ও ত্যাগে মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেন, আজ তিনি কি? আমি জানি, নিকটবর্ত্তী কোন প্রাসাদ-মন্দিরে এমন একজন হৃদয়হীনা মহিলা অবস্থিতি করিতেছেন; যিনি মাত্র এই দু'একটী ঘণ্টা পূর্ব্বেই বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রস্তুত কোন মারাত্মক গাড়ীর চাকায় এক অসহায়া অক্ষমা বৃদ্ধার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়া অনায়াসেই লঘু হাস্য-পরিহাস ও আহার-বিহারে আত্মতুষ্টি সম্পাদন করিতেছেন! পাছে দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সামান্যমাত্র ব্যাঘাত ঘটিয়া যায়, সেই ভয়ে তাঁহারই রথচক্রে মর্দ্দিত হইয়া সে হতভাগিনী প্রাণ হারাইল কি না, সেইটুকু সংবাদ লওয়ারও যে প্রয়োজন থাকা সম্ভব—"

"ওকি, বেবি! ওকি ভাই। চলে যাচ্চিস্ কেন?"

"আমার ভারী শীত কর্‌ছে এলা! আমি ঘরে যাই।"

"এই তুচ্ছ কথাটাও সেই সম্মানিতা শিক্ষিতা মহিলাটীর স্মরণেও আসিল না!—ধিক্ এই সব শিক্ষা-দীক্ষায়! ধিক্ সেই রূপ ও ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী নারীকে! যাঁরা ভারত-রমণীর বীর-পূজ্য কীর্ত্তি-গাথাকে আজ মসী-মলিন করিতে উদ্যত!—তবে সেজন্য দায়ী অবশ্য তাঁরা নিজে নন্; আজ এই যে আদর্শের বিকৃতি ঘটাইতেছি, এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই! আমি জানি, এমন অনেকানেক কৃতবিদ্য উচ্চ-পদস্থ শিক্ষিত পুরুষ আছেন, যাঁদের ব্যবহারে তাঁদের হতভাগ্য দেশবাসী যতদূর নিপীড়িত, তার শতাংশের একাংশও তাঁরা বিদেশী রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন না। বস্তুতঃ দেশবাসীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার নিয়তই ঘটিতেছে, রাজার জাতি অপেক্ষা আমাদের নিজের জাতিই তার জন্য অধিকতর দায়ী। আবার মেয়েদেরও এই সুখোদ্যানের রঙ্গীন প্রজাপতি সাজিয়া আজিকার এই দুর্দ্দিনে যে অনর্থক বিলাস-ব্যসনে প্রচুরতর অর্থব্যয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তার জন্যও দায়ী এঁরা! দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা দেশের দুরবস্থায় দৃক্‌পাত না করিয়া আত্ম-সুখ-সাধনকেই সর্ব্বস্ব করিতে শিখিলেন কা'দের প্ররোচনায়? ইহা হিন্দু-নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি তো ছিল না।—আমি শুনিয়াছি, এখনকার মত এমন দুর্দ্দিনেও কোন ধনশূন্য ধনী-কন্যা তাহার প্রিয়পাত্র কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক নিজের দরবারের পোষাক তৈরি করাইতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। বঙ্গ-নারীর—হিন্দু-নারীর এই অবনতি অতঃপর আমাদের দেখিতে হইল।"

চারিদিকে একটা ধিক্ ধিক্ শব্দ উঠিয়া ক্রমশঃ সেটা থামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের দল

তাঁদের দলপতিকে লইয়া পায়ে পায়ে চলিয়া গেল। ইহাদের পিছনের বাড়ীর সদর-দ্বারের পার্শ্বে সাদা কাপড়ে সাজা একটী ভদ্রলোক হাঁটুর উপর একখানা কাগজ রাখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া অত্যন্ত দ্রুতহস্তে কি লিখিয়া যাইতেছিল, সে সেই কাগজখানা পকেটে ফেলিয়া জনতার পিছু লইল।

গাড়ী-বারান্দার উপরে মিঃ লাহা দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া সেই অদৃশ্যপ্রায় জনতার দিকে চাহিয়াছিলেন; মিসেস্ কর দু'পাশের ভিড় সরাইয়া তাঁহার ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া অন্তের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, "বড় দুঃখিত হলেম মিঃ লাহা! আজকাল ঐ এক ক্যাসান হয়েছে দেখ্‌ছি! তা' ওর জন্য আমাদের কারু আমোদের ব্যাঘাত হচ্চে না। আপনার বাড়ী এসে আজ আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম; তা ও--আপনি আর কি করবেন, আপনি দুঃখিত হবেন না।"

"আমি!"—মিঃ লাহা সদম্ভে মিসেস্ করের সহিত মুখামুখি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।—"আমি! আমি ওদের সিকিপয়সারও গ্রাহ্য করিনে! রাস্তার কুকুর বলেই মনে করি। তা'পর পরশু যাচ্চেন তো?"

মিসেস্ কর কহিলেন, "আমার তো খুবই ইচ্ছা, দেখি কি হয়।"

"আপনারাও সোসিয়ালিষ্টের দলে ভিড়্‌লেন নাকি।"

"ওঃ না, আমি ঠিকই যাব, দেখে নেবেন। ভাইএর মন্ত্রণায় মন্ত্রণায় ওনারও মাথা খারাপ হবার যোগাড় করছিল, বল্‌ছিলেন, 'অনর্থক নাই গেলে' দেশের ক'জন বড়লোক বিপন্ন, এ সব সময় আমাদের আমোদ প্রমোদ যতটা না করলে চলে, না করাই উচিত।—বিশেষ যাতে করে ওদের সঙ্গে কো-অপারেশনে আস্‌তে হয়। আমি তো তাই শুনলুম। বাঃ! চিরদিন যেন আমরা কূপ-মণ্ডূক হয়েই থাক্‌বো। কিছুই দেখো না, জানবে না;" "চল্‌লেন আপনারা! ওঃ আপনারাও যাচ্চেন তা'হলে! নমস্কার! বড় আনন্দ দিয়েছেন এসে। মুরজা যে! চল্‌লে না কি? ওঃ, আচ্ছা, অনেক দিন পরে দেখে খুব আহ্লাদ হলো, এখন আছ তো? একদিন দেখা করে আসবো গিয়ে, ক'নম্বর ঝাউতলা? পঁচিশ! আচ্ছা, এই নোটবুকে টুকে রাখলুম। দেখ, নিশ্চয় যাব।"—

দলে দলে অভ্যাগত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাবৃন্দ বিদায় অভিনন্দনের আদান-প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, এলা ও মুরজা দুই সখীতে হাত-ধরাধরি করিয়া 'ড্রইংরুমে' যেন কাহার অন্বেষণে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে শীতের সন্ধ্যায় 'ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা' খোলা ও একখানা কৌচে বসিয়া পড়িয়া মিস্ মল্লিক নিজের হাতের রুমালখানা ঘুরাইয়া নিজের মুখে জোরে জোরে হাওয়া করিতেছে।

এলা হাসিয়া জনান্তিকে মুরজাকে কহিল, "বাইরে তখন শীত করচে বলে ছুটে ঘরের মধ্যে চলে এলেন, এখন হাওয়া খাবার ঘটাখানা দেখেছিস্?"

মুরজা তেমনিভাবে জবাব দিল, "তা'তো দেখ্‌ছি, তবে ব্যাপারটা যে কি, সে তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে!"

এলা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "ওগো, প্রেমে তো কখন পড়্‌তে সুযোগ পাওনি, ওসব প্রেমের লীলা-কলা বুঝ্‌বে কি করে? যে বোঝ্‌বার এইবার সে নিজে এসেই বুঝুক।"—প্রকাশ্যে

কৃষ্ণার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার বায়ুভরে বিপর্য্যস্ত কেশে অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন ও অন্তরের কোন অজ্ঞাত ভাবোত্তেজনায় ক্ষণ-বিবর্ণ, ক্ষণ-আরক্ত মুখখানা দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "সত্যি বল্‌চি বেবি! তোর আজকের এই মূর্ত্তিখানা যে দেখ্‌বে, সেই মাথা ঘুরে মর্‌বে! তুই রাস্তাধারে দাঁড়িয়ে না থেকে যে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসেছিলি, সে খুব বিবেচনারই কাজ করেছিলি ভাই! অনর্থক জীব-হত্যায় লাভ কি? কাল গিয়ে ভাই তোর নতুন শাড়ীটাড়িগুলো দেখে আস্‌বো।"

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে মুরজার গা টিপিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া গেল, "দেখ্‌লি তো কেমন মায়াবিনী! একেবারে মানুষধরা ফাঁদপেতে নিয়ে বসে আছে। তা এতটুকু লজ্জাও করে না! যেন 'তিলোত্তমা' কুমার জগৎ-সিংহের ধ্যানে বসেছেন! এতে কি আর গরীব বেচারা মুমূর্ষু বউয়ের খবর কেউই রাখ্‌তে পারে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রিত সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, কৃষ্ণা উঠিয়া চলন্ত পাখাখানা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর মুখের উপর রুমাল চাপিয়া কৌচের হাতার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ ফাটিয়া তাহার হু হু শব্দে কান্না আসিতেছিল, ক্ষোভ, ক্রোধ ও অভিমানে মিলিয়া বুকের মধ্যটাকে যেন আবেগে পড়া নৌকার মতই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল। জীবনে এতবড় অপমান আর কখন যেন তাহার ঘটে নাই।

কাহার জুতার শব্দ বাহির হইতে ঘরের মধ্যে আসিতে শোনা গেল, সেই বহুপরিচিত শব্দটা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া থামিল। নিকটে যেন গায়ের উপরেই কাহার নিশ্বাসের বাতাস অনুভূত হইতে লাগিল। পরক্ষণে গভীর অনুরাগে ও আগ্রহে মথিত-কণ্ঠ কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "একি, বেবি! এমন করে শুয়ে আছ কেন? কি হয়েছে?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় কৃষ্ণা ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া পড়িল। আগুনজ্বলা চক্ষে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—"তুমি কি সত্যিকারেরই কচি খুকি' বলে আমায় মনে করো না কি? যে ওই অপমানের পরে 'বেবি' বলে ডেকে আমায় ভুলাতে এলে?"

তরুণচন্দ্র বিহ্বলপ্রায় হইয়া গিয়া স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে রাগরক্তিমায় অধিকতর মনোহর মুখের পানে চাহিয়া থাকিলেন, পরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "অপমান!—তোমার!—কে কর্‌লে বেবি?"

কৃষ্ণা তখন সম্মুখে একজনকে পাইয়া এতক্ষণকার নিরুদ্ধ বিদ্বেষের উষ্ণ উৎস খুলিয়া দিয়াছে, সে এই ব্যগ্র বেদনায় তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই এক ঝলক্ অনলোদ্গীরণের মত উষ্ণস্বরে কহিয়া উঠিল,—"এ সবই তোমার জন্য ঘট্‌লো! তোমার এখানে আসার জন্য! তা' না হলে তো আর যার তার মুখে আমায় এত অপমান সইতে হতো না! তোমার যেমন, আমি না হলে কিছুটাই হ'বার যো' নেই!"—মর্ম্মস্থলে আঘাতপ্রাপ্তে চম্‌কাইয়া উঠিয়া তরুণচন্দ্র উচ্চারণ করিল, "আমার জন্য! আমার বাড়ীতে এসে! বেবি! বেবি! কি বল্‌চো!"

কৃষ্ণা নিজের উদ্গত অশ্রু দমন করিতে করিতে বলিল,—"তোমার জন্যে নয় তো আর কার জন্যে?—তোমার বাড়ীতে আসার জন্যেই না এত সব হলো! একেই আমার মন কি রকম যে খারাপ হয়ে রয়েছে, তার উপর—" কৃষ্ণার গলা ধরিয়া আসিল।

তরুণচন্দ্র সান্ত্বনা দিতে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, "এর জন্য তুমি—" "সবটা শোন তো আগে, তারপর 'কমেণ্ট' করো। বাবার তো আর বের হবার সময়ই হয় না। যখন হলো—তাড়াতাড়ি করেই আস্‌ছি, তোমার বাড়ী থেকে দু'শো গজ হবে কি না হবে, ঐ মোড়টার মাথায় একটা থুড়্‌থুড়ে বুড়ি এসে গাড়ীর তলায় পড়্‌লো।—তখন আর মোটে সময় নেই,—তা' পর বাবা ঐ অসুস্থ-মানুষ, তক্ষণি আবার রাস্তাও বন্ধ হবে, ঐ অবস্থায় আমি মাঝপথে বসে কি করি বল তো? কাজেই এখানে চলে এলুম, কিন্তু এসে আমি নিশ্চিন্ত হইনি, তক্ষণি সোফারটাকে সেখানে যেতে বলে দিয়েছি। বুড়ি মরেছে কি না দেখ্‌বে, তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে, যা খরচপত্র হয় কর্‌বে, নিজে ধরা দেবে, সব কিছু বলে দিয়েছি। তারপরও কি না ওরা শুধু শুধু আমায় অমন করে অপমান করে গেল! আমি কি ওই থুড়্‌থুড়ে বুড়ীকে রাস্তায় বার হ'তে পরামর্শ দিয়েছিলুম, না তাকে হাত ধরে টেনে এনে গাড়ীর চাকার তলায় ফেলে দিয়েছিলুম! আমার কি দোষ?"

মিঃ লাহা চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, "তোমার দোষ কি?"

"তা' হলে কেন ও-লোকটা আমায় অনর্থক যা' তা' বলে গেল? আমি কিন্তু সইবো না, তা' তোমায় বলে রাখ্‌ছি! কি অন্যায় স্পর্দ্ধা! লোকটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও আমার রাগ যায় না! এর উপর শেষকালের সেই কথাগুলো, বলি, সেগুলোও কি তোমার কানে যায় নি? না তারও অর্থবোধ কর্‌তে পারনি বোধ হয়? দরবারে যাবার জন্য কে একজন তার প্রিয়পাত্রী'র পোষাকে কত হাজার টাকা খরচ করেচে বলে যে হিসাব দাখিল করে গেল,—সেটা কা'কে বলা হলো শুনি? সে কি তুমি ছাড়া আর কেউ?"

মিঃ লাহার চোখের তারায় ক্রোধের আভাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও কণ্ঠস্বরে তাহার কণামাত্রও ব্যক্ত হইল না, বিনীত অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, "বুঝ্‌লেই বা আমার উপায় কি? হাতী পাঁকে পড়্‌লে ব্যাংয়েতেও তাকে লাথি মেরে যায়। আমার গলায় ফাঁসী যখন খোল্‌বার উপায় আমার নেই, তখন অগত্যাই তার টানও আমায় সইতে হবে। কিন্তু তা'তে আমার কি অপরাধ?"

কৃষ্ণার রাগ পড়ে নাই। সে তীব্রস্বরে জবাব দিল, "তোমার অপরাধ নয় তো কার অপরাধ?—কার জন্যে এত কথা আমায় শুন্‌তে হলো? আমি কক্ষণো এ রকম অপমান সইতে পার্‌বো না, সে তোমায় এই বলে দিলুম। এর যদি প্রতিকার না হয়, দেখো তুমি এবার থেকে আর আমি তোমার—"

মিঃ লাহা তার কৌচের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তা' হলে যাতে আর কেউ কিছু না বল্‌তে পারে, তারই উপায়টা আগে করা যাক্। অনেকদিন ধরেই যখন আমাদের অপেক্ষা কর্‌তে হচ্চে, আরও কত দিন যে বাকী, তারও যখন কিছুই নিশ্চয়তা নেই, তখন সকল সমাজের সকল লোককে আর কথা বল্‌তে না দেওয়াই ভাল। যদিও তা'তেও একটা আন্দোলনের নেহাৎ কম হবে না,—কিন্তু সেটার সময় হিন্দু-সমাজ নীরব থাক্‌বে এবং বাকীটা আমার পূর্ব্বস্ত্রীর মৃত্যুতেই হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিয়া লইয়া একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিল। অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কহিল, "সে হয় না, তোমার সে স্ত্রী মরা পর্য্যন্ত আমাদের যেমন করেই হোক্ অপেক্ষা কর্‌তেই হবে।"

"তা' হলে এ রকম দু'একটা বাজে লোকের বাজে কথা সহ্য করাও অনিবার্য্য! আর তা'তে অধৈর্য্য হবারই বা কি আছে? বিশেষ তুমি মনের মধ্যে নিশ্চিতরূপেই জান, একদিন আমরা পরস্পরেরই হবো; জগতে এমন কিছুই নেই—যা'তে আমাদের মিলনে বাধা দেবে। এখন দু'দিন দৈব-দুর্ব্বিপাকে যদিই তোমায় একটু সহ্য করতে হয়, আমার জন্য সে কি তোমার পক্ষে এতই কঠিন বেবি?"

কৃষ্ণা এসব কথায় কর্ণপাত করিল না, সে ঝাঁকিয়া কহিল, "না, আমি কার কথা সইতে পার্‌বো না। লোকে যে ঐ রকম ঠাট্টার সুরু করে, তোমায় জড়িয়ে নিয়ে কথা বল্‌বে, সে আমি কিছুতেই সইতে পার্‌বো না।"—

মিঃ লাহা দুঃখিত ও কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার জন্য আমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার হিন্দুমতে বিবাহ করে—সিবিলিয়ানীর অমর্য্যাদা পর্য্যন্ত করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাও শুন্‌বে না, অথচ কে একটা রাস্তার কুকুর কি বলে চেঁচিয়েছে, তাই নিয়ে আমায় দায়ী কর্‌চো,—এতে আর আমি কি করতে পারি বলো? সবাকার মুখ তো আর আমি বেঁধে রাখ্‌তে পারিনে।"

এই অপ্রিয় সত্য বাক্যটা কৃষ্ণার বুকে বিঁধিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল। কান্না-ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিল,—"দাও আমায় একটা গাড়ী ডাকিয়ে দাও, শিগ্‌গির দাও—এক্ষণি আমি বাবাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি;—আর কক্ষণোই তোমার বাড়ী আমি আস্‌বো না। তুমি নিজে শুদ্ধ আমার অপমান কর্‌লে!"

"সে কি বেবি! সে কি? তোমায় আমি অপমান কর্‌লুম? একি বল্‌চো? দেখ, পৃথিবীতে এসে সুখ কা'কে বলে কখনও জানিনি। ছোটবেলা মা মরেছিল, বাপ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ছেলের খবর রাখ্‌বার অবসর তাঁর মোটেই ছিল না। তারপর পিতৃ-কর্ত্তব্যের মধ্যে সাত তাড়াতাড়ি একটা পাগল ধরে বিয়ে দিয়ে সকল সুখেরই চূড়ান্ত করে রেখে দিয়েছেন! পৃথিবীতে এসে পাইও নি কিছু, দিইও নি কোথাও,—শুধু এই একটী জায়গায়, এই একটী আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছি। তাই এখান থেকেও যদি না পাই, যদি আশা না মেটে—তা' হলে সে কি সহ্য করা যায়? তুমিও যদি চিরদিনই আমার 'পরে অম্‌নি করে বিমুখ হয়ে থাক, তা' হলে আমি বাঁচি কেমন করে, তাই আমায় বলো তো?

কৃষ্ণার মুখের কঠিন তাচ্ছিল্যের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার স্থলে সুগভীর সহানুভূতিপূর্ণ করুণা জাগিয়া উঠিল। সলজ্জভাবে কহিল,—"আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমায় তুমি মাপ করো।"

তরুণ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, "কষ্ট তুমি আমায় দাওনি বেবি! বলেছি তো তুমিই আমার একমাত্র জীবনের সুখ। দুঃখ আমার মন্দভাগ্যই আমায় দিচ্চে। আমার যে স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে করেও অর্দ্ধ-মৃত হয়ে বেঁচে আছে, দুঃখ দিচ্চে আমায় সেই, তুমি নয়। যে বাঁচ্‌বে না, মৃত্যুই যার শান্তি, অনর্থক কেনই যে সে এমন করে বেঁচে রইলো, এর কোন অর্থই যদি আমি বোধ করতে পারি!"

"ছিঃ, লাহা! নিজের স্বার্থের জন্য, তুমি আর একজনের মৃত্যু-কামনা কর্‌চো! কি নিষ্ঠুর তুমি?"

"নিষ্ঠুর আমি! কিসে আমি নিষ্ঠুর? যার মৃত্যু-কামনা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কর্‌তে হচ্ছে, সে আমার পায়ের বেড়ি ভিন্ন আর কি কোন কিছু? কবে কি তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি যে, তারই বিনিময়ে তার এই জীবন্মৃত অবস্থাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে সম্মান কর্‌বো? তার কাছে যা পেয়েছি' ত'াতে তার মৃত্যুরই প্রতীক্ষা আমায় করতে হচ্ছে; তা' ভিন্ন আর কি কর্‌তে পার্‌তুম, তাই বল দেখি?"

কৃষ্ণা ঈষৎ চিন্তিতমুখে কহিল, "তা' আমি জানিনে, তবে হয়ত' কিছু পার্‌তে, হয়ত' তা'কে ভালবেসে, তা'কে মানুষ করে তুল্‌তে তুমি চেষ্টা কর্‌লে, না পার্‌তে এমনও নয়। শুনেছি, সে না কি পাগল হলেও তোমায় খুবই ভালবেসেছিল। তোমার বিলাত যাবার খবরেই তার রোগ শত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও সেই থেকে সে মৃত্যু-শয্যাই পেতেছে।—তবে অবশ্য বলা যত সহজ, একটা মৃগীরোগী উন্মাদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা ততদূর সোজাও নয়, কিন্তু তা' ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?"

"উপায় রয়েছে, তুমি আমার স্ব-জাতীয়া অনায়াসেই আমাদের হিন্দু বিবাহ হ'তে পারে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উন্মাদ ও চিররুগ্না স্ত্রী বর্জ্জনীয়া। তবে এ নিয়ে যদি—এমন কি গবর্ণমেণ্টের কানে ও-কথাটা যায় যে, একজন সিবিলিয়ান্ এক-স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিয়ে করেছে, তবে সমস্ত খবর না জেনে একটু আন্দোলন হবে, কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপেই আমার ব্যাপার, তোমার এতে এতটুকুও অংশ থাক্‌বে না।"—

কৃষ্ণা পুনশ্চ একটুখানি নীরব হইয়া চিন্তা করিল, তারপর নিজের দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দৃষ্টি ভূমিবদ্ধ করিয়া আরক্ত-গণ্ডে জবাব দিল,—"কাজ নেই—থাক্‌গে। তিনি আর কতদিনই বা আছেন। একদিন তো পাবেই—"

"একদিন পাইবে"—এই সামান্য শব্দটী তরুণচন্দ্রের বিরস-চিত্ত যেন একটী ক্ষণের মধ্যেই প্রচুরতর আনন্দরসে সরস করিয়া তুলিল।

এই যে রূপসী রূপ-যৌবনের অনন্য-সাধারণ সম্পদে শিক্ষা-দীক্ষার গৌরবে যে আজ কলিকাতার স্বাধীন-সমাজের মুকুটমণি, সেই শতজনবাঞ্ছিতা সুন্দরী নিজের মুখেই স্বীকার করিতেছে—'একদিন তো পাবেই'—তবে আবার কিসের দুঃখ? এতদিনের সহিষ্ণুতার এই তো সমুচিত পুরস্কার! গভীর আনন্দে রুদ্ধবাক্ হইয়া সে শুধু অনিমিষ-মুগ্ধনেত্রে সেই লজ্জাবনত মুখের পানে আপনা হারাইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে অধীর আবেগে কি একটা বলিতে যাইতেই, তাহার বেহারা করিম দ্বারের বাহির হইতে সেলাম জানাইল।

বিরক্ত ও কিছু বিষণ্ণচিত্তে তরুণচন্দ্র ভৃত্যকে ভিতরে আসিতে আদেশ দিলে, সে আসিয়া পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের আগমন জানাইল।

"তাঁকে বসাও গে, আমি যাচ্চি"—

ভৃত্যের পশ্চাতে তরুণও উঠিয়া পড়িল।

"পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর কি জন্য এসেছে? তুমি কি ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

মিঃ লাহা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখ সগর্ব্বে তুলিয়া উত্তর দিল, "তুমি কি মনে করো—তোমায় অপমানিত করে গিয়ে সে নির্ব্বিঘ্নে তার ঘরে পৌঁছে স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে?"

এক মুহূর্ত্তের জন্ত কৃষ্ণার আহত গর্ব্বে বিক্ষতচিত্ত প্রতিশোধের আনন্দগৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্ব-সমক্ষে বিশেষভাবে যে 'ব্যক্তিবিশেষের প্রিয়পাত্রী' বলিয়া তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইটাই তাহার কৌমার-গর্ব্বের অটুট গৌরবে অত্যন্ত আঘাত করিয়া বাজিতেছিল। সে লজ্জা, সে অপমান যেন তাহার গোপন করিবারও স্থল ছিল না। কারণ, ইহার মধ্যে সত্যেরও যে একটুখানি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। এই প্রলোভনীয় নিমন্ত্রণ-সভার জন্তই বিশেষভাবে তাহাদের এই ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইতে হইয়াছে, তা' এমন মধ্যে মধ্যে হয়ও। অবশ্য কন্যার পিতা বরাবরই এর জন্য এই লোককে একখানা করিয়া হ্যাণ্ডনোট দিয়া থাকেন; এবং এ ধারটা অন্য লোকের নিকট লওয়া হইতেছে এই রকম কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায়, ইনিও প্রথম প্রথম বিস্তর আপত্তি করিয়া এক্ষণে কি ভাবিয়া বলা যায় না, নিরাপত্তিতেই তাহা গ্রহণও করিয়া থাকেন; তবে সে সব কথা এই তিনটী লোকের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোক ইহা কোথা হইতে রটনা করিল, ইহাতেই তাহার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়াছিল, এবং যেখানে ব্যথা, আঘাতটাও বড় প্রচণ্ড হইয়াই ঠিক সেইখানে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার এ বিজয়ানন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। এক মুহূর্ত্ত পরেই যেন কিসের একটা অশান্তিতে সমস্ত মনটা অস্বস্থ হইয়া উঠিল, উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত মিঃ লাহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, "শোন, শোন, আচ্ছা ওকে তুমি কি গ্রেপ্তার করতে বল্‌বে?"

মিঃ লাহা ফিরিয়া আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন; ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তা' না দিলে সে যে নিজে এসে ধরা দেবে, এমন আশা আর কেমন করে করি?"

কৃষ্ণা কহিল, "কিসের চার্জ্জ দেবে ওকে? ওতো 'সিডিসন্' কিচ্ছুই বলেনি?"

মিঃ লাহা একটুখানি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া আশ্বাসের স্বরে উত্তর করিলেন, "তার জন্য ভাবনা নেই, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো, আমি আস্‌ছি।"

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে ঈষৎ ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে স্থির-কণ্ঠে কহিল,—"না, অন্যায় করে একজনকে তুমি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিতে পারবে না। ও যা' বলেছে, তা'তে ব্যক্তিগত বিদ্বেষই ব্যক্ত হচ্চে। দেশের ধনী ও বিলাসী লোকদের গায়ে সে চাবুক মেরেচে, তা'তে অনেকেরই গা জ্বালা করতে পারে; কিন্তু ফিরিয়ে মারবারও তো তাকে কোনই পথ নেই, কিন্তু কি সে মিথ্যা বলেছে? ভেবে দেখ্‌লে কি ওর প্রত্যেক কথাটীতেই নির্ভীক সত্যের অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?"

"বেবি! তুমি কি বল্‌চো? তোমায় আমায় একসঙ্গে কত বড় মিথ্যা অপমান ও করে গেল, সে কি তুমি এক্ষুণি ভুলে গেলে? এই যে বল্‌ছিলে, 'ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও তোমার রাগ যায় না?"

কৃষ্ণার কালো চোখে দু-চোক ভর্ত্তি জলের মধ্যে আগুন দেখা দিল,—"বলে ছিলুমই তো!—বলেছিলুম কেন, সে ত এখনও বল্‌ছি!—আমি ওর কি করেছি যে, ও এত লোক সংসারে থাক্‌তে শুধু শুধু আমার সঙ্গেই লাগ্‌তে এলো? ওর খুব বেশী রকম একটা শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু দেখ, এখন ওকে আর গ্রেপ্তার করে কাজ নেই। ও যদি আদালতে এই সব কথা বলে, আমার নাম যদি স্পষ্ট করে পবলিকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে,—ওরে, বাবা রে! তাহলে আমি মরেই যাব!"

"তবে থাক্, আমাদের হাত ও ছাড়াতে পারবে না,—ফাঁদ তৈরি থাক্‌লে এক সময় না এক সময় তাতে পড়তেই হবে।"

"সে মন্দ নয়। এখন আর এ'তে ওর দণ্ডই বা কি হবে? মাঝে থেকে লোকে এই সব কথা নিয়ে কি না কি আলোচনা চালাতে পারে।" ওর পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টাররা হয়ত খুব ফাঁদালো করে এই সব কথার ব্যাখ্যা করতে লেগে যাবে। সব্বাই হয়ত বলবে, গায়ের জ্বালায় তুমি শুধু শুধু নির্দ্দোষীর উপর পীড়ন করাচ্চো। চাই কি নিষ্কর্ম্মা খবরের কাগজের সম্পাদকের দল এরই উপর রং চং ঢেলে সাতটা বড় বড় আর্টিকেল লিখেই কাগজে কাগজে ছাপিয়ে দেবে।—রাস্তা-ঘাটে আমায় দেখ্‌তে পেলে সবাই হয়ত একটু মুখ টিপে হাস্‌বে।—উঃ—সে আমি সইতে পারবো না। তার চাইতে মরণই ভাল!—"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেডিকেল-কলেজ-হাঁসপাতালের সার্জ্জিকাল ওয়ার্ডের সম্মুখে একখানা ভাড়াকরা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া একটী মেয়ে ত্বরিৎপদে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটীর বেশভূষার আড়ম্বর যে বেশী কিছু ছিল, তা নয়, তথাপি তাহার মূল্যবান্ পার্শি-শাড়ি ও খুব সৌখীন কাট-ছাটের জ্যাকেট্, পায়ের গোড়ালী উঁচু বিবিয়ানী-জুতা, মাথায় রাশিকরা ভ্রমরকৃষ্ণকেশে সযত্নরচিত সব চেয়ে আধুনিক এলো খোঁপা, নিতান্ত অল্পস্বল্প হলেও বহুমূল্য অলঙ্কার, তাহার ধনবত্তার ও সৌখীনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছিল, এ দুইটী জিনিষেরই একালের জগতে একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে; দ্বার এদের কাছে আপনিই খুলিয়া যায়, পথ দেখাইবার অগ্রদূতের কোন অপরিচিত রাজ্যে গেলেও অভাব ঘটে না।

মেয়েটী এখানের হাউস সার্জ্জেনের কাছে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইবামাত্রে সবিশেষ সম্মান ও আগ্রহের মধ্যে পথ চিনাইয়া তাহার গন্তব্য-স্থানে তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সে জায়গাটা কিন্তু এই সুবেশা ও সুন্দরীর পদস্পর্শের ঠিক উপযুক্ত স্থান নয়। এ কথাটা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে একান্ত তরুণ ছাত্রবৃন্দ অবধি সবাইকারই মনের মধ্যে একবারটী উদিত হইতে ছাড়ে নাই, তা' তাদের মুখের ঈষৎ অপ্রতিভ ও সলজ্জ ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, অর্থাৎ সে দিকটা নিতান্ত দরিদ্র অভাগাদের থাকার জায়গা, সেখানে কেনই যে এই মা-লক্ষ্মীর বরপুত্রী আজ পায়ের ধূলা দিতে আসিয়াছেন, সে কথা হঠাৎ বুঝিতে পারা একটুখানি কঠিন তো বটেই!

একটী স্বেচ্ছাসেবক সাগ্রহ আনন্দে ব্যগ্র হইয়া উহার পথপ্রদর্শকের কার্য্যে অগ্রসর হইয়া গেলে, পিছন হইতে এই নব অভ্যাগতার সম্বন্ধে একটা মৃদুকণ্ঠের চাপা আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।—"কে রে? যেন দেখা মুখ মনে হচ্চে না?"—"কি জানি ভাই, অমন কত মুখই তো পথে ঘাটে দেখা যায়।"

"না, তা বলে এ মুখের হাটেবাটে ছড়াছড়ি নেই হে! এ যাকে বলে বিউটী!"

"চেনো না? উনি যে ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে মিস্ মল্লিক।"

—"কে? কে? কোন্ ডাক্তার? বুড়ো ডাক্তার মল্লিক বুঝি? যিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? বটে--বটে!"

"হুঁ তাঁরই মেয়ে।"

"ওঃ, ওঁর নামটা কি?"

কৃষ্ণা মল্লিক, বিদ্যাবুদ্ধিরও খুব খ্যাতি আছে; ও মহলে চেহারাখানি ত খুবই চমৎকার। "তা' এখানে কি উদ্দেশ্যে এলেন?"

"জানাই যাবে।"

"ওদের মতন সৌখীন জীবেদেরও আবার এর মধ্যে কিসের দরকার থাক্‌তে পারে?"

"খুব সৌখীন বুঝি?"

"দেখ্‌চো না, রোগী দেখ্‌তে আসারই সজ্জা!"

"তা তাই, ঠিক বল্‌তে পারিনে; সুন্দর মানুষকে যেটুকু পরলে সাজা মনে হয়; একজন সাধারণ চেহারার লোকে তার দুগুণ করলেও তার ধারেও যায় না। সে থেকে বিচার ঠিক হয় না। আমি দেখ্‌ছি, আমার মা আর খুড়ি-মা দুজনে একই জোড়ার সাড়ী পরেন; কিন্তু মার গায়ে সেই লাল বা কালা পাড় সাড়ীখানারই জেল্লা যেন সাতগুণ খুলে যায়।" "তা সত্যি! রূপ থাক্‌লেই সেটা এতটুকুতে অনেকখানি বেড়ে ওঠে!"

নিজের অভীপ্সিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃষ্ণাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। সুজন গত দিবসের 'মোটর-বিভ্রাটের' খবর জানিত। সহজেই পূর্ব্ব দিনের সেই মোটর-চাকায় আহত বুড়ীটার কাছে ইহাকে পৌছাইয়া দিল।

একেই অসমর্থ অক্ষম শরীর, তাহার উপর সাঙ্ঘাতিক আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণা। আর্ত্তনাদে ও বিলাপে অপরাপর রোগীদের অশান্তির একশেষ করিয়া সকলকার নিকটেই সে তিরস্কার ও গালি খাইতেছিল। হাতে পায়ে কপালে বুকে সর্ব্বাঙ্গেই প্রায় তাহার পাঁচ সাতটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, দু-একটা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণা অনিচ্ছুক, অথচ যেন কাহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কুণ্ঠিত-সলজ্জ মুখে আসিয়া উহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইল। সুজন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আর কিছু করতে পারি?" কৃষ্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের পানেই বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যথিত ম্লানচক্ষু তুলিয়া উহার মুখে স্থাপন করিল; তারপর কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "এখন নয়; দরকার হয় ত বল্‌বো।"—তারপর দৃষ্টি নত করিয়া আবার সেই আহতা হতভাগিনীর মুখে তাহা স্থাপন করিল। সুজনকুমার ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া লম্বা ঘরটার অপর প্রান্তে খোলা বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইল।

"উহুহুঃ!! মা রে! হাড়গুলো যেন সব পিশে যাচ্চে! ওরে বাবা! একেবারে যদি পোড়ামুখোরা মেরে ফেলে যেত তো সে এর চাইতে ঢের ভাল হতো রে!"

কৃষ্ণার বুকের ভিতর যেন জাঁতাকলের চাকা চলিতেছে—এমনি তাহার শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ঘটিতে লাগিল। অনেক কষ্টে হাঁপ লইয়া সে ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করিল, "বড্ড কি কষ্ট হচ্চে! কি করলে একটু কম্‌বে আমায় বল না!"

আহতা চমকিত হইয়া চোক মেলিতে গেল, বোধ করি কপালে কি চোখেই আঘাত লাগিয়া থাকিবে; চোকের পাতা খুলিতে পারিল না; নিমীলিত চক্ষু উপরে টানিয়া উঠাইয়া তাহার কণ্ঠ লক্ষ্যে রূঢ় কর্কশ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে তুই? খিষ্টানি ধাই মাগী নাকি? কেন, কষ্ট

হচ্চে কি না হচ্চে তা' দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নে ! সমস্ত দেহের হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে দিলে, তার কষ্ট না হয়ে কি সোয়াস্তি হবে নাকি ! আ-মর্ কালা মাগি কোথাকার ! উহুহুহুহুঃ ! মা রে, মাঃ ! কৃষ্ণার সর্ব্বদেহে মনে কি যে একটা প্রবল যন্ত্রণাপূর্ণ ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল, সে যেন সে ভাল করিয়া অনুভবও করিতে পারিল না। বুক যেন তাহার ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মতই ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে হইল; গলদশ্রু রুদ্ধপ্রায় কাতরস্বরে সে কহিয়া উঠিল—"ওগো, তুমি বলো, কি করলে তোমার এ কষ্ট কমে যাবে—আমি এক্ষুণি তাই করবো !"—আর কিছুই সে বলিতে পারিল না; আর কোন সান্ত্বনার কথাই তাহার মনে বা মুখে আসিল না। আর করিবারই বা এ ক্ষেত্রে কি আছে, তাও তো তাহার মনে পড়িতেছিল না।

বুড়ী অস্ফুট-গর্জ্জনে বিদ্ধ পশুর মতই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

"যে হতভাগারা হাওয়াগাড়ী চেপে মানুষের বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে হাওয়া খেতে যায়—ওদেরও যদি আমার মতন দশা হয়, তবেই না এ কষ্ট কমে। এম্‌নি করে যদি ওদের বুকের হাড় মড়্‌মড়িয়ে গুঁড়ো হয়, তবেই না আমার এই ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে।—ওরে মা-রে মা ! ওরে মা-রে, মা ! জল ! ওরে ও খৃষ্টানি মাগি ! তুই যেন দিস্‌নে, গরীব বটি, তবু সজ্জাতের মেয়ে তো, মরণকালে খৃষ্টানের জল খেয়ে মরতে যাব কেন ? যদি ভাল নোক থাকে ত বল্, ওরে মা-রে মা ! ওরে—"

আতঙ্কে কৃষ্ণার সর্ব্বশরীরের স্পন্দন প্রায় থামিয়া আসিবার উপক্রম করিল, সে ক্ষণকাল জড়পদার্থের মতই বিমূঢ়বৎ থাকিয়া পরক্ষণে উহারই আর্ত্তনাদে সম্বিত লাভান্তে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিল—তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সুজনকুমারকে। সে যে অযাচিতভাবেই তাহার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, এখন সে কোথায় ? যে দিক দিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্য হইতেই সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "আপনি একবার এখানে আসবেন কি ?—কোথায় আছেন ? শীগ্‌গির একবারটী আসুন না !"

সুজন বাহিরে দাঁড়াইয়া অপর একটি আগন্তুকের সহিত কথা কহিতেছিল। যে কথার তাহারা আলোচনা করিতেছিল, বোধ করি ঘরের মধ্যকার—এই আহ্বানের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব থাকিবে, কেন না, এই ডাক তাহার কাণে ঢুকিতেই তাহাকেই যে ডাকা হইতেছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াই সে তাহার বক্তব্য বিষয়টাতে আরও একটু জোর চড়াইয়া প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিল, "ঐ শোন ! বোধ করি কোন কিছু সাহায্যের জন্যই ডাকচেন। না ভাই, ও তোমার মিথ্যে প্রেজুডিস্ ! সৌখীন ও স্বাধীন মেয়ে হ'লেই নির্ম্মম হয় না। মায়া-দয়া ওটা স্বভাব-ধর্ম্ম।"—এই বলিয়াই সে ঘরের দিকে চাহিয়া উঁচু-গলায়,—এই যে যাচ্চি আমি—বলিতে বলিতেই ত্বরিৎপদে চলিয়া আসিল।

"দেখুন, বুড়ী একটু জল খেতে চাইচে,—পারবেন কি একটু দিতে ?"—বলিতে বলিতেই কৃষ্ণার দু-চোকভরা টস্‌টসে জল পড়ো-পড়ো হইয়া উঠিল।

"নিশ্চয় ! এক্ষুণি আন্‌চি।"—বলিয়া সুজনকুমার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণা বধ্যভূমে বন্দীর মতই সভয়-অনিচ্ছায় বৃদ্ধার শয্যা-পার্শ্বে শ্লথগতিতে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধার নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে সে নিজের আগমন প্রকাশ করিতে ভরসা করিল না;

এমন কি, শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত সাবধানে লইতে লাগিল। সে যে কে, এ কথা জানাইয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে যদি সম্ভব হয়, তাহার পরিবারবর্গের জন্য কিছু অর্থসাহায্য, এখানেও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত চেষ্টা করিতেই সে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু সব কয়টাই এখন তাহার পক্ষে কঠিনতর বোধ হইল—কেমন করিয়া ইহার কাছে সে আত্মপ্রকাশ করিবে? পূর্ব্বে এ কার্য্যটাকে তাহার এত বড় দুরূহ বলিয়া আদৌ সন্দেহ হয় নাই। শুধু ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে ত্যাগের দিক্‌টাকে উজ্জ্বল ও মহৎ বোধ করিয়া সেইটাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়াছিল; নিজের দিক হইতে নিজেকে অপরাধীর মধ্যে একজন বলিয়া স্বীকার করিতে যে লজ্জা, সেইটাকেই সে জোর করিয়া ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া আরও একটা নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। শুধু তাহার পক্ষ হইতেই নয়; উহার পক্ষ হইতে এই অভিব্যক্তিতে যে সুবিধা আনয়ন করিবে না তাহা বেশ সুস্পষ্টই হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সে নিজেকে প্রকাশ করে।

যন্ত্রণায় বৃদ্ধার লুলিত মুখ যেন ক্রমশঃই বিকৃতাকার ধারণ করিতেছিল; সে হঠাৎ আবার জোরে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওরে মাগি! জল দিলিনি! তোকে ছুঁতে মানা করেচি বলে রাগ হয়েছে বুঝি? ওরে তেষ্টায় বুক শুকিয়ে মরি যে রে! ওরে মড়া নিয়েও তোদের খেলা করা!—মাগি, এই মাগি! ওরে মা' রে না! ওরে—"

"ওমা! আমি কি করি!" আতঙ্কে এই কথা বলিয়াই ফিরিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার পিছনদিকে খানিকটা দূরে একজন কমবয়সী ছেলে দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ তাহাদেরই কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে নিজের মনের ভয় ভাবনা উদ্বেগে উহার মুখের দিকে না চাহিয়াই, বয়সের ও হয় ত' বা একটুখানি গঠন-সাদৃশ্যেও—ইহাকেই তাহার পূর্ব্বপরিচিত সুজন বোধে অনেকখানি আশ্বস্তভাবে ইহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় কহিয়া উঠিল, "কই, কই জল এনেচেন? ওর যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র—"

ঠিক এই সময়ে একটা বড় এনামেলের গ্লাসভর্ত্তি জল লইয়া সুজন-কুমার ঘরে ঢুকিয়া জবাব দিল,—"এই যে আমি জল নিয়ে এসেছি।"

—"ওঃ এসেছেন আপনি, আঃ—অনেক—অনেক ধন্যবাদ! চলুন তো, ওকে জল খাওয়াবেন।"—

আগন্তুকের দিকে বারেকমাত্র চকিত-কটাক্ষে চাহিয়াই সে পূর্ব্বপরিচিতের সমভিব্যাহারী হইল; কিন্তু সেই এক নিমিষের দৃষ্টিটুকু সে যে কোন অপরিচিতের মুখের উপর নিবদ্ধ করে নাই, সেটুকুও সেই একটিমাত্র মুহূর্ত্তেই বোধ করিয়া গেল। মুখখানা চেনা। তবে কোথায় এবং কবে দেখা, সে সব কথা ভাবিবার অবসর না থাকায় মনে পড়িল না।

"আচ্ছা অতবড় গেলাসশুদ্ধ জল ও' কি করে খাবে? মাথা কি তুল্‌তে পারবে?—পারবে? আহা, না, পারবে না, দেখুন না! ঐ দেখুন, চেষ্টা করতে গিয়েই ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজে গেল, আর একটা কিছু ছোটখাট গেলাস কি বাটী—কিডিং কাপ—সে কি আর হবে?—"

"আচ্ছা, আমি এখুনি নিয়ে আস্‌চি।" এতটুকুও অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং এই

সাগ্রহ অনুরোধে প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তেই সেই স্বেচ্ছাসেবকটী একদৌড়ে আদো লিনে চলিয়া গেল।

জলপানে অপারগতায় আহতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া যথাশক্তি চীৎকারশব্দে তাহার এই দুরবস্থার মূল যাহারা, তাহাদের অকথ্য-ভাষায় গালি পাড়িতেছিল। সে সব শুনিতে শুনিতে ইহার কষ্টে ও নিজের অপমানে মিলিয়া কৃষ্ণার চোখের জল আর কোনই বাধা মানিতেছিল না, দুচোখের ধারায় তাহার আরক্ত গণ্ড শিশিরাক্ত গোলাপের আকার ধারণ করিল। একবার সে সচেষ্ট-ধৈর্য্যে রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "শোন, আমি খৃষ্টান নই,—আমি তোমায় জল খাইয়ে দোব কি? তুমি চিৎ হয়ে হাঁ করলে, খুব একটু একটু করে দিতে পারবো! দিই না?"

তাহার মিনতিপূর্ণ করুণকণ্ঠে—তা' ছাড়া তৃষ্ণার অসহ্য কষ্টে অনেকখানি নরম সুরে বৃদ্ধা নিঃশব্দে হাঁ করিল, ও যেন কৃতার্থবোধ করিয়া কৃষ্ণা সেই জলের গ্লাসের খানিকটা জল মাটিতে ঢালিয়া দিয়া, সেই গ্লাস হইতে অল্পে অল্পে তাহাকে প্রায় অর্দ্ধপরিমিত গ্লাস জল পান করাইল।

জলপান করিয়া বুড়ী অনেকখানি সুস্থবোধ করিল ও সেই সঙ্গেই তাহার বিদ্রোহ-ভাবটাও একটুখানি কমিয়া আসিল। একটা স্বস্তির শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক "আঃ"—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল এবং হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"আঃ, রাজরাণী হও!"

কৃষ্ণার হাত কাঁপিয়া—বাকী জলশুদ্ধ গ্লাসটা ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সে নিজেও সেই জলে ভেজা মাটির উপর অবসন্নবৎ বসিয়া পড়িয়া নিজের মুখখানাকে দুই হাতে ঢাকিয়া মাটির সঙ্গেই প্রায় মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিল।—এতই অল্পে তুষ্ট এরা?—

"এই যে আমি ফিডিং কাপ্ এনে,—'কই' কোথায় গেলেন?"—

কৃষ্ণা ধড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে নিজের সিল্কের শাড়ীরই একটা প্রান্ত টানিয়া লইয়া চোখ মুখ মুছিতে মুছিতে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াই অশ্রুজলেভেজা ক্ষীণস্বরে জবাব দিল, "জল আমি এখন খাইয়ে দিয়েছি;—" তারপর ভাল করিয়া মুখ মুছিয়া মুখ ফিরাইবামাত্রে তাহার নজর পড়িয়া গেল, সুজন ভিন্ন আরও একজন অপরিচিত লোকের দুইটী বিস্ময়াশ্চর্য্যে সমুজ্জ্বল চোখের উপরে। সে যে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত কার্য্যাবলীই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে,—তাহা তাহারই সেই নির্ব্বাক্ চিন্তায় স্তব্ধমূর্ত্তিই বিশেষভাবে বলিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণার পদ-নখ হইতে মস্তকের কেশাগ্র অবধি লজ্জায় ও বিরক্তিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তার সে সুস্পষ্ট মানসিক চাঞ্চল্য এই একটা কোথাকার কে বাহিরের অচেনা লোক—এ কি হিসাবে নিতান্ত অভদ্রের মতই ইহার সাক্ষী হইতে আসিল! ছি ছি! সেই বা কি? মনে এতটুকু বল নাই? আত্ম-সম্বরণের শক্তি তাহার এতই কম? সম্মুখে চাহিতেই সুজনের দৃষ্টির বিস্ময়ও অস্পষ্ট রহিল না। লজ্জায় প্রভাত-সূর্য্যের মত রক্ত ও তপ্ত মুখ নত করিয়া ইহাদের চোখের ভাষা হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া সে মৃদু নম্রকণ্ঠে সুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"আপনি আমার জন্য অনেক করলেন; কিন্তু আর একটী অনুরোধ—"

বাধা দিয়া সুজনও সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "আপনার জন্য আর কি কর্‌লুম, এ তো আমারই 'ডিউটী'। তবে যদি কিছু কর্‌বার থাকে, স্বচ্ছন্দে বলুন, যথাসাধ্যই চেষ্টা কর্‌বো।"

কৃষ্ণা মুখ আরও নত করিয়া তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, "এর যাতে ভাল করে সেবা ও চিকিৎসা হয়, তার জন্য কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না? অবশ্য আমি টাকা দিতে রাজী আছি।"

মুগ্ধ হইয়া গিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে শিক্ষানবীস ডাক্তার কহিয়া উঠিল, "টাকার দরকার হবে না এম্‌নিই এর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" অশ্রু-ছলছল সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিদ্বারা ভাষার অতীত কথা প্রকাশ করিয়া—মাত্র এইটুকুই সে ফুটিয়া বলিল, "অনেক ধন্যবাদ!"—

তারপর নত হইয়া একবার আহতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে নিদ্রিত মনে হইতেই নিঃশব্দপদে সে নিকটবর্ত্তী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, "আজ আমি যাই, আবার কাল সকালে আস্‌বো।"—

যে ছেলেটী এতক্ষণ ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সে এতই আশ্চর্য্য ও দিশাহারা হইয়াছিল যে, ইহারা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ তেম্‌নি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মরণ যে মানুষের সঙ্গে কি হিসাবে কারবার করে, সে বোঝা বড় সহজ নয়। তবে পচা রদি মালের কারবার যে সে করে না, এটুকু বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

মেডিকেল-কলেজের এই সার্জ্জিকাল ওয়ার্ডে আনাগোনা করিয়া কৃষ্ণা কয়েকদিনেই এ সম্বন্ধে বেশ একটুখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। সেই আহতা বুড়ীটা—নাম তার 'নবার মা',—তা' সে নবার মায়ের কঠিন প্রাণ তাহার দৈন্যগ্রস্ত জরাবার্দ্ধক্যময় দেহের মায়া ত্যাগই করিতে পারিল না, অথবা যমরাজার ঘরে এসব অপ্রয়োজনীয় জীবনের মূল্য এই সংসারেরই হিসাবে বেজায় সস্তা বলিয়াই হোক্, মৃত্যু তাহাকে ধরি ধরি করিয়াও স্পর্শ করিল না।—স্পর্শ করিল না বটে; কিন্তু বড় নির্ম্মম পরিহাস করিয়া গেল। অক্ষম ভিখারীর দুটী চক্ষু-রত্নকে সে অপহরণ করিয়া পলাইল। প্রথম যেদিন এ সংবাদ কৃষ্ণা ডাক্তারের মুখে জানিতে পারিল, সে তাহার পক্ষে এক ভীষণ মুহূর্ত্ত! সেইক্ষণে তাহার মনে হইল, কে' যেন দুইটা তপ্ত শলাকা বিঁধিয়া তাহারই দুইটা চোখ চড়্‌চড়্ করিয়া উপড়াইয়া আনিতেছে। দু'চোখে অন্ধকার দেখিয়া সে টলিয়া পড়িতেছিল; ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।—

বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই, সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইবার বিপুল উদ্যমের সহিত লজ্জা-কুণ্ঠিতমুখে জবাবদিহির ভাবে কহিল, "মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। থাক্, ব্যস্ত হবেন না, সেরে গেছে।" এই বলিয়া নিজের দুই কম্পিত পায়ের অবাধ্যতা জোর করিয়া রোধ-চেষ্টার সহিত, কম্পিত-কণ্ঠকে স্বাভাবিক করিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা, চিকিৎসা করে ওর চোখ আরাম করা যায় না"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন, "না—

"যদি খুব অনেকদিন ধরে, বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়?"

ডাক্তার নিশ্চিত বিশ্বাসে উদাস-কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কোন রকমেই না। চোখের ভিতরকার দু'একটী নার্ভ রাপ্চার হয়ে গেছে। অন্ধ না হয়ে উপায় নাই।"

অর্দ্ধ-ব্যক্ত বিলাপের মতই কৃষ্ণার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, "এর চেয়ে যে ওর মৃত্যুও ভাল ছিল!"

ডাক্তার কহিলেন, "তা' বই কি! শুন্ছিলুম ভিক্ষাই ওর জীবিকা।"

কৃষ্ণা কাতরস্বরে কহিল, "ওর যে কেউ নেই—"

ডাক্তার কহিলেন, "সত্যি! তবে তো বড্ডই—"

একটী নূতন রোগী লইয়া কয়েকজন কুলী আসিয়া খবর দিল। ডাক্তার উহাদের ধমক দিয়া বলিলেন, "যা, যা, উপরে নিয়ে যা, ছেলেরা দেখ্বে এখন, আজকাল মোটরে-কাটা আর ট্রামে-চাপার শেষ নেই দেখ্ছি! 'এপিডেমিকে' এত লোক মরে কি না মরে!"

সেদিন নবার মা'র ঘরে ঢুকিতে কৃষ্ণার পা যেন অধিকতর বাধিয়া যাইতেছিল। একেই তো উহার সান্নিধ্য তাহার মনের উপর বিশ মণ পাষাণ ভার চাপাইয়া রাখে; তার উপর—আজ যখন তাহার 'মরার বাড়া' পরিণামের কথা সে শুনিতে পাইল, তখনই অপ্রতিবিধেয় অপরাধের সঙ্কোচে মন তাহার যেন এতটুকু হইয়া গেল।

ঘরে পা দিতেই একজোড়া উজ্জ্বল ও উৎসুক নেত্র তাহাকে যেন নীরব অভিনন্দন জানাইয়া দিল। এ চোক-জোড়া তাহার চেনা;—যতই অন্যমনস্ক থাক্, এ দৃষ্টিকে আজ তাহার বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে করিতে বাধা পড়িল না। এ যাহাকে সে দিন-তিনেক আগে প্রথম আসার দিনে এই ঘরেই দেখিয়াছিল, সেই।

লোকটী বোধ করি ন'বার মা'র সঙ্গেই কি কথা কহিতেছিল, বোধ করি তাহার গৃহ-প্রবেশের জুতার শব্দেই মুখ তুলিয়া চোখের দৃষ্টি দ্বারের দিকেই ফিরাইয়াছিল। এখন তাহাকে সঙ্কুচিত দেখিয়া নিজে সে একটু সরিয়া গেল, কিন্তু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল না। চলিয়া ত গেলই না এবং শীঘ্র যাইবে তাহাও বোধ হইল না, অগত্যা কৃষ্ণা তাহার সান্নিধ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই বুড়ীর বিছানার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

"কেমন আছ?"

এ ঘরে আর দু'খানা খাট ভর্ত্তি হইয়াছিল। একটা রোগী আচম্কা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জল! জল! জল!"

"শীগ্গির একটু জল দাও গো—"

ন'বার মা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মলো! এখানে কি তোর মা বোন জলপাত্তর ভরে নিয়ে বসে আছে না কি, যে, অত জোর তাগিদ্ দিচ্চিস্!"

কৃষ্ণা আজ অকম্পিত-হস্তে ন'বার মা'র জন্য রক্ষিত সেই ময়লা কাপড়-পরা অপরিচিত লোকটীর বিছানায় গিয়া বসিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল, "হাঁ কর, আমি জল এনেছি! আরও চাই?"

"আর না, আঃ! কে' গা তুমি? জল দিয়ে বাঁচালে? হাঁস্পাতালে এমন যত্ন করে কথাই বা কে' কার সঙ্গে কয়?"

কৃষ্ণার মুখ আনন্দের উচ্ছ্বাসে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। এই যে কয়টী প্রশংসার বাণী সে একজন অতি সাধারণ লোকের মুখ হইতে শুনিল, পূর্ব্বে স্বয়ং লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়া অনেক মহারাজ ও বড় বড় সাহেব-সুবার মুখে শুনিয়াও ইহার মত সুখ তাহার কখনও যেন হয় নাই। উত্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর একজনের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া নিরুত্তরেই রহিয়া গেল।

"খৃষ্টানি-বিবি! বলি ওমা খিষ্টানি বিবি! হ্যাগ্যা মা আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চো? বলি কতদিনে আমার চোখের বাঁধন ওরা খুলে দেবে বল্‌তে পার কিছু? আঁধারে থেকে যে প্রাণ হাঁপিয়ে মরে যাচ্চি, দিনে রেতে, ক'দ্দিনে এই 'কাণা-মাচি' খেলার থেকে রেহাই পাব গা' মা?"

কৃষ্ণা তাহার আহ্বানে কাছে আসিয়াছিল, প্রশ্ন শুনিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া তাহার একটীও কথা বাহির হইল না। এই যে অন্ধকার হইতে মুক্তি পাওয়ার একান্ত ব্যাকুল অধীরতা, এর উত্তরে সে কি তাহাকে জানাইবে যে, সে আলো—সেই উদ্বেগ-প্রতীক্ষিত আলোকের রশ্মি এ জীবনে আর কখনই সে দেখিতে পাইবে না।—এ কথা কি বলা যায়?—আর তাহারই মুখ দিয়া ইহা বাহির করিতে হইবে?—

কিছুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া বুড়ী আত্মগতই সমাধান করিয়া লইল, "ওমা, মিথ্যে বকে মর্‌চি? মাগী বুঝি চলে গেছে! হবে। তা' যাই হোক্ মাগীটা লোক ভাল! তবে বয়েস বোধ হয় উট্‌কো হবে; নইলে যেমন তড়্‌বড়িয়ে আসা, তেমনি হুড়মুড়িয়ে যাওয়া! একটু যে বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা শুন্‌বে কাণ দিয়ে, সেটী নেই! যা' হোক্, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে তো তেড়ে মার্‌তে আসে,—বলে 'তা'তে তোর দরকার কি? তুই চুপ্ করে থাক্ না।' ওমাঃ! বলে কি? আমার যদি দরকার নেই তো কি আমার চোখে তোর দরকার? আ খেলে যা! মাগী হাজারই হোক্ মেয়ে-মানুষ তো, গোরার মতন মেজাজখানা নয়, ভাল করে জেনে নিতুম!"

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মতন নিঃশব্দে কৃষ্ণা বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দার রেলিং ধরিয়া শূন্য-চক্ষে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উঃ! একটা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে আসিয়া কত পাপই না তাহাকে করিতে হইতেছে! এই মিথ্যা, এই প্রতারণা—এ অন্ধ বলিয়াই তো সে অনায়াসে উহার সহিত করিতে পারিল? আর সে অন্ধত্বপ্রাপ্তি আজ তাহার কাহাদের জন্য?—আচ্ছা এই জন্যই কি ভগবান তাহার পিতাকেও অন্ধত্ব দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। হয়ত' তাই, হয়ত' তাহাদের দ্বারা এই রকম ঘটনা ঘটিবে বলিয়াই পূর্ব্ব হইতে ইহার বিচার ও দণ্ডও—নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে।—হয়ত' জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল কার্য্যেরই প্রত্যেক ছোট-বড় খুঁটী-নাটি সকল অন্যায়, তা' সে যতই ক্ষুদ্র হোক্ না কেন, সকলেরই জন্য এমনই কত শত কঠিন, কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থাও সেই অবিচ্ছিন্ন ন্যায়-বিচারকের বিচার-সভায় কবে হইতে স্থিরকৃত হইয়া আছে। হয়ত' একটার পর একটা—হয়ত' একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াই বা তাহারা অকস্মাৎ তাহার মাথার উপর কোন সময় অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উঃ!

"মিস্ মল্লিক!"—

চকিতে মুখ ফিরাইয়া সন্ত্রস্ত হরিণের মত ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই সেই আধ-চেনা মুখখানা পুনশ্চ চোখে পড়িয়া গেল। ইহার কথাটা এতক্ষণ তাহার স্মরণই ছিল না!

"মিস্ মল্লিক! আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। পারবেন কি আমায় মার্জ্জনা করতে? ভাল করে না জেনে কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই শুধু অপর লোকের মুখে শোনা গুজব থেকে, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম এবং সে ভুল যে আমি নিজের মনের মধ্যে আপনি না রেখে সর্ব্বসাধারণ্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি—আমার অপরাধ এইখানেই সম্পূর্ণরূপে অমার্জ্জনীয়।"

কৃষ্ণার প্রথমোদিত বিস্ময় এইবার নিশ্চিত ধারণার অসংশয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেই গভীর বিদ্বেষে তাহার সারাচিত্ত যেন এক নিমেষেই ভরিয়া উঠিল। তাই বটে!—সে-ই বটে! এই জন্তই প্রথম-দর্শনাবধিই—ইহার মুখ তাহার চেনা-চেনা বোধ হইয়াছিল।—কিন্তু মুখের চেয়ে কণ্ঠ,—এ তো আর ভুলিয়া যাইবার জিনিস নয়, অগ্নি-তপ্ত শলাকার মতই যে উহা তাহার দুই কাণের ভিতর দিয়া অহোরাত্রই তাহার প্রাণের মধ্যে বিঁধিয়া রহিয়াছে। ঐ কণ্ঠের উত্তপ্ত স্বরে সেই নির্ঘাত অপমানের প্রত্যেক কথাটী প্রতি আগুনের টুক্‌রার মত তাহার বুকখানাকে যে ছাই করিয়া দিল। সে দিনের সেই বক্তৃতা কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নামোল্লেখ না থাকিলেও সেদিনে সেখানে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষগণের কল্যাণে এ লইয়া তাহার পশ্চাতে অনেক হাসি-রঙ্গও যেন চলিতেছে, আবার উহাদেরই কৃপায় সে সংবাদটাও তাহার কাছে উহ্য নাই,—তবে কেমন করিয়া সে ভুলিবে। আগুনে তাতিলে সোণার যে রং হয়, তাহারও মুখ তেমনি টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধে অধীর হইয়া কম্পিত-অধরে খুব কঠিন করিয়া কিছু বলিতে গিয়া সে শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে সমর্থ হইল—"বেশ করেছেন, বলেছেন! আপনারা পুরুষদের কিছু পারেন না, কাজেই যাদের পারা সহজ তাদের সঙ্গে না বল্‌লে আর কা'দের সঙ্গে লাগ্‌তে যাবেন? তার আর মার্জ্জনা কিসের?"

ছেলেটী বেজায় অপ্রতিভ হইয়া রহিল এবং পরে লজ্জিত ধীরকণ্ঠে কহিল,—"আমি তো প্রথমেই বলেছি, আমি ভুল করেছি! সেদিন আপনাদের নর-হত্যার পর অনায়াসেই আমোদে মাত্‌তে দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেছলো। সেই সময়েই একটী লোক আরও একটী কঠিন মন্তব্য করলে, এখন আমি সে সম্বন্ধেও আমার ভুল জান্‌তে পেরেছি। হঠাৎ সেটা বিশ্বাস করাও আমার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেচি—কা'কে আমি কি মনে করে কতবড় অপমান করে ফেলেছি! সেজন্য আমি যে কি পর্য্যন্ত অনুতপ্ত তা' বল্‌তে পারিনে। যা' করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাও আমি করতে রাজী আছি!"

কৃষ্ণার আহত অন্তরের তীব্র দাহজ্বালা এই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ-কারী অপরাধীর সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ও অনুতপ্ত মুখভাবে প্রশমিত হইয়া আসিল। তথাপি এ তো তাহার গোপন লজ্জা নয়; সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত, সমালোচিত—হয়ত' কত লঘুচেতার দ্বারায় উপহসিত সেই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কথা, তার জ্বালা ভুলিলেও, সে দাগ কি আর কখনও—এ জীবনেই কখন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিতে পারিবে। বিমর্ষ-মুখে সে নিরুৎসাহভাবে কহিল, "যা' ক্ষতি আমার হবার হয়ে গেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত আর কেমন করে করবেন? সে হয় না"

ছেলেটী কথার উপর জোর দিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, যদি আমি

'পাব্লিকের' সাম্‌নে অথবা সংবাদ-পত্রে ছাপিয়ে আমার ভুল স্বীকার করি ; আর প্রকাশ্যেভাবেই আপনার ক্ষমা চাই ?"

উহার মুখে ও কণ্ঠে সরল সত্যের দীপ্তি-সহিত নির্ভীক তেজস্বিতা ব্যক্ত হইয়া উঠিল। এ ব্যক্তি যাহা করে অন্তরের সহিতই করে, যেটুকু উচিত বোধ করে, তাহাতে সে কোনরূপেই কুণ্ঠিত নয় ; এই পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণার মনের বিদ্বিষ্টভাবও বহুপরিমাণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার স্থলে যেন একটুখানি সশ্রদ্ধভাবও দেখা দিতে লাগিল।—সেও একটু ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, অমন কাজ কর্‌বেন না! আমার নাম নিয়ে কোন রকম আলোচনাই আমার সহ্য হয় না। ওতেও আর একবার ওই সব পুরণো কথার আন্দোলন হবার সুযোগ দেওয়া হবে।"

ছেলেটী তখন যেন কতকটা হতাশ হইয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল, "তবে আর আমি কি কর্‌তে পারি বলুন ?" তারপর আবার বলিল, "কিন্তু আমি নিজে বড়ই অনুতপ্ত হয়েছি, এটা আপনি অবশ্য বিশ্বাস না কর্‌লেও আপনাকে আমি দোষ দিতে পারিনে,—কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য!"

কৃষ্ণা এ কথাটা একটুও অবিশ্বাস করিল না, করিবার উপায় ছিল না, সে মুখে ও কণ্ঠে কৃত্রিমতার সংশয় অতি বড় সংশয়াত্মাও করিতে পারে না।

দুজনে একটুখানি চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর এবার কৃষ্ণা নিজেই প্রথমে কথা কহিল, ক্ষুণ্ণস্বরে সে কহিল, "ডাক্তার বলেচেন, ন'বার মা একেবারেই।—"

"—হ্যাঁ, অন্ধ হয়ে যাবে!"

"আমারও তাই সন্দেহ হচ্চে!"

"আপনিও এ কথা তা' হলে জানেন? ডাক্তার আপনাকেও ওই কথাই বলেচেন?" কৃষ্ণার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

যুবক কহিল,—"ডাক্তারও বলেচেন, আর আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি, ওর দু'চোখেরই কয়েকটী করে নার্ভ—"

কৃষ্ণা মৃদু-নিক্ষিপ্ত শ্বাসে প্রায় আত্মগতই কহিল, "ওঃ, আপনিও তা' হলে একজন ডাক্তার!"

ছেলেটী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "না, আমি ডাক্তার নই, তবে এখানের একজন এক্স-ষ্টুডেণ্ট' বটে। পাঁচ বৎসর পড়েছিলুম।"

"পাঁ-চ-ব-ৎ-স-র!—তবু ডাক্তার নন্!—সে কি রকম?"

ছেলেটী হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ ফাইনাল্ পরীক্ষার ঠিক আগের মাসেই কলেজ ছেড়ে দেওয়া গেছ্‌লো, তাই ডাক্তারীর কোন ডিপ্লোমা পাওয়া যায় নি।"

কৃষ্ণা এই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির,পরিচয়ে ক্রমেই কৌতূহলী হইয়া পড়িতেছিল, সে আবার সাশ্চর্য্যেই প্রশ্ন করিল, "তা'তে কি লাভ হলো?"

সে উত্তর করিল, "হলো বৈ কি! ডাক্তারীর ডিপ্লোমা না থাক্‌লে সরকারী বা বেসরকারী কোন রকমের চাকরী কর্‌বার সুযোগ পাওয়া যাবে না, অথবা প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌তে গেলেও ডিপ্লোমা-হীন ডাক্তারকে লোকে ভিজিট দিয়ে ডাক্‌বে না, লাভ এইটুকুই হবে।"

বিস্ময় যেন সীমাতিক্রম করিতেছিল! কৃষ্ণা যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়াই গভীর কৌতু-

হলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে ভিজিট্ দিয়ে ডাক্‌বেই না যদি, তা' হলে ডাক্তারী শিখে কি হলো ?"

ছেলেটী তাচ্ছল্যভাবে উত্তর করিল, "যারা ভিজিট্ না দিয়েও ডাক্‌বে, তাদের জন্ম শেখা গেল। তার সংখ্যাও তো কম নয়।"

কৃষ্ণা অবাক্ হইয়া তাহার নির্লিপ্তবৎ শান্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু-মৃদু যেন আত্ম-গতই কহিল, "ও, আই সি !—আচ্ছা, আপনি কি সেইজন্যই এখানে আসেন ? আমার মনে হচ্ছিল ; আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করাই আপনার উদ্দেশ্য !"

ছেলেটীর মুখে প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তেজনা এক মুহূর্ত্তে জলন্ত হইয়া দেখা দিয়াই পরক্ষণে যেন ঝটিকা-প্রহত দীপ-শিখার মতই নিমেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে শুধু অত্যন্ত অবজ্ঞার ভাবেই জবাব দিল, "আমার ততদূর ধৈর্য্য ও সময় থাক্‌লে, আজ সেদিনকার জন্ম আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আস্‌তে হতো না।"—তারপর সম্পূর্ণরূপেই আপনার উপরে জয়লাভ করিয়া লইয়া দিব্য-হাসিমুখে পুনশ্চ কহিল, "তা' নয়, এইখানেই তো পড়ে গেছি ; এর সব খবরই আমার তো জানা আছে।" গরীবদের উপর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমান আদর হয়ে থাকে। এই যে সার্জ্জিক্যাল 'ওয়ার্ড' দেখ্‌ছেন, এখানে অ্যাক্‌সিডেন্টের পেসেণ্ট এলে, সর্ব্বত্রই যেমন সহজে ডাক্তারের নাগালই তারা পায় না। কুলিরা ছাত্রদের খবর দিয়ে গেল, এখন ছাত্রেরা যদি হৃদয়বান্ বা কর্ত্তব্যপরায়ণ না হন, তা' হলেই রোগীটী হয়ত' পড়ে পড়ে মরেই গেল।—অবশ্য যারা মুমূর্ষু। আর যাদের প্রতীক্ষা সয়, তারা যথাকালের জন্ম অপেক্ষা করে তো থাক্‌তেই পারে। তাই সন্ধ্যা-সকালে এক-আধবার এসে ওই রকম হতভাগাগুলোর এক-আধটুকু খবর নিয়েও যাই, আর বেড়িয়েও যাই। আচ্ছা এখন তা' হলে আসি, আর এক জায়গায় যেতে হবে। আপনি তা' হলে আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন, কেমন ? যদিও পারাটা হয়ত' খুবই কঠিন, আমি হলে বোধ করি পার্‌তুমই না।"

ছেলেটীর কথা বলার ধরণে ও সরলতায় কৃষ্ণার মনের রাগ দুঃখ যে কোন্ সময়ে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে খবর সে জানিতেও পারে নাই। এখন পূর্ব্ব-কথার উল্লেখে সে কথা মনে পড়িতেই সে যেন এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া ভাবিল, ইহার উপর আবার রাগ করিবে কি? ক্ষমা না করিবার তো কোন উপায়ই এখানে নাই ?—প্রকাশ্যে ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া প্রীতি-মধুর-কণ্ঠে উত্তর দিল,—"বেশ, তাই হবে ! আচ্ছা, আপনি কি এনার্কীষ্ট ?"—প্রশ্ন করিয়াই সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।—কেহ নাই। শুধু একটা ভৃত্য এনামেলের একটা বড় গামলা ভরিয়া ধোঁয়া-ওঠা গরম জল লইয়া বারান্দার শেষপ্রান্তে আর একটা ঘরে ঢুকিয়া গেল।

প্রশ্ন শুনিয়াই কিন্তু ছেলেটীর মুখের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের কোণে ও অধরপার্শ্বে যেন কৌতুকের সহস্র উৎস কেবলমাত্র একটুখানি ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া আছে—এম্‌নি বিদ্রূপ হাসির আভায় চক্‌মকে তাহার চেহারাটাকে দেখাইল। কিন্তু সে উদ্দাম হাস্য-স্রোতকে জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া সে মাত্র মৃদু-হাস্যের সহিত সকৌতুক প্রশ্ন করিল, এনার্কীষ্ট আপনি কা'কে বলেন ?"

সলজ্জায় কৃষ্ণা জবাব দিল, "রাজা এবং রাজ্যের যারা উচ্ছেদ-কামনা করে। প্রশ্নটা যে সঙ্গত

হয় নাই, তাহা প্রশ্ন করিবার অর্দ্ধ-নিমেষমাত্র পরেই সে বুঝিতে পারিয়া নিরতিশয় লজ্জা পূর্ব্বেই পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিপুল হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসিত এবার আর হাসিল না, বরং সহসা উদিত গাম্ভীর্য্যের মেঘে নিজের সুকুমার মুখ-ক্লান্তি গাম্ভীর্য্যময় করিয়া তুলিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে এই জবাব দিল, "রাজার তো নয়ই ; রাজ্যেরও উচ্ছেদ-কামনা বা তদ্বিষয়ক কার্য্যে আমরা লিপ্ত নহি। আমাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য 'স্বরাজ লাভ। আর তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নয়; এমনি কি, বিবাদ-কলহ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষতা মাত্র আমরা অবলম্বন করবার পক্ষপাতী। একে যদি এনার্কীজম্ বা রাজদ্রোহ' বলেন বল্‌তে পারেন।"

কৃষ্ণা এই স্পষ্টবাদী ও তেজী ছেলেটীর প্রতিবাক্যে ও প্রত্যেক ব্যবহারে তাহার অন্তরস্থ ত্যাগ ও নির্ভীকতার মহত্ত্বের পরিচয়ে নিজেকে ইহার কাছে অত্যন্তই লঘু ও হীন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। সে তাহার সম্বন্ধে যে অবিচার করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—তার জন্য অকপটে অসঙ্কোচে সে এই অপরিচিতার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিতেও দ্বিধামাত্র করে নাই ; কিন্তু বাস্তবিকই কি সেদিন সেই যে কথাগুলা সে উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিয়াছিল, সেগুলা একেবারেই মিথ্যা! ভিত্তিহীন? কেমন করিয়া সে কথা বলা চলে? উহার সেদিনকার কোন্ কথাটা মিথ্যা? এই একটা পাপের না হয় সে সামান্য প্রায়শ্চিত্তই করিতে আসিয়াছিল! তাও সেই তীক্ষ্ণ ক্ষুরবাণে না বিঁধিলে কি এতটাই করিত? আর কবে সে গরীবের জন্য এতখানি করিতে সমর্থ হইয়াছে? কবে? কখনও না! তবে!—কিসের এ মিথ্যা গৌরব? কিসের অহঙ্কারে এই ত্যাগদীপ্ত অন্তরের সুপবিত্র অনুতাপ সে অবহেলার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? সে তো এ বস্তু পাওয়ার যোগ্যই নয়।

এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুখের ভাবটাকে সহজ ও প্রফুল্ল দেখাইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"তা' হলে আপনাকেও আমি ভুল বুঝে আপনার' পরে অবিচার করেছি।—যাক্, দু'জনকারই অন্যায়ের শোধ-বোধ হয়ে গেল, এবার থেকে আমাদের মধ্যে—" বলিতে বলিতে নিজের মনের উত্তেজনা নিজেরই কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া যাইতেই সে মনে মনে জিব্ কাটিয়া নীরব হইয়া গেল ; কিন্তু ততক্ষণে অপরপক্ষ ঠিক তেম্‌নি উৎসাহিত আনন্দে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া দিয়া অসমাপ্ত পদ পূরণ করিয়া দিয়াছে,—"বন্ধুত্ব স্থাপন হয়ে গেল,—কেমন?"

তখন কোনমতে নিজের অন্তরস্থ অস্থিরতা গোপন করিয়া নত-চক্ষে কৃষ্ণা উত্তর দিল, "হুঁ।"

তারপর ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে দু'এক পা চলিতে আরম্ভ করিয়াই বারেক থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু-কুণ্ঠিতবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লে আপনার খোঁজ পাব? এই ধরুন, যদি আপনার কোন 'স্পীচ্'ই শুন্‌তে গেলুম।—"

উহার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর লুকান ছিল না, কিন্তু সেই সন্দেহ যুবার গৌর-গ্রীবা ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া দিল। সে উত্তর দিল,—আমার নাম বিনয়কুমার শীল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া জগদ্ধাত্রী ইষ্টদেবতা ইত্যাদির নাম স্মরণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কাণে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীর খন্‌খনে আওয়াজ এবং

সদর-দেউড়ীতে সেখানা থামার শব্দ একসঙ্গে প্রবেশ করিল। এত সকালে কে' আসিল? এই কথা মনে করিতেই মনটা উৎসুক হইয়া 'অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী' প্রভৃতির পুরাণ-গাথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া খুব আধুনিক একটী মেয়েকেই স্মরণ-পথে টানিয়া আনিয়া এবং জিহ্বামূলেও তাহারই নামটা ঠেলিয়া পাঠাইল,—"বৌমা! দেখ তো গা, গাড়ী করে কে' এলো?"

ঠিক পাশের ঘরেই দেওয়ালে লাগান কাঠের আন্‌লা হইতে একখানা লালপেড়ে গরদের শাড়ী টানিয়া লইয়া বৌমা 'উর্ম্মিলা' তখন নীচে নামিবার উদ্যোগে ব্যাপৃতা ছিল; শাশুড়ীর হুকুমেও বটে এবং নিজের কৌতূহলেও বটে, কাপড় গামছা ছুঁড়িয়া ভূমে ফেলিয়া কে আসিল দেখিবার জন্ম ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়া দিল। গাড়ীখানা ইতঃমধ্যে গাড়ী-বারান্দার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ায় উপর হইতে দেখিতে পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চটাপট্ চটাপট্ চটিজুতার শব্দ শোনা গেল।—উর্ম্মিলা নিজের গতিবেগ সংযত করিয়া ফেলিয়া ভদ্রভাবে মাথায় কাপড় তুলিয়া ঢাকা দিল; এবং আত্মগতই কহিল; "নিশ্চয়ই ঠাকুর-মশাই। তা' আজ এলেন কেন? সরস্বতী পূজোর তো এখন সাত-আট দিন দেরী আছে!—এতদিন ধরে বসে বসে কেবলই সকল তা'তেই খুঁৎ ধরে খিট্‌মিট্ করতে থাকবেন। বাবা রে, বাবা!"

পায়ের চলনটাকে বৃদ্ধ ও স্থূলদেহধারী 'ঠাকুর-মশাই' এর চলন নহে বলিয়া সন্দেহ জাগিতেই যেম্‌নি নবজাত কৌতূহলে তিনটা সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া সে একেবারে ধুপুস্ করিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, অম্‌নি সেই চটিজুতার অধিকারীটির সহিত তাহার চোখে চোখে মিলন ঘটিয়া গেল।—

"হরিবোল হরি! তুমি! এই শীতকালের ভোরের বেলায় চটিজুতো পায়ে দিয়ে! বাবা রে বাবা! এ আবার কি খেয়াল চেপেচে ঘাড়ে শুনি?"

আগন্তুক এই খেয়াল-চাপার ইতিবৃত্ত শুনাইবার কোন উদ্যোগ না দেখাইয়া ভদ্রভাবে এই প্রশ্ন করিল, "ভাল আছিস্ তো বাঁদ্‌রি?"

উর্ম্মিলা ঠোঁট ফুলাইল।—"যাঃও। চিরকাল ধরেই কি আমায় তুমি ঐ সবই বল্‌বে না কি?"

বিনয়কুমার সোপানারোহণ-চেষ্টায়, সিঁড়ির একজোড়া ধাপ বাদ দিয়া একেবারে তৃতীয় পৈঠায় লম্বা ঠ্যাং তুলিয়া খুব নিকটেস্থিত উর্ম্মিলার বাম-গণ্ডে নিজের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনি দ্বারা একটা টোকা মারিয়া ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, "নাঃ, ওঁকে এখন থেকে নুরজাঁহাবেগম অথবা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা বলে বলে ডাকতে হবে।"

কোন 'নুরজাঁহা'র সম্বন্ধে যদি বা ঈষৎ একটুখানি জানাও থাকে, 'ক্লিওপেট্রা রাণী'র বিষয়ে উর্ম্মিলার কোন খবরই জানা ছিল না, কাজেই সেই দুই নামে তাহাকে ডাকা সম্বন্ধে সে বেশ স্পষ্ট করিয়া আপত্তি বা নিরাপত্তি জানাইতে সমর্থ হইল না, শুধু একটুখানি অপ্রতিভ 'হবো হবো' করিয়া সবেগে মস্তবড় খোঁপা-শুদ্ধ মাথাটাকে নাড়া দিয়া সজোরে কহিয়া উঠিল, "ধেৎ! ও-সব তোমাকে কে' বল্‌তে বল্‌চে? তা' বলে ঐ ছাড়া আর যেন কিছু বল্‌বার কথা বিশ্ব-সংসারে নেই।"

বিনয় সিঁড়ি-ওঠা বন্ধ রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল,—"হুঁ-উ, তা' আবার নেই!—বিশ্ব-সংসারে বল্‌বার এত কথা আছে যে, সে শুন্‌তে গেলে এক

বিষম মুস্কিল্ বেধে যাবে। আচ্ছা, দু'একটা শুন্‌বি? তবে বলি শোন্, এক রাক্ষুসী, দুই পেত্নী, তিন হনুমানী, চা'র—"

ঊর্ম্মিলা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া ত্বরিৎ-হস্তে বিনয়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে গেল, মুখখানা ফুলাইয়া ভীমরুলের চাকের মতন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"যাও, যাও, আর তোমায় বল্‌তে হবে না। খবরদার বল্‌চি, আমায় তুমি যদি কোন নাম ধরে ডাক্‌বে, তো আমিও কেটে ফেল্‌লে তোমায় জবাব দেবো না, তা' বলে দিচ্চি।"—

বিনয় মুখের উপর চাপা দেওয়া হাতখানা মুঠায় চাপিয়া রাখিয়া সকৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "বেশ্, তাই সই! আমি তা' হলে তোকে এবার থেকে 'বিনামা' বলে ডাক্‌বো, কেমন রাজী?"

নামটির ভিতরকার নিহিতার্থটা ঊর্ম্মিলার জানা ছিল না। কাজে-কাজেই সে বেচারী মন্দের ভাল হিসাবে, মনে মনে ইহাতেই অর্দ্ধসম্মত-গোছ হইয়া অবশ্য বাহিরে ঘাড় বাঁকাইয়া জোড়া ভুরুর গুণ ঊর্দ্ধে চড়াইয়া হাসি-মাখা সোহাগে-ভরা চোখের তারার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শর ক্ষেপণ করিয়া আব্দারে গলিয়া পড়িয়া বলিল; "যাঃও! তা বই কি! আমার নাম কি নেই, যে আমায় বিনামা বলে ডাক্‌বে? ঊর্ম্মিলা না বল্‌তে পারো, তবু "উর্মি' বল্‌লেও তো চলে। তোমার শুধু আমাকে জ্বালাবার ফন্দি বই তো নয়!—"

বিনয় এই দীর্ঘ বক্তৃতার বিনিময়ে তাহার গোলাপ মুখের ছোট্ট নথটি ধরিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় উপরের সেই ঘরটার মধ্য হইতে ডাক শোনা গেল।—

"বৌমা! বলি বৌমা! কই, কে এলো রে? গাড়ী করে কে' এলো? ওরে, ও ঊর্ম্মিলা?"

"ঐ রে! একেবারে সব ভুলে গেছি! ওমা! মা! আচ্ছা, আমি কাছে গিয়ে বল্‌চি। বেশ তো তুমি মজার লোক! চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌চো! মা'কে নিজে তো ডেকে বল্‌লেই পার্‌তে যে আমি এসেছি!"—

বিনয় বলিল, "আমায় তো মা জিজ্ঞেস্ করেনি যে আমি বল্‌তে যাবো। তুমিও তো বল্‌লেই পার্‌তে যে 'বিনয় এসেছে।' "

"আহা মরে যাই, কি কথারই ছিরি!"—ঠোঁট বাঁকাইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর দিকে একটা কিল উঁচাইয়া দেখাইল,—তারপর সে দ্রুতপদে শাশুড়ীকে খবর দিবার উদ্দেশ্যেই কোন্দলে ধামা চাপা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বিনয়ও তাহার পিছনে উঠিতে উঠিতে দূর হইতেই ডাক দিল,—"মা!"

জগদ্ধাত্রী ততক্ষণে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, আস্তে-ব্যস্তে কাছে আসিতে আসিতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "কে রে, আমার বিনয় এলি!"

বিনয় পাঁচ বৎসরেরও কিছু বেশী কাল কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে খুব অল্প সময়ই সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে পাইয়াছিল, ডাক্তারী পড়ায় ছুটী কম, কামাই চলে না, তারও উপর কলিকাতার নানান্ হুজুগে মাতিয়া ঘরের কথা তাহার মনে বড় কমই পড়িত।

প্রথম দু'এক বৎসর ছুটি-ছাটায় আসা যাওয়া ছিল, ক্রমে পড়ার চাপ বাড়িল, অবসরও বড়ই কম। পড়ায় ছেলের এতটা মন হইয়াছে দেখিয়া বাপ-মাও বড় বেশী জিদ্ দেখাইতেন না। তারপর বিপিন শীলের মৃত্যু হইল। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে মধ্যে মধ্যে দু'একদিনের জন্য আসা যাওয়া তাহাকে বিষয়-কার্য্যব্যপদেশে করিতেই হয়। বাপের কারবার সে উঠাইয়া দিয়াছে, তবে মায়ের খোঁজ-খবর ও খরচ-পত্রের লেনা-দেনার খাতিরেই যদৃচ্ছাক্রমে বাড়ী আসা অনিবার্য্য। নহিলে যখন হইতে সে পড়া শেষ করিয়া বিনা-ভিজিটের এবং বিনা-ডাকের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে তাহার সময়ই বা কোথায়, যে, সে বাড়ী আসিয়া বসিয়া থাকিবে? মা'কে বুঝাইল, সে দেশের কাজ করিতেছে, এর মত পুণ্য আর কিছুতেই নাই। মা বুঝিবার জন্য তো বসিয়া আছেন, উল্টিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। উর্ম্মিলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বেশ তো দেশই যখন তোমার সব তখন তাই কর।"

সেই দিনই বিনয়ের নাকি ফিরিবার কথা। জগদ্ধাত্রী সে কথাটার বিরুদ্ধে এম্‌নি কাতর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, যে, অবশেষে ব্যস্ত হইয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কি মুস্কিল! তুমি মানুষের দরকার অ-দরকার বোঝ না! আচ্ছা বাবু, না হয় আজ না-ই যাব। দু'একটা রোগী মরে যায়, না হয় গেলই, তুমি তো এখন থামো। আমার মা'র বদলে না হয় তাদের মা'রাই কাঁদুক্।"

মা বলিলেন, "হমু-মুখো ছেলের কথা শোন্ একবার?"

চোক মুছিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া গেলেন এবং ডাক্ পাড়িলেন, "বৌমা! অ-বৌমা!"

উর্ম্মিলা পুতুলের জন্য ছেঁড়া ন্যাকড়া নীলবড়ির জলে রঙ্গাইতেছিল, সেই মূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিলে, হাসি চাপিয়া ফেলিয়া মুখ ভার দেখাইবার সচেষ্ট আয়োজনের সহিত শাশুড়ী বলিলেন, "ঐ জন্যেই তো ছেলেটা ঘরবাসী হতে চায় না! তুই যদি একটু মানুষ হতিস্ উর্ম্মিলা!"

উর্ম্মিলা সাহঙ্কারে নথ নাড়া দিয়া জবাব করিল, "কেন বাপু, কি আমার দোষটা?"

শাশুড়ী একটু বেজার হইয়া বলিলেন, "সে যদি তুমি দেখ্‌তেই পাবে, তা' হলে আর আমার ভাবনাই বা কি? এতকাল পরে সোয়ামী ঘরে এলো, আর তুমি অতবড় সোমত্ত-মেয়ে কোথায় সাজ-সজ্জা করে তার কাছে কাছে থাকবে, যা'তে তোমার দিকে ওর টান হয় তাই করবে, তা, নয়, কোথায় বেরাল-ছানা নিয়ে, ন্যাকরা করে, কোথায় পুতুল নিয়ে নীল-বাঁদর সেজে, কচি খুকির মতন বেড়াতে লাগ্‌লে।"

শাশুড়ীর মুখের এই একদেশদর্শী-ভৎর্সনায় উর্ম্মিলার মনটা কিছু তিক্ত হইয়া উঠিল। একেই নিজের ভিতরটা তাহার এই বিষয় লইয়া কিছু উত্ত্যক্ত হইয়াই ছিল,—তাই মৃদু-ঝঙ্কারে সে অন্তরের সেই সুপ্ত অভিমান কতকটা ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল,—"বাঁদর এনে ঘরে পূরে রেখেছ, বাঁদর না সেজে আর সাজ্‌বো কি? কি ছাই জানি আমি? শিখিয়েছ কিছু?"

জগদ্ধাত্রী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "অমন অধর্ম্মে কথা বলিস্‌নে উমি! তোকে শেখাবার জন্যে কম কিছু চেষ্টা করিছি? পাড়ার মেয়েদের কাছে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গিয়ে পড়াবার জন্যে উল বোনা, সেলাই ফোঁড়াই শেখাবার জন্যে কত দিন ধস্তাধস্তি করেচি, মনে করে বল্ দেখি? তোর হুড়্‌করা ছাড়া দুনিয়া-সংসারে আর কিছুতেই মন বস্‌লো না, তা' আমি কি করবো বল্? এখন

দেখ্‌ছিস্‌ তো? পিটোপিটির মতন খুমসুটি করলেই কি স্বামীকে খুশী করা যায়? একটু যত্ন-আত্তিৎ কি করতে পারিস্‌নে ছাই? মেয়েমানুষেরই একটু গায়ে-পড়া হতে হয়। দেখ্‌ছিস্‌ তো, ও একটা আপনা-ভোলা পাগলা ছেলে।"

রাগ করিয়া উর্ম্মিলা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন তোমরা অত ছোট-বেলায় আমাদের বিয়ে দিয়েছিলে?" বলিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উর্ম্মিলা নিজের সঙ্কটাবস্থা ইদানীং ক্রমেই একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল। সমবয়সীদের বরের চিঠি, তাদের ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া হাসি চাহনির মধ্যে সমবয়সী পরস্পরের সহিত গোপন কথা কওয়া, এ-সব দেখিয়া দুরন্ত লোভের আকণ্ঠ পিপাসায় সে যেন উন্মুখ চাতকের মতই তাহারও 'বরের' তাহারও 'প্রিয়ের' প্রতীক্ষা করিত। আড়ালে বসিয়া শূন্য-শয্যায় শুইয়া সখীদের মুখের শোনা কথাগুলি চুরি করিয়া এক একটি করিয়া বুনিয়া বুনিয়া সেগুলিকে লইয়া নানাভাবে নানারূপে সাজাইত। তাহাদের ইচ্ছামত ভাঙ্গিত গড়িত, আবার একত্র করিয়া মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার এই অনুকৃতির মতে নবীন কোন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই তাহার ছিল না। সে ত নিজের অনুভূতি হইতে স্বামীর আদর, স্বামীর প্রেমানুরাগে পরিপূর্ণ তপ্তস্পর্শ, তাহার উন্মাদনায় ভরা অজস্র সোহাগ-বাণীর কিছুই কখন অনুভব করে না। তার সকল কিছুই যে পরের কাছে ধার করা, সবই যে তার ঝুটা, মাণিক তো তার গলার হারের নয়, পথের ধূলার কাঁচ কুড়াইয়াই তাহাকে খেলার সাধ মিটাইতে হইতেছে যে, তাই যখন তখন দারুণ অতৃপ্তিতে চিত্ত তাহার ভরিয়া উঠে, প্রাণের মধ্যে বিপুল নিরানন্দতার সহিত একটা ব্যাকুল বেদনা অভিমানের তরঙ্গে সারা-মনপ্রাণকে আহত করিতে থাকে। বাহিরের সংসার যেন তার তলায় পড়িয়া ধূসর ও ধূলীমলিন হইয়া যায়।—অথচ যখন সুযোগ আসে, অর্থাৎ বিনয় কিম্বা বিনয়ের পত্র আসে; তখন আশৈশবের অভ্যাসবশতঃ উর্ম্মিলার মনোবীণার তারে তাহার কিছুই বেসুরা বাজে না। বরং যদি কিছু উহার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তা সেও তো উর্ম্মিলা বারম্বার কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছে, আরে ছিঃ!—সে আবার কেমন হইবে? যদি বিনয় তার চিঠিতে "উমি হনুমানি!"—না লিখিয়া যেমন—"খোঁপার ফুলের" বর লক্ষ্মীবাবু তার চিঠিতে লেখে, তেম্‌নি করিয়া লেখে, "প্রিয়তমা উর্ম্মিলা!" রাম বল! তার চাইতে বই পড়িলেই তো চুকিয়া যায়! আচ্ছা, সেদিন দত্ত-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া সে যে আড়ি পাতিয়া তার মিতিনের বরের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিয়াছে, বর বলিতেছে—'আমি তোমায় যত ভালবাসি তুমি কি তার অর্দ্ধেকও বাস্‌তে পার্‌বে?' আর বউ জবাব দিল, 'আমার অর্দ্ধেক তুমি বাসো কিনা সন্দেহ!'—শুনিয়াই তো উর্ম্মিলার আক্কেল গুড়ুম! না বাবু,—বিনয়ের সঙ্গে কোন জন্মেও এই সব ভালবাসা-বাসির কথা সে তো তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও কহিতে পারিবে না। ওরে বাবা, ও আবার কিরে বাপু?—তথাপি মনের মধ্যে যৌবনের দক্ষিণা-বাতাস শীতের কোয়াসা কাটাইয়া দিয়া বহিতে থাকে, হাজার ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া উঠে; এবং মন একা একা নিরালম্ব হইয়া কাঁদিতে থাকে। চিরপরিচিত জীবনের সমস্ত স্বাদই তিক্ত ও বিরস হইয়া যায়।

তাই আজ শাশুড়ির কাছে খোঁচা খাইয়া ঊর্ম্মিলার নারীত্বের নবোন্মেষে অর্দ্ধ-বিকসিত চিত্ত যেন নিজেকে ফুটাইবার জন্ম খুঁজিয়া পাইল বলিয়া অনুভব করিল। বিনয় আসিবার পূর্ব্বে সে যে সব গড়িয়া সাজাইয়া রাখে; সে আসিলেই সবখানি তার উল্টাইয়া যায়। চিরাভ্যস্ত রীতিতে জগদ্ধাত্রীর ভাষায় 'পিঠোপিটির' মতই তখন তাহাদের মধ্যে খুঁটিনাটী ঝগড়া কলরবের কাকলী জাগিয়া উঠে ও তারপর বিনয় চলিয়া গেলে, কিছুদিন মনের সঙ্গে সুখও তাহার বেজায় অন্ধকার হইয়া থাকে। এই চিরন্তনীর আর কিছু বড় তফাৎ পড়ে না। তা এবারটায় জগদ্ধাত্রী যখন সময় থাকিতেই চেতাইয়া দিলেন, তখন মানসিক সঙ্কোচের উপর খুব কড়ারকম চোক রাঙ্গাইয়া দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঊর্ম্মিলা-সুন্দরী আয়না পাড়িয়া সেই নীলমাথা-হাতেই চুল বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বিনয় বাড়ী আসিলে, তার সঙ্গে বেরাল-ছানা ধরিতে লাফাইয়া বেড়ানর ব্যস্ততায় উক্ত কার্য্যটী প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু আর সে সব ছ্যাব্‌লামীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না,—তাহাকে জোর করিয়া লাগিতে হইবে।

প্রথমে যথারীতিতে সে নিয়মমত চুল আঁচড়াইয়া লইয়া সাদাসিদা খোঁপা বাঁধিল, তারপর আরসী দেখিয়া মায়ের সাজসজ্জা করার কথা স্মরণে আসিতেই দাঁতে জিব্‌ কাটিয়া টান দিয়া খোঁপা খুলিল এবং গন্ধতেল, ভিজা গামছা, গ্লান মোম ইত্যাদি জোগাড় করিয়া আনিয়া খুব ঘটা লাগাইয়া দিল।

বিনয় বাড়ী থাকিলে নিজের সেই ঘরখানিতেই শয়ন করিত। তাহার অবিদ্যমানে এ ঘর চাবি-বন্ধ থাকিত। ঊর্ম্মিলা বড় একটা এ ঘরখানায় ঢুকিত না, এর দুইটা কারণ ছিল।—এক তো বিনয়ের শত স্মৃতিপূর্ণ তাহারই গৃহ, ঊর্ম্মিলার চোখের জলের উৎসকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে বড়ই ওজর করিত। আর তা' ভিন্ন এই সর্ব্বনেশে ঘর-খানার মধ্যে পা ঢুকাইতে গেলেই ঊর্ম্মিলার বুকে ঢেঁকির ঘা মারিয়া বহুদিনের পুরাতন সেই একটী অবিস্মৃত শব্দ আজও তাহার মনের কানে হাঁকিয়া উঠে—বাধা দেয়—"খবরদার, ঘরে ঢুকেছ কি, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি!—স্পাইকে আমার ঘরে ঢুকতে দিই নে।"

আজ সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাধাটাকেও মনের জোরে একপাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ঊর্ম্মিলা একটা পানের ডিবা হাতে করিয়া নিশীথ অভিসারে তাহারই স্বামী-গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় তখন সেই ঘরের সেই টেবিলটার ধারে একখানা চৌকিতে বসিয়া হাতের উপর কপাল রাখিয়া কি যেন একটা কঠিন বিষয়েরই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। ল্যাবেণ্ডারের খর-গন্ধ বা অনেকগুলি ঝুরো-চুড়ির ঝিলি-মিলি তার ধ্যানের বর্ম্মে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।—তা' যাক্, ঊর্ম্মিলা ইহাতে দুঃখিতা হইল না। প্রবেশ-পথেই যদি বিনয় তাহার কুসুমী-রংয়ের ছোপান শাড়ীর, তাহার ললাট-সজ্জিত কেশের রচনা, তাহার লজ্জার রক্তিমায় স্বতঃই রঞ্জিত গণ্ডের উপরকার রচনা করা গোলাপী আভা, তাহার কানে গলায় হাতে আটপৌরের বদলে পোষাকী, নূতন অলঙ্কারের সমাবেশ, তাহার উপর হাতে জাটা-তাবিজের বদলে কারফোরের অনন্ত, এই সমস্তই যদি এক নিমেষে দেখিয়া লইয়া উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া বসিত, তাহা হইলে—নিশ্চয়ই তাহা হইলে ঊর্ম্মিলাকে সেই যেদিন তাহাকে 'স্পাই' বলিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, সেই দিনেরই মত প্রায় তত বড়ই লজ্জার আঘাত দিয়া তাহার

গৃহপ্রবেশ রুদ্ধ করা হইয়া যাইত। মনের এ রকম বিপন্ন তুর্ব্বলতার মধ্যে সে যে সেই তীব্র উপহাসের বানবৃষ্টি সহ্য করিয়া নিজের সত্ত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইবার লড়াই চালাইতে পারিত, তা, বোধ হয় না। প্রথম ধাক্কায় বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইতে পাওয়ায় সে অনেক-খানি লজ্জা জ্বালার হাত এড়াইতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল ও এই সুযোগটাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার এতক্ষণকার সকল সঙ্কল্পই প্রায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া বসিল। সে যে সেই অবধি অনেক ভাঙ্গাগড়া করিতে করিতে স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিল যে, আজ সে ঘরে ঢুকিয়াই তাহার নিজের স্থান জোর করিয়া দখল করিবে, কেমন করিয়া? তা' সে অত কি আর সবার সঙ্গেই বসিয়া বসিয়া হিসাব-নিকাশ করা যায়? লজ্জা করে যে! সময়মত প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হিসাব মতন ঘটিল না। বিনা-বাধায় ঘরে ঢুকিতে পাইয়াই তাহার চিরদিনের কৌতুক-বৃত্তি তাহাকে জোর করিয়া ধরিল। তখন নিঃশব্দ-পদে পিছনে আসিয়া সে তুই হাতে বিনয়ের চোক চাপিয়া ধরিল।

বিনয় আকস্মিক চিন্তা-ভঙ্গে প্রথমে একটুখানি চমকিয়া উঠিয়াছিল, তারপরই হাত বাড়াইয়া উহার হাত তুইটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—"পেঁচোর মা!" হাত সরিল না,—"বিশে মালি!" হাত সরিল না দেখিয়া, তখন যেন বিশেষ চিন্তিতভাবে কহিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, তা' হলে হরে ধোপার বউ—না তো গয়লানী ধানির মা!"—

"যাঃও!"—বলিয়া সতর্জ্জনে উর্ম্মিলা তাহার করাবরণ উন্মোচন করিয়া লইয়া মুখখানা হাঁড়ির মতন করিয়া ছোট নথটা ঘুরাইয়া বলিল, "আমার হাত বুঝি বিশে মালির হাতের মতন শক্ত? না হরে ধোপানির মতন মোটা? না পেঁচোর মায়ের মতন শুক্‌নো?"

বিনয় তদুত্তরে শুধুই বলিল, "ওঃ, তুমি!"

উর্ম্মিলা তখন পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সবই ভুলিয়া গিয়াছে। বিনয়ের জবাবে সে রীতিমত চটিয়া উঠিয়াই তাহাকে আক্রমণের ভাবে কহিল, "হ্যা, তা' বই কি, নিশ্চয়ই তুমি বুঝ্‌তে পেরেছিলে। আমায় জ্বালাবার জন্তে শুধু ওই সব বল্‌তে লাগ্‌লে, কেন বলো দেখি, তুমি আমায় অমন যা' তা' বলো?"

বিনয় না হাসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল, "বাস রে! তোমায় নাকি আমি যা' তা' বল্‌তে পারি! তুমি হচ্চো মহারাণী 'ক্লিওপেট্রা'।"

উর্ম্মিলা বন্ধ করা পানের ডিপেটা স্বামীর গায়ের উপর ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। "যাঃও! তুমি কি যে ওসব বলো! পেঁটরা টেঁঠ্‌রা আমি হতে চাইনে!"

বিনয়কে সেই কাঁসার ডিবাটা যে আঘাতটুকু দিয়াছিল, সেটুকুকে সে তুচ্ছ করিয়া ডিবা হইতে ছড়াইয়া পড়া পান কয়টা কুড়াইয়া তাহারই তু'একটা মুখে পুরিতে পুরিতে মুখ তুলিয়া উর্ম্মিলার অভিমানী মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "থ্যাঙ্ক ইউ?—হার্ হাইনেস আজ যে বড় দাতা হয়েছেন, দেখ্‌তে পাই!"—এই বলিয়া পুনশ্চ পান কুড়াইতে মনোনিবেশ করিল।

পানগুলার স্বকৃত তুরবস্থা দেখিয়া উর্ম্মিলার আবার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। এই পান সাজিয়া আনার একটুখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তার সই কাঞ্চনের মুখে সে শুনিয়াছিল, সে যখন রাত্রে ঘরে শুইতে যায়, একটা ডিবা সাজা পান সে হাতে করিয়া লইয়া যায়। পানগুলি সে প্রাণ ঢালিয়া সযত্নে বিবিধ উপাদানে সাজিয়া লুকাইয়া রাখে। একসঙ্গে বসিয়া তু-জনে সেগুলি পরম পরিতোষে

তাহারা ঐগুলি গল্প করিতে করিতে উপভোগ করে। কাঞ্চনের বর বলিয়াছেন, যতগুলি পান সে আনিতে পারিবে, ততগুলি নূতন নূতন গল্প তিনি তাহাকে শুনাইবেন। তা' সেই প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ এক এক রাত্রে তাহাদের তিন-চার ঘণ্টাও জাগিয়া গল্প শুনাশুনি করিতে হয়।—আজ উর্ম্মিলারও ইচ্ছা ছিল এই সযত্ন-সজ্জিত পানের খিলি সেও তার স্বামীর মুখে নিজের হাতে তুলিয়া দিবে, পরিবর্ত্তে সখীর যেটা লভ্য হয়; হয়ত—কে জানে—একই ব্যবসায়ে লাভ লোক্‌সান কি এক রকমেরই হয় না?—কল্পনাকুসুমের এই পরিণাম লক্ষ্যে তাহার বুক ঠেলিয়া একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল।

বিনয় পানগুলা জড় করিয়া যে কয়টা মুখের মধ্যে আঁটিল, মুখেই ভরিয়া দিল, তারপর বাকিগুলা অঞ্জলী ভরিয়া উর্ম্মিলার সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এই নাও, নাও, আর রাগ কর্‌তে হবে না, বেশী খাই নি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, না হ'লে আরও গোটাকতক খেতুম।"

উর্ম্মিলাকে বাক্য-বিমুখ ও নতমুখী দেখিয়া তাহাকে ক্রুদ্ধ বুঝিয়া পান কয়টা ডিবায় ভরিয়া রাখিয়া দিল ও তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার মৎলবে যোড়হস্তে সুর করিয়া আরম্ভ করিল "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্রোধরূপেণ সংস্থিতা—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা—দেবী—"

যাঃ ও! তুমি আমায় কেবল জ্বালাতন কর্‌বে, আমি এক্ষুণি চলে যাচ্চি—"

বিনয় অত্যন্ত কোমল ও আগ্রহের স্বরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"চলে যাচ্চিস্! আহা, তা' হলে আমি এক্ষুণি ঘুমিয়ে বাঁচবো রে! কাল সারা রাত জেগে এসেছি। আজ সারা দুপর গোমস্তার সঙ্গে বসে হিসাবপত্তর করা গেছে। ঘুমটি যা এসেছে—সে কি আর বল্‌বো তোকে।"

উর্ম্মিলার পদতল হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত লজ্জায় যেন শিহরিয়া উঠিল।—ছি ছি, কি ঘৃণা! পুরুষের চিত্তে যেখানে এত বড় বিকাররাহিত্য;—নারী কিনা সে ক্ষেত্রে একেবারেই নির্লজ্জা উপযাচিকা! সে একটী কথাও আর না কহিয়া নিঃশব্দে পিছন ফিরিল।

বিনয় বলিয়া উঠিল—"রাক্ষুসি! আমার মশারি ফেলা হয়নি, তুই ফেলে দিবি, না—"

কথা শেষ না হইতেই উর্ম্মিলা ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিবার উদ্যোগ করিল এবং যথাকার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বিনয়কুমার একবার ঈষৎ বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নত নেত্রের দুই কোণ ছাপাইয়া যে অশ্রু নির্ঝর ঝরো ঝরো হইয়া আসিতেছিল সে তাহাদের দেখা পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুপুরবেলা রোগা বাপকে ঘুমাইতে দিয়া কৃষ্ণা তাঁহার বসিবার পূর্ব্বতন ঘরটাকে একটু আধটু গুছাইয়া রাখিতেছিল, এমন সময় একটা ভারী জুতা পায়ের চলনের আওয়াজ তাহার কানে ঢুকিল এবং শব্দটা শ্রুত মাত্রেই তাহার অধিকারীকে সে চিনিতে পারিল।

"ফুকন্! মিস্ সাব কিধার্ হ্যায়!"—এই জিজ্ঞাসার পরক্ষণেই ফুকনের কণ্ঠ হইতে "হুজুর!" —এইটুকুমাত্র শোনা গেল এবং তাহার অশ্রুত বাকী সংবাদটা কানে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই ঘরের মধ্য হইতে ডাকিয়া কৃষ্ণা আদেশ দিল, "ফুকন্! একঠো ঝাড়ন লে'আও!"

"ওঃ, তুমি এখানে? কি কর্‌চো?" বলিতে বলিতে পর্দ্দা সরাইয়া মিঃ লাহা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ে যেন বেত্রাহতের মতই চম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! এ আবার কি নূতন সখ হয়েছে! ছি ছি ছি; একটা নোংরা মোটা শাড়ী পরে, নিজের হাতে নোংরা কাজগুলো কেন কর্‌তে এসেছ! চলে এসো, চলে এসো—ধূলো লেগে সর্দ্দি হবে যে।"

কৃষ্ণা নিজের কোমরে-জড়ান তাঁতে-বোনা মোটা ও কোরা শাড়ীর আঁচল খুলিয়া গায়ে টানিয়া দিল, তারপর যথা-কার্য্যে রত থাকিয়া নতমুখেই জবাব দিল, "বাবার ঘরটা বড্ড অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, একটু ঝেড়ে ঝুড়ে রাখি। ফুকন্! ঝাড়ন হাম্‌কো দেও, তোম্ দোস্‌রা কাম্ পর যাও।—"

মিঃ লাহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "আহা-হা, ওর হাতে ধূলো ঝাড়্‌বার ভারটাই নয় দিয়ে দাও না। কি এমন কঠিন কাজ যে ওদের সাধ্যে কম পড়্‌বে।"

ফুকন্ দোটানায় পড়িয়া হতবুদ্ধভাবে মুনিব-কন্যার কাছে হাত পাতিতেই ধমক্ পাইল,— "নেহি, নেহি, তোম্ চলা যাও।"

নিরুত্তরে সে প্রস্থান দিল।

মিঃ লাহা মুখখানা খুব ভার করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন এবং সেই বৈঠকখানা-ঘরের একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া নিজের সিগারকেস্‌টা বাহির করিয়া একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া এক-মনেই টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তারপর যখন দেখা গেল, সেই মোটা সিগারটার অর্দ্ধেকখান ছাই হইয়া গেলেও পাশের ঘরের লোকটীর সাড়াটুকুও পাওয়া গেল না, তখন অগত্যাই আবার মর্য্যাদা খোয়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকেই উঠিয়া উহার দ্বারস্থ হইতে হইল।

"কি! 'আজ' ধূলোই খাওয়াবে, না, এক পেয়ালা চা' টাও পাবো?" ঘরের ভিতর হইতে কৃষ্ণার কর্ম্ম-ব্যস্ত-কণ্ঠ জবাব দিল, "চা' খাবেন? আচ্ছা,—ফুকন্! ওরে অ-ফুকন্! সাহেবকো আস্তে দু-কাপ্ চা বনায় দেও"।—ফুকন্ ছুটিয়া আসিতে আসিতে "জী!" বলিয়া জবাব দিল, ও হুকুমটা সব শোনা শেষ হইয়া গেলে, দৌড়াদৌড়ি আবার হুকুম তামিল করিতে ফিরিল। কৃষ্ণার ঝাড়াঝুড়ি শেষ হইয়াছিল, সে বই ও ডাক্তারি-যন্ত্র-পাতি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া আহত-গর্ব্ব তরুণচন্দ্র ক্রোধ-প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বলি, বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এলে তাকে লোকে একবার এস বোসও তো বলে। ঐ আবর্জ্জনাগুলোর চেয়েও কি এক দিনের ভেতরে আমি তোমার বেশী অ-দরকারী হয়ে পড়েছি?"

কৃষ্ণার এ ঘরের কাজ শেষ হইয়াছিল, তা' কোন ছলেই আর অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, তথাপি সে সেই সাজান জিনিষগুলাকেই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, "আপনি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে এসে থাকেন তো বলি; তার কোনই দরকার নেই। আমার সময়ও কম।"

তরুণের মুখ ক্রোধের রক্তে আরক্ত হইয়া উঠিল। আধ-পোড়া সিগারে জোরে জোরে দুইটা টান দিয়া তারপর সেটা দু-আঙুলে ধরিয়া রাখিয়া তিনি গরম সুরেই বলিয়া ফেলিলেন, "তা আমি জানি যে আমার কথাকে এখন তোমার ঝগড়া বলেই মনে হয়, আর আমার কোন কথা শোন্‌বারও

সময়ের তোমার এখন অভাব ঘটে থাকে, আমি সেই কথাটাই আজ শুন্‌তে চাই যে, এ রকম হয় কেন?"

মিঃ লাহার কথার ভাবে ও ভাষায় নিজেকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণা স্প্রীংয়ের মত ছিট্‌কাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, স্বচ্ছবর্ণ ভেদ করিয়া তপ্ত রক্তের গূঢ় আভায় তাহার কপাল পর্য্যন্ত রাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল, সতেজ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"মিঃ লাহা!"

কিছুমাত্র দমিয়া না গিয়া মিঃ লাহা চুরুটটায় একবার টান দিলেন, "রাগ কর্‌লে কি কর্‌বো বেবি! তুমি দিনকের দিন কি রকম কাণ্ডটি বাধাচ্চো বল দেখি? শুধুশুধুই সেদিন দরবারের নেমন্তন্ন ব্যাপারে যতদূর নয় ততদূর অপ্রতিভ আর অপদস্থ তো আমায় কর্‌লেই, তারপর সেইদিন থেকে কি ভূতই যে তোমার ঘাড়ে ভর করেছে,—গড়া পর্‌চো, ঝাঁটা ধর্‌চো, কোথায় না কোথায় হাঁসপাতালে রুগী ঘেঁটে, ছোট লোকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মধ্যে তাঁত-চরকার বক্তৃতা দিয়ে ঐ সব বিলি করে,—আবার নাকি বাড়ীতেই পাড়ার যত হাড়ি-মুচি ক্যাওরার পাঠশালাও খুলে দিচ্চো শুন্‌চি!—এ সব তোমার হলো কি শুনি?"

সেই রাঙ্গা-মুখেই চাপা-বিরক্তিতে কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর একটুখানি ঔদাস্যের হাসি হাসিয়া কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল,

"ব্যস! হয়ে গেল তো?"

লাহা হতাশভাবে দরজার গায়ে হেলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারলুম না!"

মৃদু হাসিয়া ও দ্বারের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কৃষ্ণা কহিল,—

"বেশ, হার মেনে নিলেন তো? তা হলে চলুন এখন চ' খাবেন।"

পথ ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি আশ্বস্ত এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত ঈষৎ অভিমানপূর্ণ-কণ্ঠে তরুণ কহিলেন, "এতক্ষণে হতভাগাটার প্রতি অনুগ্রহ হলো, তা হলে? সেই যে কোন্ ভোরে ট্রেণে চেপেচি, তা খেয়ে এসেছি কি উপোস্ করেই আছি, সে সব খবর একবার জান্‌বার দরকারও তোমার মনে হয় না আর, না?"

কৃষ্ণা চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিষম অপ্রতিভ ও লজ্জা মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মাপ কর্‌বেন! এত বেলায় না খেয়ে এসেছেন, তা' আমার একবারও সত্যি বল্‌চি মনে হয়নি। আচ্ছা, এক্ষুণি আমি খাবার আন্‌চি।"—

"মনে তোমার পড়্‌বে কি করে? মন কি আর মনে আছে!"

কৃষ্ণা বলিল, "তা' সত্যি! অনেক রকম ভাবনায় পড়েছি।"

ফস্ করিয়া মিঃ লাহা বলিয়া ফেলিলেন, "আর দু'এক রকম আমিও বুঝ্‌তে পার্‌চি কিষণ! তাদের কাছে আমার ভাবনাই দেখ্‌ছি নেহাৎ পুরণো হয়ে দাঁড়িয়েছে!"

অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কঠিন কিছু বলিতে গিয়াই অকস্মাৎ কৃষ্ণা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। তাহার মনে পড়িল, এ ব্যক্তিকে সে ও তাহার বাপ অনেকদিন ধরিয়াই এরূপ স্পর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দিয়াছে, ইহা ছাড়াইতেও সময় খরচ করিতে হইবে বিস্তর। কিছু না বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

[library stamp]

নবম পরিচ্ছেদ

চাঁদের আলোয় সন্ধ্যাটা যেন আশ্চর্য্য সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের বাগানে পাখীদের সম্মিলিত-কণ্ঠে বসন্তের বন্দনা-গান উঠিয়া যেন দিকে দিকে নব-বসন্তের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস জ্যোৎস্না-ধারায় স্নান করান, হাজার ফুলে আলো করা গাছের গায়ে পুলক-আবেগে কাঁপন তুলিতেছে। ঘরের মধ্যের সব দিকের জানালা খোলা পর্দা সরানো, বিদ্যুতের আলো বন্ধ করা, শুধু সেই বসন্ত-জ্যোৎস্নার সুধা-ধবলির অপরূপ আলোর ধারায় ঘর স্নাত ও আলোকিত। কিন্তু এ সকলেই অনভিজ্ঞ থাকিয়া ডাক্তার সাহেব সম্মুখে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া যেন কাহার স্পর্শ খুঁজিতে চাহিয়া ডাকিলেন, "বেবি!"

"বাবা!" বলিয়া জবাব দিয়া কৃষ্ণা পাশের ঘর হইতে ত্বরিৎ-গতিতে ছুটিয়া আসিল।

"তরুণ এ'-কদিন কেন এলো না বল্ দেখি, বেবি? তার তো এখনও ছুটী থাক্‌বার কথা না? বলেছিল যে চা'রদিন ছুটী।"

কৃষ্ণা বোধ করি, কিছু সেলাই করিতে করিতে চলিয়া আসিয়াছিল; তার আঙ্গুলে একটা হাতীর দাঁতের 'অঙ্গুলী-রক্ষক' পরান ছিল, সেইটা খুলিয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে বাপের কেশ-বিরল মস্তকের সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাবে সে জবাব দিল, "বোধ করি কোন খবর পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছে।"

"তা' হলেও তার আমাদের একটা খবর দিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল তো! জানে ত' যে আমরা দুজনেই কি দিনটিতেই তার আসার পথ চেয়ে বসে থাক্‌বো! দেখ মা! তুমি কাল ভোরেই তাকে একটা আর্জেণ্ট তার করে দাও। হ্যাঁ, আর 'রিপ্লাই-প্রিপেড' দিও। তা' হলেই সে ঠিক করে আমাদের ভাবনাটাও বুঝ্‌তে পার্‌বে, আর নিজের ভুলের দরুণ লজ্জাও পাবে যথেষ্ট।"

অন্ধ পিতার চোখের অন্ধকার তাঁহার মেয়ের মুখের বিপন্ন ভাব জানিতেও পারিল না। তাহার নীরবতাটাকে লজ্জারূপে ভুল করিয়াই পুনশ্চ জোর দিয়া দিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"শোন মা! তুমি এতে কিছু লজ্জাবোধ করো না। একদিন না একদিন সে তোমার স্বামী হবেই, তাকে দু'দিন আগে থেকে একটু যদি তুমি যত্ন দেখাও, তা'তে লজ্জার কি আছে, আমি তো ভেবে পাইনে!—আর দেখ, ওকে যত্ন জানাবার নেইও কেউ। তুমি যদি না কর্‌বে, তা' হলে কর্‌বেই বা কে? মানুষ একটা কারুকে আপনার না করতে পেলে কি থাক্‌তে পারে? আমার যেমন কপাল! তা' না হলে আমিই কেন করি না? তা' আমারই তো এখন হাতটি তুমি না ধর্‌লে একটি পা'ও নড়্‌তে পারিনে, তার আমি আর কার জন্যে কি কর্‌বো বলো? তা' দেখ্ মা কিষণ! খরচের টাকার জন্যে তো তা'হলে একটু মুস্কিলে পড়্‌তে হবে? শিবপুরের পৈত্রিক বাড়ীখানা বেচে যে টাকাটা পাওয়া গেছ্‌লো' তা'তে হাজারীমল ধোলামলেদের সুদের আট হাজার গিয়ে বাকী হাজার তিন থেকে এ তিনটে মাস তুমি তো খুব বাহাদুরী করেই চালালে, কিন্তু এখন তো—"

কৃষ্ণা ধীরভাবে বাপের কথাগুলি শুনিতেছিল, এখন তেমনি শান্ত-স্বরেই বাধা দিয়া বলিল, "তার জন্যে তুমি অত ভেবো না বাবা! সে আমি চালিয়ে নোব। বাজে খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছি, এবার থেকে মাসে এক হাজারেরও কম খরচে আমাদের চলে যাবে।"—

ডাক্তার মল্লিকের মুখখানা ভয়ার্ত্তের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যেন তাঁহার 'পরে নিতান্তই অত্যাচারের উপক্রম হইতেছে, এম্‌নিভাবেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এক হাজার টাকার চাইতেও কম খরচে তুমি সংসার চালাবে! বল কি তুমি বেবি? তা' হলে দেখ্‌ছি না খাইয়ে তুমি আমাকেও মার্‌বে আর নিজেও মর্‌বে!"

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে একটি ফোঁটা দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল, "কেন, বাবা! এ ক'মাস কি আমি তোমায় খেতে দিইনি, না নিজেই উপোস্‌ করে আছি? অনেক বাজে খরচই তো আমাদের ছিল, সেইগুলো গেলেই খরচও ঢের সস্তা পড়বে, অথচ খেতেও কম পড়্‌বে না।"

এ সান্ত্বনায় বিখ্যাত বিলাসী ডাক্তার সাহেবের সন্তপ্ত-চিত্ত কিছুমাত্রও প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো-গলায় বলিতে লাগিলেন, "এ তিন মাসে যা' হাল আমার করেছ, সে আর বলে কাজ নেই বাবা! রোজ রোজই কি না মস্‌র্-গাড়ীখানা করে বেড়াতে নিয়ে যাবে, তারপর আমার সেবা কর্‌বার আটজন চাকরের বদলে কি না মোটে দুটি লোক করে দিলে।—"

"—কেন বাবা! তোমার সেই আটজন চাকরের হাতের সেবার চাইতে কি এখন তোমার কিছু অযত্ন হচ্চে?" মেয়ের কণ্ঠে ঈষৎ বেদনার ঝঙ্কার ছিল।

ডাক্তার নিজের অপছন্দ গোপন চেষ্টা না করিয়াই সোজা বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়া ফেলিলেন, "তা' হয় বই কি! তাদের আমি সর্ব্বদা ফাইফর্‌মাস্‌ কর্‌তে পার্‌তুম, তোমায় কি তাই পারি? রাত্রে শুধু পালা করে এক একজন থাকে, অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, কষ্ট আর হয় না। অত কেপ্পনি যে তুমি কি ভেবেই কর্‌চো, তা' যদি আমার বোঝ্‌বার কোন উপায় আছে!"

পিতার কথায় কৃষ্ণা মনের মধ্যে আঘাত পাইলেও তাঁহার অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহার জন্ম ব্যথিত ও তাঁহার অপছন্দ কাজ করিতে বাধ্য হওয়ায় লজ্জাও একটুখানি সে বোধ করিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া অবশেষে মৃদু-কণ্ঠে শুধু বলিল, "এ সব না কর্‌লে চালাবো কি দিয়ে বলো?"

যেন আকাশ হইতেই খসিয়া পড়িয়াছেন, এম্‌নিতর মুখের ভাবখানা করিয়া মিঃ মল্লিক কহিয়া উঠিলেন, "তাই বলে যে ভিকিরির মতন বেঁচে থাক্‌তে হবে, তারও তো কিছু মানে নেই। আমার তো এই হাল করেচ! নিজের যে কি হচ্চে, সে আমার চোখে দেখ্‌বার উপায় নেই, এই যা' একটু সুবিধে! ফ্রেঞ্চ গবর্ণেস্‌টাকে তো বিদায় করে দিয়েছ জানি, আয়াটারও তো কোনই সাড়া পাইনে। সেদিন দাই দাই করে কা'কে যে ডাক্‌ছিলে, তা'ও জানিনে। আমার তো আর চোখে দেখার কোন উপায়ই নেই। তোমারই একরকম মজা হয়েচে!" অন্ধ একটা গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, "শেষে কিনা আমার বাড়ীতে নোংরা একটা শাড়ী-পরা, গা-খোলা দাই ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো! আর আমি তোমার জন্তে দুটো ইউরোপীয়ান্‌ গবর্ণেস্‌ রেখেছিলুম।

বিদ্ধ-কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

কিন্তু বিরক্ত বৃদ্ধ সে ডাক আমলে আনিলেন না, মনের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এ বাপু তোমার বাড়াবাড়ি! কেন, চল্‌বার ভাবনা তোমার কেন? সে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমিই কেন ভাবি না? তারপর তুমি তরুণকে বিয়ে কর্‌লে তোমার আবার ভাবনাটা কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট্ থেকে সে ছুদিনে কমিশনার হয়ে যাবে, খাসা ছেলে সে। তা' ছাড়া ওদের জমিদারী আছে। মাসে ছু'তিন হাজার হিসেবে বোধ হয়, ওর অংশে নিট্ আয়। তুমি এই বয়েস থেকে অত হিসেবী হলে ওর মান-মর্য্যাদাই বা রাখ্‌বে কেমন করে? লোকে যে তোমায় ছোট-লোকের মেয়ে বলে ঘেন্না কর্‌বে। নাঃ, তোমার ওসব ছোট চালে চলা চল্‌বে না, বেবি! ম্যাডাম কামাকে তুমি আবার চিঠি লিখে আনিয়ে নাও। আর সকালবেলাই আগে উঠে ওই তারটা করে দেবে। কি লিখ্‌বে জান? ঠিক এই কথাগুলি লিখে দেবে—হোয়াই দিস্ সাইলেন্স? এক্সট্রিমলী অ্যাংসস্ রিপ্লাই সার্প—কম্ ইমিডিয়েট্‌লী ইফ্ পসিবল্ [চুপচাপ কিসের জন্য? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দিও, ও যদি সম্ভব হয় তো এসো]। কেমন, মনে থাক্‌বে তো? না হয় তো এইখানে বসেই লিখে নাও না কেন?"

অনেক দিনের রোগীর মুখ যেমন ক্লান্ত ও রক্তহীন হইয়া পড়ে, এই পরিপূর্ণ যৌবনের অটুট স্বাস্থ্য লইয়াও কৃষ্ণার সুন্দর তরুণ মুখটী ঠিক তেমনি করুণ দেখাইল। মনের যে ভাবটাকে সে তাহার এই অন্ধ বৃদ্ধ জীবন্মৃত পিতার সমক্ষে চাপিয়া রাখিবার জন্য ক্রমাগত কয় মাস ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছিল, সেটা যেন আর গোপন রাখা যায় না বলিয়াই তাহার মনে হইয়া তাহাকে একান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। মানসিক সংগ্রাম রুদ্ধ রাখিবার জন্য সে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, বাপের আদেশের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা কহিল না।

মিঃ মল্লিকের তখন আর এক প্রকার সন্দেহ হইল। তিনি ঈষৎ চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "বেবি! তুমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করোনি ত? না না, দেখ, সে সব কিছু গোলমাল করে বসো না যেন! দেখ মা! তরুণের মতন সুপাত্র সহজে কি খুঁজে মেলে? বিদ্বান্ সচ্চরিত্র, বড় চাকুরে, ধনী, আবার তোমা-অন্ত প্রাণটী তার! কেবল ঐ একটী দোষেই সব মাটি করে রেখেছে। সে হতভাগা মেয়েটা মরে যে কবে ওকে মুক্তি দেবে, তা কে জানে! তা না হলে তো যতদিন থেকে ওর সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা দিয়ে রাখা হয়েছে, বিয়ে হলে তো এতদিনে তোমাদের ছু-চারটি ছেলেপিলেও হতে পার্‌তো। তা দেখ, যদি কিছু মন-কষাকষি হয়েই থাকে তো তুমি স্ত্রীলোক, তোমারই মা আগে হতে নরম হওয়া দরকার। যাও, কাগজ-কলম এনে বেশ করে একখানি চার পাচ পাতার চিঠি লেখ। আর ঐ তারটুকু করে দাও, নিশ্চয়ই তার রাগ পড়ে যাবে। সে তেমন ছেলেই নয়।"

কৃষ্ণা তথাপি একটি কথাও কহিল না, নড়িল না, যেমন তেমনি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাতে হাতে বাঁধিয়া কাঠের পুতুলের মতন স্থির চোক মেলিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার উপরে যে দারুণ ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে সে কথা অনেক আগেই বুঝিয়াছিল এবং সে জন্য সে প্রস্তুতও আছে, কিন্তু এই অনন্যসহায় দুর্ব্বলচরিত্র, অক্ষম অন্ধ পিতা তাহার; তাহার অবাধ্যতা, তাহার বিদ্রোহ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন; ইহার অনিবার্য্য ফলে উদ্যতপ্রায় ভীষণ জীবন-সংগ্রামের কঠোর অংশ কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন; তাই ভাবিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া রহিল।

এদিকে ডাক্তার সাহেব তথাপিও কন্যার সম্মতি না পাইয়া এবার কিছু বিরক্ত কিছু বিপন্ন-ভাবে ঈষৎ করুণ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—"বেবি! বেবি! বোকামী করে সব নষ্ট করে ফেলিস্ নি। তোর যতই রূপ-গুণ, বিদ্যে-বুদ্ধি থাক্, তোর বাপের টাকা নেই। দেখ্‌ছিস্ না—কি যে, আমাদের

সমাজে ছেলেরা বড় অভিভাবক বা টাকা না পেলে বিয়েই করে না। ও তোকে ভালবাসে, ও আমাদের ঘরের খবর সবই জানে, এমন কি, আজ পর্য্যন্ত আমি ওর কাছে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকাও ধারি, এ রকম সময়ে তুমি যদি ওকে চটিয়ে দাও, কি রকমটা হবে বলো তো?"

কৃষ্ণাকে কে যেন চাবুক তুলিয়া সজোরে মারিল। এমন করিয়াই সে চম্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখ দিয়া বিলাপ-আর্ত্তনাদের মতন বাহিরে আসিল—"উঃ, কি করেছ! বাবা! —বাবা!—" বাহিরের চাঁদ ঊর্দ্ধে উঠিয়া উজ্জ্বলতর কিরণধারায় সারা বিশ্বের অঙ্গ আলোর পিচ্‌-কারীতে ভরাইয়া দিতেছিল। সেই রঙ্গ দেখিতে রঙ্গ-পাগল কাব্য-রসিক দশ জনকে ডাকাডাকি বাধাইয়া কোকিল পাপিয়ার তো গলা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই চাঁদের আলোয় ডুবিয়া গিয়াও কৃষ্ণার হঠাৎ মনে হইল, তাহার চারিদিকে কি নিবিড় কি দুশ্ছেদ্য কি বিপুল অন্ধকার! আর তাহাকে ইহারই মধ্যে এ জন্মের মত—হয়ত বা চিরজন্মজন্মান্তরের মতই ডুবিয়া থাকিতে হইবে। তার উদ্ধারের কোন আশাই যেন এই অসীম বিস্তৃত অন্ধকার-সাগরের তলদেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার সারা প্রাণ যেন কিসের একটা অজানিত মহাভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তার নূতন জাগরণ উষার সোনালী-আলো যেন বর্ষার ঘন মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন বাপের আদেশমত একখানা তার সে মিঃ লাহাকে পাঠাইল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আদেশানুযায়ী ঠিক ঠিক কথাগুলি লিখিতে সে কিছুতেই পারিল না। "বাবা তোমার সংবাদ চান,"—এই টুকুই সে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। উত্তরে ইহারই জবাব পাওয়া গেল,—"তাঁকে জানাইও আমি ভাল আছি।"—টেলিগ্রামখানা হাতে করিয়া আসিয়া সে বাপকে বলিল, "যশোর থেকে খবর এসেছে।"

"এসেছে!" বলিয়া বৃদ্ধ এম্‌নি বালকোচিত আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন যে, বোধ হইল, যেন তিনি তাঁর সব চেয়ে দামী হারানিধিটী আবার ফিরিয়া কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না হোক্ তবু দশবারও এই তারের জবাব আসার খবর তিনি উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে ডাকা-ডাকি বাধাইয়া লইয়াছেন ও প্রত্যেকটী বারেই জিজ্ঞাসার শেষে ব্যর্থতার নিরাশ্বাসে বুকটি তাঁহার আধহাত করিয়া করিয়া দমিয়া গিয়াছে। সে-দেখিয়া কৃষ্ণার মনের মধ্যে যে কি ঝড়ই বহিতেছিল, সে শুধু সেই জানে। একদিকে তাহার নবোন্মেষিত হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ নবজীবন। নূতন স্বপ্ন-লোক, নব-জাগরণ উষা, নবীন আশাপ্রবাহ,—তার আত্মগৌরব, আত্ম প্রতিষ্ঠা, তার উদ্বোধিত শক্তির একাগ্র সাধনা। আর অপর পক্ষে তাহার এই সুখবিলাসের অপর্য্যাপ্ত অপব্যয়ে নিঃস্ব ফতুর, অথচ চিরাভ্যস্ত সুখসাচ্ছন্দ্যের একবিন্দু ত্রুটী সহিতে একান্ত অসমর্থ ও অসহিষ্ণু অন্ধ পিতা! কোন্ পথ সে অবলম্বন করিবে, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিবে, ভাবিয়া সে যেন কোন কুলকিনারাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এতদিন সে যে নিজের আশৈশবের সকল অভ্যাসের শক্তি একটার পর একটা করিয়া দ্বিধাশূন্য সবল হস্তে কাটিয়া ফেলিয়া নিজেকে মুক্ত করিতেছিল। অর্থশূন্য ধনীগৃহের ধারকরা ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য কঠিন করে চূর্ণিত

আস্‌বাবের মত পথের ধূলার নিক্ষেপ করিয়া নিজের সুখলালিত ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত শরীর মনের উপর সে যে কৃচ্ছ্র সাধনের গৌরব-দীপ্তি অনুভব করিতেছিল এবং সেই গূঢ় তপস্যার বলে অনুপ্রাণিত হইতে হইতে ভবিষ্যতের বিষয়েও নিজের কর্ত্তব্যও সে যে কি বিশ্বস্ত-মনেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, গত রাত্রে পিতার একটী কথার ঘায়ে তাহার সেই সাজান বাগান এক ঝলক তপ্ত হাওয়ার স্পর্শের মতই এক নিমেষে শুকাইয়া দিয়া গিয়াছে। গত রাত্রি হইতে তাহার নূতন-গড়া জীবনের ছায়াচিত্র শূন্যে মিলাইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আবার সে পুরানো ছবিখানা ফোটো ফোটো হইয়া উঠিতেছিল, লজ্জায় ও ভয়ে কৃষ্ণা সেখানার দিকে আর ভাল করিয়া যেন চাহিয়া দেখিতেও সাহস করিতেছিল না। বারম্বার বুক খালি করিয়া করিয়া দীর্ঘশ্বাসগুলা উঠিয়া আসিয়া এই কথাই তাহার কানে কানে বলিয়া যাইতেছিল, যে, যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা আর কখনই জোড়া লাগিবে না। এতদিন যে নিজেকে না বুঝিয়াই তাহার সহিত নিজের জীবনটাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সে এক রকম স্বপ্নের ঘোরের মত ভুলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এখন, যখন সে তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছে, তখন আর কেমন করিয়া সে একটা লজ্জাস্কর ভ্রমের পশ্চাতে, একটা হীনতাপূর্ণ অগৌরবের অন্তর্ভাগে ধরিয়া রাখিয়া নিজের সমস্ত নারীমহিমাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দিবে? আর তো সে তা পারে না। সে যে আজ বড় স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এতদিন যে মায়ার রঙ্গিন নেশায় তাহার অভিভাবকের হুকুমে তাহার ভবিষ্যৎকে সে সাজাইয়া রম্য করিয়া দেখাইয়াছিল, এখন তাহার পক্ষে শুধুই সেটা মরু-মরিচীকার মত স্বপ্নমাত্রই নয়; তেমনি শুষ্ক ও কঠোরও বটে। তরুণচন্দ্র আজ দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া তাহার কনকু হয়ে যে প্রেমের বন্দনা গান প্রতিনিয়ত শুনাইতে শুনাইতে তাহার চপল কিশোর চিত্তকে তাহারই অভিমুখে টানিয়া লইতেছিল, অকস্মাৎ একটি দিনের সামান্য একটুখানি পরীক্ষায় সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া জানিতে পারিল যে, সে আকর্ষণটা মোটেই তাহার অন্তরস্পর্শী হইতে পারে নাই। জলে-ভাসা পানার মতই সে শুধু উপরে উপরেই ভাসিয়া বেড়ায়, মূল যে তাহার কি রকম আল্‌গা, সেই বুঝিয়া মনের মধ্যে সে অত্যন্তই ভীত হইল। তারপর আর একটা ব্যাপার ঘটিল। এতদিন সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ও অত্যধিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে; যে সমাজে আহার-বিহার আচার ও ব্যবহার সমস্তই জাগতীক সম্পদেরই বাহ্য-আড়ম্বরের মধ্যবর্ত্তী; সেই আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় নরনারীর সাহচর্য্যেই তাহার জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সেখানে বসিয়া তাই মিঃ লাহাকে কোন দিনই তাহার বিসদৃশ ঠেকে নাই। যে সমাজের অধিকাংশ মেয়েরাই বিলাত-ফেরত, বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বামী পাওয়াকে নারী-জীবনের চরম প্রাপ্তি বোধ করিয়া থাকেন; সেখানে বসিয়া অন্যের ঈর্ষার চক্ষে নিজের ভবিষ্য সৌভাগ্যকে সেও খুব বড় করিয়াই দেখিয়াছিল। তার উপর তরুণের ঘরে টাকা আছে, বুনিয়াদী বড় ঘরের বধূ হইতে এ সমাজের মেয়েদের দু-একটা সুযোগের খাতিরে লোভটা বিলক্ষণই থাকে, কৃষ্ণারও ছিল। অর্থ-সচ্ছলতা এবং সেকালের সেই সব দুর্লভ হীরা-মতি একালে যা হাজার হাজার টাকা দিলেও সহজে মিলে না, বনেদী-ঘরে পড়িলে সেইগুলা পরিয়া মেয়েমানুষ হওয়াটা সফল করিয়া লওয়া যায়।—কাজেই বহুতর বৃদ্ধ বঙ্গসমাজের অনূঢ়া কন্যার প্রার্থিত বর তরুণচন্দ্রকে এতদিন মিস্ মল্লিকের মনে না ধরিবার বড় একটা কারণও দেখা যায় না। আর যে মস্তবড় বাধাটা তাহাদের মিলনপথের প্রহরী

হইয়া মাঝখানে লাঠি তুলিয়া খাড়া হইয়াছিল, সেই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানটার জন্যই বোধ করি কৃষ্ণার ঐ পাত্রটিকে তাহার সকল পাণিপ্রার্থীর চাইতে বেশী পছন্দ হইয়াছিল। বাহির হইতে ইহার সহিত একটা ভবিষ্য সম্বন্ধর আভাসে উভয়পক্ষই নিশ্চিন্ত রহিল, অথচ ভিতর হইতে কাহারও সহিত কোন দাবীদাওয়া রহিল না, স্বাধীন-সত্বার বিলোপ ঘটিল না। এই বা এক রকম মন্দ কি?—

কিন্তু মন্দ যে কি, সে অদূর ভবিষ্যতেই একদিন প্রমাণ হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনাজালে জড়িত কৃষ্ণার নব-জাগ্রত মন নিঃসন্দেহেই অনুভব করিয়া বসিল যে, সে তরুণচন্দ্রকে ভালবাসে না, এবং এমন কি, কোনও দিনেও বাসিতে পারা অসম্ভব!—মাথার উপরে তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি নিয়তি-পরিচালিতের মতই নিজের মনের সে অদম্য উচ্ছ্বাসকে সে কোন মতেই প্রতিরোধ করিয়া উঠিতে পারিল না, ভাবের উচ্ছ্বাসে কঠোর বাস্তবকে সে আশ্রয় করিতে না পারিয়া যে অমৃতস্পর্শে 'নবজাত' হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অমৃত-স্রোতেই নিজেকে ভাসাইয়া দিল। নিজের সমস্তকে সে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িল এবং দেখিল, তার মধ্যে আর তার সে পরিত্যক্ত পুরাতনের কিছুই আর খাপ খায় না।

ডাক্তার মল্লিক ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কি লিখেছে রে তরুণ? কি তার করেছে পড়্‌তো শুনি?" সংক্ষিপ্ত বার্ত্তাটুকু শোনা হইয়া গেলে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া উঠিলেন, "এ' কি হলো! এ' কি রকম হলো! তুমি তা'কে আস্‌বার কথা লিখ্‌লে, আর সে যে তার জবাবটি পর্য্যন্ত এড়িয়ে গেল, এটি তো ভাল লক্ষণ বোধ হচ্চে না বেবি!"

কৃষ্ণা ডাক্তার-সাহেবের সহিত লক্ষণের ভাল-মন্দ লইয়া কোনই উত্তর-প্রত্যুত্তর না করিয়াই চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়াইয়া থাকিল। জানিত, তর্কাতর্কি করিতে যাওয়া বৃথা। তা' ভিন্ন সে বাধ্য হইয়া নিজের বাপকেই ছলনা করিতেছে—এটা তাহার সারাচিত্তকে একান্তই পীড়িত করিতেছিল, এই বেদনার স্থানকে নাড়া-চাড়া করিতে তাই তাহার ব্যথিত অন্তরও সায় দিল না।

মেয়েকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া এদিকে কিন্তু মেয়ের বাপের মনের সন্দেহ ও তদনুসঙ্গীক বিরক্তিটাও প্রবলতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাঁহার অন্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধিনীর অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া তীক্ষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কি যে তুই কাণ্ডটি করে বস্‌লি বেবি! তার আমি যদি কিছুটি বুঝ্‌তে পার্‌চি! তা' না হলে সেই ছেলে, তোমার নাম কর্‌তে যার গলার স্বর কেঁপে ওঠে,—সে কি না তুমি আস্‌বার কথাটি লিখ্‌তেও তার জবাব দিলে না! নাঃ, তুই আমার ভাবালি বেবি! কোথায় ভেবেছিলুম, বাকী দিনক'টা একটু নিশ্চিন্ত হবো। তা' নয়, নিজের তো আমার এই দশা হলো, আবার এর উপর আমায় আইবড় এক ধেড়ে মেয়ের জন্য রাত্রি-দিনই বসে বসে ভাব্‌তে হবে। নাঃ, অস্থির করেছে দেখ্‌ছি!"

কৃষ্ণা পাথরের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বাপের এতটুকু কথা কখনও তাহার সহিত না, আজ এতবড় লাঞ্ছনাটাও সে নিঃশব্দে হজম করিয়া লইল।

মল্লিক-সাহেবের বিরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি উত্তেজিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "বেবি! শুন্‌তে পাচ্চিস্ আমার কথা! এক্ষুণি তুই আর একখানা তার শীগ্‌গির করে দে' দেখি। এতে লেখ্‌—"এক্সট্রিমলী রিপেন্‌টেন্ট্‌ ফর্‌গিভ্‌, এণ্ড কম্‌ অ্যাজ্‌ সার্প অ্যাজ্‌

পসিবল্।" [নিরতিশয় অনুতাপিত হইয়াছি, ক্ষমা করিয়া যত সত্বর আসা সম্ভব আসিবে]। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরও একটুখানি এই রকম যোগ করে দিলে মন্দ হয় না—"

বাস্তবিকই কৃষ্ণা আর সহ্য করিতে পারিল না, সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অশ্রু-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বাবা! বাবা! একটা অনিশ্চিত সুদূর ভবিষ্যতের আশায় ভুলে তুমি আমার মান-মর্য্যাদা সমস্তই ঐ লোকটার হাতে তুলে দেওয়াচ্চো, এ কি ভাল কর্‌চো?"

মল্লিক-সাহেব অবাক্ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া দৃষ্টিশূন্য দুই চোখ কপালের দিকে টানিয়া তুলিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ভাল করচিনে! কিসে মন্দটা কর্‌চি শুনি? তোমার সমস্ত মান-মর্য্যাদা তরুণের মত বড়লোকের ছেলে—একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌দত্ত হয়ে থাকার দরুণ নষ্ট হচ্চে কি রকম করে? সেইটুকুন্ শুধু বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে? আর ভবিষ্যতের আশা! সে জিনিসটা কি একটুখানি স্পষ্ট করে বলো তো?—ওঃ, ওর সেই আধমরা বউটোর কথা বল্‌চো বুঝি?"

কৃষ্ণা তাহার অন্তর বাহিরের অন্ধ পিতার সহানুভূতি প্রাপ্তির ক্ষণিক দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "হুঁ।"

"ওঃ, সেই জন্য তুমি বিরক্ত হচ্চো? তা' সেটাকে ত' খুবই অস্বাভাবিক বল্‌তে পারিনে! তোমাদের বয়সে ও-রকম অসহিষ্ণুতাটাই যে স্বাভাবিক। এতদিন ধরে যে তুমি সেই পাগ্‌লির মরণ-প্রতীক্ষায় ওকে কি করে ঠেলে রেখে দিয়েছ, সেইটেকেই তো আমার চোখে নেহাৎ পাকামী ঠেক্‌ছিল। তা' হলে এক কাজ করা যাক্, সমাজের লোকে হাসে তার আর হবে কি?—তোমাদের হিন্দু-বিবাহ হলেই সবদিক্ দিয়েই সকল গোল মিটে যায়। আচ্ছা, ওকে তুমি আস্‌তে বলো, তুমি না পারো আমিই তা'কে এ কথা বল্‌বো। আর যত শীঘ্র সম্ভব, বিয়েটা চুকিয়েই ফেল্‌বো। আমাদের পক্ষে বাধা তো আর নেই এতে, তবে লোকের কথা!"

মেয়ের মনের কথায় বিপরীত বুঝিয়া মল্লিক-সাহেব একদিকে যেমন হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন, অপর পক্ষে বাপের এই বিষম সান্ত্বনাবাক্যে কৃষ্ণার অন্তরের সমস্তটুকু বলভরসা যেন কোথায় উড়িয়া গেল। বক্ষবিদ্ধ লুণ্ঠিতা বিহঙ্গীর মর্ম্ম-কাতরতার মতই সে অত্যন্ত মৃদু আর্ত্ত-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "না, বাবা! তা' বলো না, সে আমি পার্‌বো না, মেরে ফেল্‌লেও পার্‌বো না।"

"তবে তুমি চাও কি? কি তোমার মতলব সেইটাই বেশ স্পষ্ট করে বলে ফেল না হয় শুনিই"

কৃষ্ণা কথা কহিল না।

"তুমি চাও, তরুণের সঙ্গে মিথ্যে একটা খিটিমিটি বাধিয়ে তাকে তুমি ছেড়ে দেবে। একে তোমার বিষম একগুঁয়েমীতে তার ধৈর্য্যের বাঁধ কতদিন বাঁধা থাক্‌বে, তা' কিছুই বলা যায় না, কারণ, হিন্দু-ঘরে মেয়ের অভাব নেই। শুধু সে তোমায় ভালবেসেই তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌চে। —তার উপর যদি অন্য কিছু অশিষ্ট আচরণ করে থাক, আর তার ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে না নাও, তা' হলে, তা' হলে তোমার ভবিষ্যৎ যে সর্ব্বনাশের বেড়া-আগুনে জ্বল্‌বে, সে আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি। তরুণের কাছে আমার পঁচিশ-হাজার টাকা দেনা, সে তোমায় বলেইছি। তা'তে এক পয়সাও সে সুদ নেয় নি; কিন্তু এই বাড়ী বাঁধা দিয়ে সে অন্য লোকের কাছ থেকেও যে পঞ্চাশ

হাজার টাকা ধার দিইয়ে দিয়েছিল, সুদে সুদে সেটাও প্রায় সত্তর আশী হাজার কি আরও বেশী হয়ে উঠ্‌লো। সব শুদ্ধ জড়িয়ে দেড় লাখ হবে, বোধ হয়। ওর আশ্রয় যে তেজ করে ছাড়্‌তে চাইচো, আমার হাত ধরে দাঁড়াবে কোথায় বল তো শুনি? দেখ, ও-সব মতলব ছাড়, তোমার উপর আমি অনেক টাকাই খরচ করেচি, ঢের ভরসাই আমার ছিল; ভগবান আমায় মার্‌লে, তুমি শুদ্ধ আর মেরো না। যাও, ওঠো,—তারটি ভাল করে গুছিয়ে লিখে পাঠাও-গে বেশ বড় করেই না হয় লেখ, না হয় দশ-পনের টাকাই খরচ হবে। অত কেপ্পনী কর্‌বার কোন দরকারই নেই, তরুণের স্ত্রী হলে তোমায় পয়সার দুঃখ পেতে হবে না। হ্যাঁ যাও, আর আমার জন্য এক গ্লাস স্যাম্পেন দিতে বলে যেও। আঃ—তোমার সঙ্গে বকে বকে আমার মাথা ধরে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি! তোমার মা ছিল একজন লেডী,—তুমি তার পেটে জন্মে কোত্থেকে যে এমন ইতুরে নজর পেলে, তাই ভেবে আমি অবাক্ হচ্চি। অ্যাঁ!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলাকার ডাকে যশোর হইতে একখানা মোটা খামের চিঠি কৃষ্ণা-মল্লিকের হাতে আসিল। অনেক বৎসর ধরিয়াই তো আসে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে এই লেখকের পত্র-সম্বন্ধে তাহার চিত্তে উপেক্ষা বা প্রতীক্ষার ভাব কোনটাই খুব বেশী প্রবল ছিল না যে, সেটা আজিকার এই পত্র-খানা হাতে পড়িতেই সে বেশ স্পষ্ট করিয়া সেটা জানিতে পারিল, চিঠি ইংরাজীতে লেখা, তার ভাবার্থটা এই।

আমার প্রিয় বেবি!

তোমার দু'খানি টেলিগ্রামই পাইয়াছি। তোমার বাবা আমার সংবাদের জন্য বিশেষ উৎসুক্, সেটা তাঁর পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তুমি নিজেও যে তাঁর দৌত্যের মাঝখানে একটুখানিও গোপন অংশ লও নাই, এমন অসঙ্গত কথাটা আমায় জোর করিয়াও কেহ বিশ্বাস করাইতে পারিবে না! তোমার দ্বিতীয় তারের খবর 'তুমি না বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় বাবা বিশেষ দুঃখিত, সুবিধা হইলেই তোমাকে তিনি আসিতে অনুরোধ করিতেছেন।'—এর মধ্যেও যে আমি তোমার লজ্জা-প্রচ্ছন্ন অন্তরের সুগভীর আবেগভরা আমন্ত্রণ অনুভব করিয়া পরম-সুখে অভিভূত হইয়া রহিলাম।

বেবি! তোমায় না দেখে এবার যে হঠাৎ চলে এসেছি, তার জন্যে ক্ষমার পর ক্ষমা চাইলুম। সত্যি বেবি!—মনে বড্ড অভিমান হয়েছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিলুম বোধ হয়, না? তুমি ছেলে-মানুষ, সব সময় নিজের মনটাকেই নিজে হয়ত' বুঝে উঠ্‌তে পারো না। বিশ্ব-সংসার এ সময়টায় তোমার কাছে একটা হেঁয়ালীর মত জটিল, ছায়া-বাজীর মতই ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত। নানা রকমের উত্তেজক উপন্যাস ও আধুনিক দেশী বিদেশী হুজুক্‌ওয়ালা নির্ব্বোধ ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তোমাদের চোখে হঠাৎ এক একটা কল্পনার গন্ধর্ব্বলোক সৃষ্টি করে তোলে। আর তোমরা দিক্‌-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে অম্‌নি রাতারাতি কেউ বা যীশুখৃষ্ট, কেউ বা ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই হয়ে উঠ্‌তে ছুটে যাও।—কিন্তু ওসব ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখাই সব চেয়ে সুবিধে, বরং এর দু'একটা উপন্যাসের প্লট্ করে নেওয়াও চলে, তবু বাস্তব-জীবনে এর কোনই সুবিধা বা সার্থকতা যে নেই,

এটা খুবই সত্য। যাই হোক্, আমার ছোট্ট কিষেণটি, আমার শিষ্টশান্ত বেবিটি যে নিজের নভেলী-খেয়াল ত্যাগ করে, তার নির্ম্মম অনাদরে জীবন্মৃত সাধকের পানে আবার চোক দুটি তুলে চেয়েচেন, এই তার পরম-ভাগ্য! সে দৃঢ়রূপেই জান্‌তো যে, এ দুর্দ্দিন তার বেশীক্ষণ থাক্‌বে না, আর সেই সুসময়েরই প্রতীক্ষায় সে তার চির-অভ্যস্ত সহিষ্ণুতা নিয়ে নীরবে অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে জান্‌তো তার স্বপ্নলোকের রাণীটি তার মরীচিকাপূর্ণ স্বপ্নবাণী ভুলে আবার শীঘ্রই সত্য ও সুন্দর জাগ্রতাবস্থায় ফির্‌বেই, আর তার বুদ্ধিমান্ ও স্নেহময় বাপও তার প্রত্যাবর্ত্তনের সহায় হবেনই হবেন।—যাই হোক্ বেবি! এমন আনন্দের পাত্রটি আমার কানায় কানায় আমি এই মুহূর্ত্তে ভরিয়ে নিতে পার্‌লুম না, এইটুকুই বড্ড আপ্‌শোষ থেকে গেল। তোমার পায়ের তলায় বসে [আমার পক্ষে এই পরম লাভবান্ ও অপরিসীম আনন্দ-গৌরবে পরিপূর্ণ] তোমার মনের উদ্বেগটুকুর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া সে আমার মন্দ-ভাগ্যে ঘটে উঠ্‌লো না। ছুটী তো এখন একেবারেই নেই, একদিনের জন্যও জেলা ছেড়ে যাবার মোটেই এখন উপায় নেই আমার। এখানে স্বদেশী-প্রচারের হুজুকটা বড্ডই বাড়াবাড়ি যাচ্চে, একবেলার জন্যও চলে গেলে, যদি কিছু ঘটে তো চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়্‌বে।* তোমার বাবাকে স্বতন্ত্র পত্র দিয়েছি, তাঁকে পড়ে শুনিও।

তোমার চিরানুগত—তরুণ।

মিঃ মল্লিকের পত্রখানায় এর চাইতেও অনেক বেশী বিনয়-নম্রতার সহিত তাঁহাদের দিন-কয়েকের জন্য যশোহরের বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে যে তাঁহার চিরভৃত্য ও একান্ত স্নেহাস্পদ সন্তানকে কত বড় আনন্দ ও গৌরব দান করা হইবে, তাহা লেখনীমুখে জানানই যে অসম্ভব! আর এই অনিবার্য্য বিচ্ছেদে যে বেবির চিত্তও ক্লিষ্ট হইয়াছে এবং এ মিলনে যে সেও নিরতিশয় সুখী হইবে, এ আভাসও এ পত্রে অতিশয় সন্তর্পণেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর একটা কথার উল্লেখ ছিল, সেটা এই—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার হতভাগিনী প্রথমা পত্নীর দীর্ঘ জ্বালা শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া পূর্ণ শান্তি লাভের আশা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন আর তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার অভিশপ্ত জীবনের শেষ হওয়ার সম্ভব। অতএব আর দীর্ঘকাল বোধ হয় আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।"

আপনার বিশ্বস্ত ও বিনীত ভৃত্য—তরুণ।

পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একটা দীর্ঘ—দীর্ঘতর নিশ্বাস জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্নের আগুনে-ভরা ঝড়ের মতই কৃষ্ণার তপ্ত-বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সে সেই দুখানা চিঠি কোলে করিয়া—মরা ছেলে কোলে করিয়া মা যেমন করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনিতর মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সদ্য-জাগ্রত সমস্ত আশা, তাহার অন্তরের সমুদয় সঞ্জীবিত সুধারস যেন এই সঙ্গে কে জোর করিয়া মৌচাকের মধুর মতই নির্ম্মম করে নিঙড়াইয়া লইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এই চিঠি বাপের হাতে পড়িলে তারপর তার ভাগ্য কোন্ পথের পথিক হইবে, সে-কি আর তাহার জানা নাই! যশোহরের নিমন্ত্রণ ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। সেখানে সর্ব্বদা তাহার চোখে চোখে কাছে কাছে থাকিয়া তাহার প্রণয়-নিবেদনের সহস্র খুঁটিনাটি তাহাকে সহিতেই হইবে, উপায় নাই। কিন্তু আজ সে প্রেমের প্রলাপ-ধ্বনিতে যে তাহার বিদ্ধ-হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে। তাহার কাতর-চিত্ত পাগল হইয়া পালাইতে চাহিবে, সে তাহাকে ঠেকাইবে

কি দিয়া ? এতদিন সে উহাকেই নির্ব্বিচারে নিজের ভবিষ্যৎ স্বামী মনে করিয়া উহার কাছে বন্ধুজনোচিত আদর-আব্দার করিয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে তাহার দিক হইতে এমন কোন প্রেমের নিশানা প্রদর্শিত হয় নাই, যাহার স্মৃতি তার কৌমার-চিত্তে এক বিন্দুও সঙ্কোচের লজ্জা আনয়ন করিতে পারে; কিন্তু সে পক্ষ হইতে যে অজস্র প্রণয়-স্তুতি ও তার সঙ্গে সমান ওজনে মাপিয়া অনন্যসাধারণ হীরা-মতির উপহার তাহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে, সে তো নিজের জিনিষ মনে করিয়াই দ্বিধাহীন সানন্দচিত্তেই সে সব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করে নাই! এই অপরিমেয় অপরাধের কালিমা মুখে লইয়া আজ কোন্ মুখেই বা সে তাহার সেই উৎসাহপ্রাপ্ত যত্নে বর্দ্ধিত উদ্দাম আশালতার মূলে বিমূঢ় চিত্তের কুঠার তুলিয়া ধরিবে ? আজ নিজের অন্তরের সত্য তাহার কাছে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে ভালবাসে না,—অর্থাৎ প্রেম যাহাকে বলে, সে জিনিষ তাহার হৃদয়-যন্ত্রটাকে কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিলেও তাহার মধ্য হইতে উহার উদ্দেশ্যে এক ফোঁটা বাহির হইবে না,—কিন্তু বাহিরটা যে তাহার বাল্য-চাপল্যের অজ্ঞতাজনিত মিথ্যার জালে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কোথায় ? উপায় কোথায় ? উপায় কি নাই ?

ঘরের পর্দ্দার বাহিরে একটা চটি-জুতার শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। সর্ব্ব-শরীর-মনে চমকিত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ-মুখে কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িয়া মানসোদ্বেগে দ্রুত-কম্পিত-স্বরে বলিয়া উঠিল—"আসুন!" —তাহার কণ্ঠে অকূলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির আকস্মিক কূল প্রাপ্তির সপ্রচুর আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল বিনয়।

"বাঃ! আপনি বুঝি আমাদের কাজ থেকে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে ছুটী নিয়ে বস্‌লেন ? বেশ তো! তা হবে না! চলুন চলুন, আপনাকে না হলে আমাদের তো কিছুতেই চল্‌বে না।"

হাসিমুখে এই কথা বলিতে বলিতে সে কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে থামিয়া গেল, ও ঈষৎ অপ্রতিভের ভাবে আস্তে আস্তে বলিয়া ফেলিল—"আমি এ রকম অকস্মাৎ নাদির শার মতন এসে পড়ে হয়ত আপনার অনেক আনন্দের ব্যাঘাত করে ফেল্লুম না ?—আমার কেমন মন্দ স্বভাব, ঝোঁকের মাথায় কিছুরই হুঁস্ থাকে না।"—এই বলিয়াই সে করুণচক্ষে কৃষ্ণার হাতের মুঠায় চাপিয়া-রাখা চিঠিগুলার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখের ও আলোর আভা তখনই মলিন হইয়া গিয়াছে।

সে দৃষ্টিও তার সঙ্গে বিনয়ের ঐ অর্থ-নিহিত আত্ম-তিরস্কার কৃষ্ণার মনের ক্ষতে যেন ভীমরুলের হুল ফুটাইয়া দিল, এম্‌নি ব্যথা-কাতর ব্যাকুল চোখে সে তড়িৎ বিকাশের স্ফূর্ত্তির মতই নিমেষমাত্র উহার পানে চাহিয়া দেখিল, নিজের মুখের উপরকার আতপ্ত-রক্তিমা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সেও সে তাহার ভিতরের রক্তোচ্ছ্বাসের দ্রুত উত্থান হইতেই অনুভব করিয়া বিব্রত নতমুখে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া অনিশ্বসিত দ্রুতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না না, আপনি এসে আমার কত যে উপকার করেছেন, সে আপনি জানেন না। আমি এ কটা দিন মোটে বেরুতে পারিনি, আজ যাব ভেবেছিলুম।"—এ কথাটা সে মিথ্যাই বলিল! আজ বাহির হইবে, এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে সে কথা ভাবিতে সে অবসরও পায় নাই।

শিশু-সুলভ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয় প্রায় নাচিয়া উঠিবার যোগাড় করিয়া তুলিল এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে পেয়ে অবধি আমাদের কাজ যে কতখানি এগিয়ে গেছে, সে জান্‌লে আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন! আপনার নাম শুনেই কত লোক বল্‌তে থাকে, সেই মল্লিকসাহেবের খুব সুন্দরী আর ফ্যাসানেবল্ মেয়ে! তিনিও এতে যোগ দিয়ে 'গড়া' পর্‌বেন! তবে আমরাই বা না পার্‌বো কেন।—কেউ বলে, তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিষটার মধ্যে সার আছে, শুধুই একটা হুজুক নয়! অত সুখী-বিলাসী লোক যারা, তারাই যখন এই কৃচ্ছ্রসাধনের পথে ফিরে দাঁড়াচ্চে, তখন বিশেষ কোন লাভের আশা না থাক্‌লে, আনন্দ না পেলে, শুধুই অসার কল্পনার পথে, ঐ সব বস্তুজীবী লোকেরা শুদ্ধ আস্‌বে কেন? ওরা তো বোকা নয়, মূর্খ নয় এবং গরীবও নয়। দেখুন, আপনার এই একটী আদর্শেই দেশের ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠ্‌ছেন। আপনার মত আর দু-চারজন এলে তখন আরও কত সহজ হবে, ভাবুন তো!"

বিনয়ের এই সরল অভিব্যক্তিতে তাহার কর্ম্মজীবনের সাফল্যজনিত আনন্দরস যেন উপ্‌ছিয়া পড়িতে গেল, কিন্তু এই অপরিমেয় আনন্দের কাকলী যেন কৃষ্ণার তৃষিত-অন্তরের সব তৃষ্ণা মিটাইয়া তুলিতে প্রচুর বলিয়া তাহার মনে হইল না। সে অপরিতৃপ্ত ঔদাস্যে অথচ একটুখানি ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল—"তা' হলে আমি আপনাদের নন্‌কো-অপারেশনের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছি বলুন?"

হৃদয়-খোলা সুপ্রচুর উচ্চ হাস্য করিয়া বিনয় উত্তর দিল, "তা একরকম বই কি!—" তারপর সেই হাসিমুখেই একটুখানি নিম্নস্বরেও যেন কতকটা আপনা-ভোলা ভাবে সে কহিয়া উঠিল, "তা' ছাড়াও আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাতে বেশ একটু উৎসাহ পাই, আনন্দও পাই। সেটুকু কিন্তু আপনার আড়ালে হয় না।—"—আবার সেই প্রকার কলহাস্য করিয়া উঠিয়া বালকের মতন আগ্রহভরে চঞ্চল হইয়া কহিল—"এই জন্যই দেবাসুরের যুদ্ধে পরাস্ত দেবসেনাগণের দেবী-আরাধনার প্রয়োজন ঘটেছিল, এবং মহাশক্তিকে সহায় না করা অবধি তাঁদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হয়েচে, তা জানেন?"

কৃষ্ণার সেই টক্‌টকে রাঙ্গা গাল যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, বুকের মধ্যেও তাহার ঠিক এই একই রকমে গরম রক্তের তোলপাড় চলিতেছিল;—ষ্টীমারের চাকার তলায় পড়ায় জল যেমন সমুদ্রের মতন কল কল শব্দ করে, তেম্‌নি করিয়া তাহারও দুই কানের মধ্যে তাহার নিজের বুকের রক্তের ঢেউএর গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। একটী শব্দও তাহার সেই শোণিত-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠ দিয়া বহির্গত হইতে সমর্থ হইল না।

বিনয় নিজের মনের উচ্ছ্বাসেই শ্রোত্রীর বিপন্নাবস্থায় লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল।—"কিন্তু দেখুন, একটা জিনিষ পাব্‌লিক—এই সাধারণ লোকে ঠিক্ বুঝ্‌তে পারে না—আর আমারও কেমন খট্‌কা লাগে। আপনি এই যে বিদেশী শিল্প, বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জ্জন করবার শপথ নিলেন, কিন্তু যখন আপনি মিসেস্ লাহা হবেন, তখন কি করবেন? তিনি যে এদিকে মন দেবেন, সে ত বিশ্বাস কর্‌তে পারা যায় না। এই আজকেরই......কাগজে দেখ্‌বেন যে, তাঁর সম্বন্ধে 'এডিটোরিয়ালে' কি সব লিখেছে। কাছারীর মাঠে বন্দে মাতরম্ বলে চেঁচানর জন্যে তিনি না কি তিনজন ছোট ছোট ছেলেকে এক মাস করে জেল দিয়েছেন। একজন আমলা তাঁকে দেখে

সেলাম করেনি বলে চাপ্‌রাসী দিয়ে তার কান ধরে দৌড় করিয়েছেন। তা এই লোককে যে কি করেই আপনি সহ্য করে চল্‌বেন, ও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বেন, তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য্য হচ্চি, এবং—এবং—”

বিনয় হঠাৎ নিজের অন্তর-উৎসারিত বাক্য-স্রোত রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিল, “—আপনার কি অসুখ কর্‌চে নাকি ?”—

“হুঁ”—বলিয়াই কৃষ্ণা পাশের চেয়ারখানার উপর এলোমেলোভাবে বসিয়া পড়িয়া চোক বুজিল। যে সমস্যাটা তাহার জীবনে আজ সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে,—বিনয়—এই সরল সত্যবাদী ও নির্ভীক বিনয়,—ঠিক সেইখানেই যে ধাক্কা মারিয়াছিল! উঃ কেমন করিয়া,—সত্যই তো কেমন করিয়া এই দুইটী জীবন-পথের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন লক্ষ্য পরিচালিত নরনারী একাত্মতায় পুণ্য-শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক পতিপত্নীত্বে বৃত হইবে ? পরস্পরের আশা উদ্দেশ্য আনন্দ সবই যখন আজ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন কত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াই তাহাদের বলিতে হইবে যে, আজ হইতে ‘তোমার আমার হৃদয় অভিন্ন !”—কৃষ্ণার সেই প্রভাত স্থল-কমলের মত সরক্ত মুখ নিমেষে সায়াহ্ন পদ্মের মতই ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একটা গভীরতর আর্ত্তশ্বাস সজোরে টানিয়া সেটাকে অবরুদ্ধপ্রায় বুকের মধ্যে প্রেরণ-চেষ্টা করিল। নহিলে যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল।

বিনয় এইবার তাহার আগাগোড়ার অদ্ভুত ব্যবহারটাকে যেন নিজের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিয়া ইহার নানারূপ কারণ কল্পনামাত্রে সব চেয়ে সঙ্গত ও সহজ যেটাকে তাহার সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, ফস্ করিয়া সেইটাকেই সে অসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল—“উঁহু, তা নয়! মিঃ লাহার সম্বন্ধে ওই সব নিন্দা করায় আপনি বোধ হয় চটেচেন! কেমন,—ঠিক্ ধরেছি কিনা ?”

বিনয়ের এই শিশুসুলভ অকৃত্রিম সরলতা ও তাহার কণ্ঠের এই ভ্রান্তবিশ্বাসের অন্যায়প্রাপ্ত বেদনার ঝঙ্কারে কৃষ্ণাকে যেন তাহার তলাইয়া-পড়া গভীর অবসন্নতা হইতে এক মুহূর্ত্তেই তুলিয়া দিল। সে এই কথায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া ঠিক নিজের সহজ অবস্থায় যেন সুপ্তোত্থিতের মতই ফিরিয়া আসিল, এবং সমুদয় মানসিক সংগ্রামকে একই ক্ষণে জয় করিয়া লইয়া শান্তস্বরে কহিয়া উঠিল,—“না বিনয়বাবু। সত্যকে সহ্য করে নে’বার শক্তি আমি পেয়েছি। আর সে আপনার হাতের চাবুক খেয়েই পেয়েছি। আপনার কথার কোনখানেই কোন রাগ অভিমানের উপায় নেই, কারণ এর সবখানিই সত্য! জোর করে উড়িয়ে দিলে, রাগ কর্‌লে তা’ নিয়ে লড়্‌তে গেলেও সত্য কোন দিন মিথ্যা হবে না। অস্বীকার কর্‌বো না, আমিও আপনার মতই আমার নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বড্ড বেশী ভাবনায় পড়েছি, আর তারই জন্য আমার সকল কাজেই এ রকম এলোমেলো ভাব দেখ্‌ছেন! যেহেতু জীবনটাই এখন আমার জট্‌পাকান গোলমেলে হয়ে পড়েছে।—আচ্ছা, কি করি বলুন তো ?”

বিনয় উহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উহার সহিত সমদুঃখে ও সহানুভূতিতে বিগলিত-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ এই অপরূপ-চরিত্রা কৃষ্ণার কথা—তাহার জীবনের এই মহাসঙ্কটের ভাবনা—সে নিজেই যে আজ কয়দিন দিন-রাত্রি ধরিয়া না ভাবিয়া পার পাইতেছে না! তাহার প্রতি—নিজের অবিচার ধরা পড়িবামাত্রে যে অনুতপ্ত বেদনায় সে ইহার ’পরে নিজের সশ্রদ্ধ

অন্তরকে অবনত করিয়া দিয়াছিল, ইহার অত্যধিক দ্রুত উত্থানশক্তি, অপরিসীম ত্যাগ-মাহাত্ম্য, অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা-দর্শনে প্রতিনিয়ত সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির উৎসে উৎসারিত হইতে হইতে সহস্রধারায় নিজের সারাচিত্ত প্রাণ সুধাসিক্ত করিয়া দিয়াই যে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার হস্তস্পর্শে কঠিন কর্ম্ম-ভূমি সরস হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সাহচর্য্যে তাহাদের কর্ম্মোদ্দীপনা শতগুণেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই শক্তিময়ীকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নিজেদের শক্তিকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ বলিয়া নিজেরাই পূর্ণোদ্যমে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই অকাল-বোধিত শক্তি পাছে প্রবল-হস্তে অপহৃত হইয়া তাহাদের নবোদ্দীপিত আশার শিখাটুকুকে নির্ব্বাপিত করে, সেই সম্ভাবনার অমঙ্গল-হেতুকে সে বা তাহারা কেহই যে একবারও ভুলিতে পারিতেছিল না ; সেটা আর বিচিত্র কি ? চাঁদের রাহুর মতই সে যে ইহারও পিছনে লাগিয়া আছে।—

কৃষ্ণার এই সহজ ও সাগ্রহ অভিব্যক্তিটুকু তাহার কানেও তাই বড়ই মধুর ঠেকিল, এবং ইহাকেও তাহার অকৃত্রিম সাহায্য প্রার্থনা বলিয়াই বিশ্বাস জন্মানয়, সে তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরগত চিন্তা-ধারারই অনুবর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দিল, "আপনি যদি মনে বুঝে থাকেন যে, এ বিবাহে সুখী হ'তে পারেন না, তা' হ'লে সে বিয়ে করতে যাবেন কেন ? আপনারা তো রক্ষণশীল সমাজের লোক নন্, আর কম বয়সের বাপ মায়ের দেওয়া বিয়েও তো আপনাদের হয় না। তা' হ'লে আর বাধ্য-বাধকতাটা কর কাছে !"

বিমর্ষ-মুখে হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল,—"দেখ্‌তে শুন্‌তে কতকটা উপর উপর তাই বটে, কিন্তু এ সমাজেও মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। অত্যন্ত গরীব বা সামান্য লোককে মেয়ে যদি হঠাৎ পছন্দ করে ফেলে, তার কর্ত্তৃপক্ষরা তার নির্ব্বাচন নিশ্চয়ই যে মঞ্জুর করবেন না, এটা অনেক সময় দেখেছি। তবে সুখের বিষয় যে, মেয়েরা প্রায়ই তেমন বোকা হয় না। যাই হোক্, আমার সম্বন্ধে সে ভুল যখন হয়নি, তখন যে আমি এক কথায় ছাড়ান পাবো, এমন আশা করতে পারা—" কৃষ্ণা এই সামান্য দিনের পরিচিত নবীন কর্ম্ম-বন্ধুর নিকট এতখানি খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কহিতে গিয়াও অচম্‌কা যেন কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

বিনয় তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি একবারমাত্র বিষণ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেই তাহার সঙ্কট-অবস্থা সবটাই না হোক, তবু যেন বহুল পরিমাণেই অনুভব করিতে পারিয়া তাহার জন্য অত্যন্ত বেদনা ও নিজের জন্য তেম্‌নি একটা নিরানন্দতায় ডুবিয়া গিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিমর্ষ নতমুখে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিল। তারপর সহসা যেন কি একটা আগন্তুক আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া সে প্রায় লাফাইয়া উঠিবার যোগাড় করিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "দেখুন ! আমি এর একটা পথ পেয়েছি! 'নন্‌-কো-অপারেসন, এণ্ড নন্‌-ভায়োলেন্স্‌ বট প্যাসিভ্‌ রিজিস্‌টান্স্‌'। আপনার এই কেস্‌টাতেও তাই খাট্‌বে !—কি বলেন ?"

কৃষ্ণা এই ছেলেটীর কথার রকমে কৌতুকবোধ করিয়া অত দুঃখের মধ্যেই হাসিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটের পাশেই মিলাইয়া বুকের মধ্যে আশার তড়িৎ চকিত হইয়া উঠিল। এই অসহযোগিতার পথই হয়ত' তাহার সকল ক্ষেত্রেরই অবলম্বনীয় মুক্তির পথ হইতে পারিবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ লাহারলিখিত ডাক্তার মল্লিকের নামের চিঠিখানা চুরি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য কৃষ্ণার মন লোভ-চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার ভয়েই সে-খানা সে বাপকে গিয়া পড়িয়া শুনাইল ; শুনিয়া যে বিগতক্ষমি ডাক্তার-সাহেব আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, সে কথা না বলিলেও চলে। কয়দিন হইতে দিনের পর দিনেই তাঁহার চিত্তে তাঁহার একমাত্র সন্তান ও অবলম্বন এই মেয়েটীর প্রতি গভীর অপ্রসন্নতা জমিয়া উঠিতেছিল। সে তাঁহার ছয়জন সেবককে ছাড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে তাড়াইয়াছে, তাঁহার খাবারের ফল কমদামী, মাংসর চেয়ে রুটির পরিমাণ বেশী ও পানীয়ের মধ্যেও সোডা অধিক ঢালিতেছে, ইহা বেশ জানা গিয়াছে। আর যে কোথায় কি হইতেছে, সে সব অন্ধ বলিয়া তাঁহার দেখিতে পারিবার উপায় নাই। হয়ত' তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার সাংসারিক দুরবস্থার চিহ্ন তাঁর এই অপরিণামদর্শী মেয়েটার খেয়ালে দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইবে। তখন লজ্জায় তিনি মুখ লুকাইবেন যে কোন্‌খানে, সেই ভাবিয়াই মুখ মাথা তাঁহার ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

সেদিন সকাল-বেলাতেই ডাক্তার সাহেবের বিশেষ বন্ধু এবং মিসেস্ করের পিতা মিঃ হাল্‌দার আসিয়া তাঁহার মনের আগুনে বেশ দুখানা ইন্ধন জোগাইয়া গেলেন। তিনি আসিয়াই কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি!—তা' হলে পাঁচজনে যা' বল্‌চে তার তো কিছুই মিথ্যা নয়। বেবি! এ তোমার কি সখ? গড়া পরে খালি পা করে তুমি নাকি ছোট লোকদের মধ্যে 'প্রীচ' করে বেড়াও, আমি সে কথা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি ; কিন্তু এখন তো স্পষ্টই চক্ষের উপর তোমার সেই বেশই দেখ্‌ছি! তা' হলে তুমিও ওই গুণ্ডাদের দলে মিশেছ?"

কৃষ্ণা তাঁহার জন্য চা তৈরী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া মৃদু মৃদু অনুযোগ করিল।—"গুণ্ডা তাদের কেন বল্‌ছেন জ্যেঠামশাই? তারা তো লাঠি-সোটা নিয়ে বেড়ায় না।"

মিঃ হালদার চোক কপালে তুলিয়া ফেলিলেন, "বলো কি বেবি! লাঠি না থাক্‌লেই কি গুণ্ডামী কর্‌তে কিছু কম পড়ে? তারা জবরদস্তি লোককে খদ্দর পরাবে? না হোক্ অম্‌নি হরতাল করে—লোককে আফিস-ইস্কুল ঢুক্‌তে দেবে না, এ'কি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি?"

কৃষ্ণা ঈষৎমাত্র হাসিয়া ফেলিল, "না জ্যেঠামশাই! মুল্লুক যে 'মগের' নয়, সে বেশ দেখা যাচ্ছে। তা—সে যার মুল্লুকই হোক্ না কেন দেশের লোককে হাতে-কাটা সূতোর কাপড় পর্‌তে বা তৈরী কর্‌তে বলায়, এই অন্ন-বস্ত্র সমস্যার দিনে অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন কর্‌তে জোড়হাতে অনুরোধ করায় এবং জাতীয় ঐক্যতার অনুরোধে একটুখানি স্বার্থহানি কর্‌বার জন্য উপদেশ দিতে যাওয়ায় যদি গুণ্ডামী করা হয়, তাহলে সমস্ত পাশ্চাত্য-জগতের সমস্ত লোকগুলো যে কত বড় বড়ই গুণ্ডা, আর এ জগতে কারু সাধ্য নেই বটে, তা' হলেও একজন মাত্র যার তাদের বিচার কর্‌বার শক্তি আছে, তাঁর দরকারে ওদের কি না কঠোর দণ্ডই হওয়া উচিত, তাই আমি ভাবচি!"

মুখ লাল করিয়া হাল্‌দার সাহেব যেন কুইনিন্-মিক্‌শ্চার খাইতেছেন, এম্‌নি ধরণেরই মুখখানা করিয়া চা খাইতে লাগিলেন, এবং কৃষ্ণার আড়ালে তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া তাহার মর্ম্মাহত বাপের

সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাঁহার বেশ একটি হৃদ্য-আলোচনা চলিতে লাগিল। হালদার সেই অন্ধ অসহায় বন্ধুটীকে অনেক উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এই অসাধ্য অবাধ্য কন্যার সমস্ত শাসন-ভারই যে এই সময় হইতেই মিঃ লাহার হাতে তুলিয়া লইতে দেওয়ার সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিয়া তাঁহার মনের একান্ত বাকি দ্বিধাটুকুও নষ্ট করিয়া দিলেন। তারপর চুপে চুপে দুই বন্ধুতে মিলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। তার সার মর্ম্ম এই প্রকার ;—মিঃ লাহার জীবন্মৃতা স্ত্রী যদি এই সপ্তাহে মরিল তো উত্তম, যদি না মরে তাহা হইলে যেন তেন প্রকারেণ কৃষ্ণাকে বুঝাইয়া হউক, না বুঝাইয়াই হউক, তাহাকে অন্ততঃ হিন্দু-বিবাহপদ্ধতি অনুসারেও তরুণচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফেলা আবশ্যক, এবং ইহা করিতেই হইবে!—তাহাতে সন্দেহ নাস্তি! বন্ধুবান্ধবেরা প্রথমটায় নিন্দা করিবে, হয়ত' এই মিঃ হালদারও লোক দেখাইয়া তাঁহাকে মুখে দুইটা ভৎর্সনা করিতেও পারেন, তাহাতে কি আসিয়া যায়? মেয়েটা তো রক্ষা পাইল। তা' ভিন্ন ইহার এই নিন্দিত আদর্শ হইতে ইঁহাদের পাঁচজনার ঘরের বধু-কন্যাগণও রেহাই পাইবে। আর স্বার্থ এবং সুযোগের খাতিরে অনেক বড় বড় লোকেই যেখানে মত ও আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া কন্যা-পুত্রের ভবিষ্যৎমাত্র দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন মিঃ মল্লিক আর কোন্ ছার? এক-স্ত্রী বর্ত্তমানে হিন্দু-বিবাহ চলে, অতএব হিন্দুত্ব মানি বা না মানি, হিন্দু বলিতেই বা দোষ কি? জাতি বা ধর্ম্মের জন্য তো আসিয়া যায় না, সুযোগটাই সকল ক্ষেত্রে সব চাইতে দরকারী।

অতএব মিঃ লাহার প্রথম পত্র পাইবামাত্রে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং তাঁহার দ্বিতীয় পত্র যখন চাপরাশী-বাহিত হইয়া আসিল, তখন 'পর্ব্বত ছাড়িয়া সিন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত নদীকে' যেমন 'রোধিতে পারা' 'কাহারও শক্তি'সাপেক্ষ নহে ; তেম্‌নি করিয়া মিঃ মল্লিক ভাবী-জামাতৃ-গৃহোদ্দেশ্যে ছুটিয়া বাহির হইবার জোগাড় করিয়া তুলিলেন। কৃষ্ণা প্রথমে মিনতি করিল, তারপর অসুখ করিয়াছে বলিয়া বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়া শুইল, তিনি চাকরের হাত ধরিয়া সেখানে শুদ্ধ আসিয়া পড়িয়া মহা গোলমাল বাধাইয়া তুলিলেন। তারপর চাকরকে সরাইয়া দিয়া ছেলে-মানুষের মতন হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মেয়েকে বলিলেন, "তুই যদি এমন করে আমার এত সাধে বাদ সাধিস্ বেবি! তা' হলে আমি নিজের মাথা নিজে ফাটিয়ে মরে যেতে বাধ্য হবো।—তুই কি চাস্ যে, তুই ওকে চটিয়ে তুলে ঐ দেড় লাখ টাকার দেনার দায়ে আমায় ও পথে বার করে দেয়? তোর এখন বয়সের জোর আছে, গায়ের রক্ত গরম আছে, তা'তেও তোর দৃক্‌পাত না হতে পারে, কিন্তু আমার যে মনে হলে বুক ধসে যায়! এই বয়সে, এই শরীরে কাণা-মানুষ আমি, তার উপর চিরদিন আমি ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ওই 'একটা অভ্যাস' হয়ে গ্যাছে,—আমার কি দশা হবে তাই বল্‌তো? তোর কি আমার কথা মনে করেও কোন মায়া হয় না, দেশ উদ্ধার করতে গেলে কি বুড়ো বাপকে মেরে ফেল্‌তে হবে' এমন কোন নূতনতর বিধান বার হয়েছে?"

কৃষ্ণা ইহার বিরুদ্ধ-যুক্তি লইয়া একটুও তর্ক করিল না। তাহার দুহিতৃ-গৌরব এখন অসহায় অনন্যোপায় অন্ধ পিতার এই মর্ম্মান্তিক আবেদনে যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। লজ্জায় অনুতাপে তাহার ধরণীগর্ভ-প্রবেশের ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিতেছিল। এই বাপের সুসময়ের সকল সুযোগই তো সে নির্ব্বিচারেই নিজের জন্য গ্রহণ করিয়া গিয়াছে ; আর আজ তাহার বিচারশীল

অন্তর তাহার পূর্ব্বাভ্যাসকে ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে বলিয়াই কিনা—সে সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজের—অসহায় বাপের কথা—তাঁহার লাভ-ক্ষতি, অভ্যাস-অনভ্যাসের সকল ত্রুটি পর্য্যন্ত মমতাবিহীন বিদ্বেষে নিজের স্বার্থের খাতিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে? এই কি সঙ্গত? সে যে পথকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছে, সে পথে তাহাকে চলিবার চেষ্টা যথোচিতভাবেই করিতে হইবে, কিন্তু তার পূর্ব্বে তার বাপের পথকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া যাওয়া হইবে না। তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ সুযোগটুকুকে বাঁধিয়া দিয়া তবেই সে তার নিজের চক্র সুরু করিতে পারিবে। এর জন্য যদি পথ একটু বাঁকা হয়, কিছু বিলম্ব ঘটে, সহিতে হইবে। গায়ের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিল এবং নিজের বাঁকা মনকে জোর করিয়া রাশ-টানা ঘোড়ার মতই ফিরাইয়া রখিয়া সে এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—"তাহলে, চলো।"

মল্লিক-সাহেবের মোটর দেখা গেল, রাস্তার পাশেই ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব প্রতীক্ষিত-নেত্রে চাহিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ নিগূঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; কৃষ্ণার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সেই আনন্দোজ্জ্বল-মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সেই লাল-পেড়ে মোটা শাড়ি এবং তেমনি মোটা হাত-কাটা ফিকা গৈরিক-বর্ণের লালপেড়ে শাড়ীর পাড়-লাগান জ্যাকেট্ এবং গোটা-কয়েক চাঁপা ফুলে গাঁথিয়া গড়া ছোট্ট দুখানি পায়ের পাতা বাহির করিয়া শুধু দুইটা চামড়ার চটি-জুতা। কিন্তু গায়ের রংয়ে জামার রংয়ে মিশিয়া গিয়া এত সাধারণ এত মোটাসোটা পোষাকেও যে তাহার অনুপম লাবণ্যকে কিয়ৎ-পরিমাণেও ম্লান করিতে পারে নাই, এই সঙ্গে সেই টুকুকেও লক্ষ্যভূত করিয়া তুলিয়া এই বিপন্ন প্রেমিকের বেসুরা চিত্ত-বীণায় আবার আশা-রাগিণী বাজিয়া উঠিতেও বিলম্ব ঘটিল না। মন এই কথা বলিয়া সেই সুবোধ ব্যক্তিটাকে সান্ত্বনা দিল যে, 'এ ভাব রবে না চিরদিন'—অতএব এ লইয়া অনর্থক এই জিদের মুখে একটা কাটান-ছাড়ন করিয়া ফেলিও না যেন? আগে গোড়া বাঁধিয়া লও, তারপর সবুরে মেওয়াও ফলিতে বাকি থাকিবে না। অতএব 'কুরু ধৈর্য্যং'!

মিঃ মল্লিক বিস্তর ছন্দোবন্দে তরুণচন্দ্রের এবারকার না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া আসায় তিনি এবং তাঁহার কন্যা যে মনের মধ্যে কত বড়ই বিস্ময়-বেদনার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষ্যে দুজনে মিলিয়া কি কি করিয়া, কোন্ কোন্ কথা বলিয়া তাঁহার 'পরে নিজেদের আশ্চর্য্য ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছিলেন, সেই সব কাহিনীই ঝাড়া দুটি ঘণ্টা ধরিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। সেই আধাখানা-মিথ্যা ক্লান্তিকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে তরুণচন্দ্র পুনঃপুনই নত-বদনা কৃষ্ণার বিরক্তি-বিপন্ন লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ইহার সম্পূর্ণ অযথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কৃষ্ণার ভাবভঙ্গি যে আজও সেই পূর্ণ বিদ্রোহের অভিমুখী হইয়াই রহিয়াছে, এই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে যে তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতেই তাহার পিতা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং এইরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হওয়ায় সে যে তাঁহার 'পরেও খুবই সন্তুষ্ট নয়, এ কথাটাও বুদ্ধিমান্ তরুণচন্দ্রের বুঝিতে বাকি ছিল না। মনে মনে ক্ষুব্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মনটা যে নবীন আনন্দের গাঢ় পিযূস-রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সব টুকুই যেন নিম্বতিক্ত দুষ্টস্বাদ হইয়া গেল। দু' একবারের দৃষ্টিতেই তাঁহার কয়দিনকার বিমান-বিরচিত সযত্ন-গঠিত সু-উচ্চ প্রাসাদ ভূমিস্যাৎ হইয়া পড়িয়া গেল

এবং সেই ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার আশাহত চিত্ত কাতর আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া বলিল, "এই কণকপ্রতিমার কাঞ্চন-গঠিত দেহটা তোর ঘরের মধ্যে তুলিয়া বসাইলি বটে, কিন্তু মনটুকু তার সে কোথায় রাখিয়া আসিল ? সেটুকু তো তোর জন্য এ সঙ্গে করিয়া আনে নাই।" —তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার বাপের বাড়ী যে দুর্গাপ্রতিমা আনা হইত, এর চেয়ে তার গড়া মূর্ত্তিতেও যেন মানবীত্ব বেশী প্রস্ফুট থাকিত। একেই কি সে এতদিনের অবিচলিত সহিষ্ণুতার সর্ব্বস্ব পণে আপন করিতে চাহিতেছিল ?—

মনের মধ্যে বড়ই অভিমান হইল, এততেও তিনি এই একটা মনকে বাঁধিতে পারিতেছেন না। এতদিন তো সে তাহার ভালবাসা আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিদানে,—তা একজন ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ের পক্ষে প্রতিদানে আর কতটুকু দেওয়া সম্ভব ? যেটুকু সঙ্গত, সে ত কই দিতেও কার্পণ্য করে নাই ? তাঁহাকে সে এতদিন ভালবাসিত বই কি ! তবে হঠাৎ আজকাল আবার হইল কি ? গড়া পরিলে কি মানুষের মনটাও ওই রকম কঠোর হইয়া যায় ? অথবা—আরও কিছু ? আর কি কেহ আমার এতদিনের আসন দখল করিয়া—এ আবার কি ভাবনা ? আমিও কি জেলাস্ হলাম নাকি ? ইচ্ছা করে প্রমীলাকে কোন রকম করে—নাঃ আমায়ও সে পাগল করে দেবে দেখ্‌ছি !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের প্রকাণ্ড বাংলোখানি পুরাদস্তুর সাহেবী কেতায় আগাগোড়াই সাজান ছিল। যেদিন কৃষ্ণা মল্লিকের নিমন্ত্রন-পত্র এখান হইতে গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে সাজসজ্জার সবটাই যেন তরুণচন্দ্রের চোখে অসম্পূর্ণ ও বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। কড়া হুকুমে রাজমিস্ত্রী ও ছুতার লাগাইয়া সে সরকারী বাংলোখানার দু'দিনের মধ্যে চুণ ফেরান ও রং লাগান সারাইয়া ফেলিল। কালেক্টরীর নাজীর ও কয়েকজন পেয়াদার উপর সকল ভার পড়ায় হুকুম তামিল সুচারুরূপেই হইয়া, গেল, বাগানে ফুলের কেয়ারি করা হইল, গাছে বিচিত্র আকারের ছাঁট পড়িল, নূতন কয়েকটা বহু-মূল্যের আস্‌বাব, তার গোটা-কয়েক লেড'লর বাড়ী হইতে ক্রীত হইয়া দু'একটা নিজের কলিকাতার বাড়ী হইতে বাহিত হইয়া নবীনা-অতিথির সম্মানার্থ এখানে আসিয়া হাজির হইল। ড্রইংরুমে কাঠের টেবিলের বদলে মার্ব্বেল টেবিলে পাঁচশো টাকার ফ্রেঞ্চ কারুকার্য্যের টেবিল-ক্লথ, ড্রেসিংরুমে নিজের যা' ছিল রহিল, আর একটা ঘরকে স্ত্রীলোকোচিত ড্রেসিংরুম তৈরি করা হইয়া গেল। তাহারই জন্য দুইটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নমুনার আয়না লাগান মেহগ্নির আলমারি, মার্ব্বেল পাথর-বসান মেহগ্নির আর্‌সির টেবিল, আরও ছোট-বড় নানারকমের জিনিসপত্র কিনিয়া আসিল। নিজের শয়ন-গৃহের অবস্থা তাঁহার মোটেই সুসঙ্গত নয়। ঘরজোড়া সতরঞ্চ বিছান, ঘরের মধ্যে একখানা স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা লোহার খাট, একটা ছোট ত্রিপদীতে একটা কাঁচের কুঁজায় এক কুঁজা জল আর কিছুই না। পাশের দিকের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে সেগুলাকে ডাক্তার মল্লিকের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়া এই বড় ঘরখানাকে তিনি বড় সাধেই সাজাইয়া তুলিলেন। তিন আঙ্গুল পুরু গালিচায় ঘরের মেজে ঢাকা পড়িল, মাঝখানে সবচেয়ে হাল-ফ্যাসানের বিলাতী তৈরি জোড়া-খাট, ছাদ-বিলম্বিত চওড়া কাঠের ফ্রেমে লম্বিত রেশমী নেটের মশারি। খাটের সামনে একখানা সাতফুট লম্বা

বেলওয়ারি আয়না এবং ছোট একটী বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত জাপানী টেবিলে প্রকাণ্ড একটা রূপার ফুলদানে মস্তবড় একটা গোলাপের তোড়া। ঘরের পর্দ্দাগুলাও আন্‌কোরা নূতন ফ্রান্সের আমদানী।

কৃষ্ণা তাহারই জন্য যত্ন-আহরিত এবং সাদর-সজ্জিত এই সকল বহুমূল্য ও তাহার চির-অভ্যস্ত বস্তুজাতের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বুকের মধ্যে কি যে একটা অনিশ্বসিত যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিল, সে যেন সেটা ভাল করিয়া সহিয়া, বহিয়াও বেড়াইতে নিজেকে অক্ষম বোধ করিতেছিল। এই যে সব প্রণয়-নিদর্শন স্তরে স্তরে তাহার চারিদিককে বেড়িয়া থাকিয়া সুস্পষ্ট সোহাগে তাহার চিত্তকে ঘেরিয়া ধরিতে চাহিতেছিল, ওই যে ফুল-গন্ধময় বাতাস তাহারই গায়ের উপর দিয়া যে হাতে ইহাদের চয়ন করিয়া আনিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে সাজাইয়া দিয়াছে, তাহারই হাতের স্নেহের পরশের মতই বুলাইয়া যাইতেছিল, ওই যে বিকশিত ফুল-গন্ধ, সেও তো সেই তাহারই বুকভরা অনুরাগ সুরভির মতই তাহার বুকের বেদনার তারে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের ক্ষতে লবণাক্ত করিয়া দিতেছিল। জানালার পাশে পাশে বাগানভরা বসন্তের ফুলে ফুলে মৌমাছিদের যেন তাহারই এই একনিষ্ঠ চির-সহিষ্ণু প্রণয়বার্ত্তা তাহাকে জানাইয়া দিয়া তিরস্কারের ছলেই গুন্‌গুণানির আর শেষ ছিল না। ইহার মধ্যেও যেন সেই অফুরন্ত প্রেমের গুঞ্জনই তাহার দুই কানের তারে বাজিয়া বাজিয়া তাহাদের বধির করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। চারিদিক দিয়া এতবড় প্রেমের উপাসনা, সে যেন তাহার কাছে অপরাধী চিত্তের মধ্যে সহ্য করিতেও পারিতেছিল না। একটুখানি আড়াল পাইতেই সে একেবারে ছুটিয়া গিয়া বাথরুমের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সেখানেও চোখ তুলিতেই সেই তাঁহারই হৃদয়-মথিত স্নেহের সমুদ্র চারিদিক দিয়া উথলিতেছে, দেখিতে পাইল। এনামেলের নূতন কেনা প্রকাণ্ড স্নানের চৌবাচ্চা, প্রকাণ্ড আয়না, প্রসাধনের যত কিছু মূল্যবান্ বস্তু সভ্য-সমাজে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব, সে সকলি। এমন কি, নূতন কেনা গামছা তোয়ালেগুলি পর্য্যন্ত নব-ক্রীত আল্‌নায় দুলিতেছে। একখানি মাত্র সবুজ রংয়ের চামড়া-আঁটা চৌকির উপর অবসন্নশরীরে বসিয়া পড়িয়া সে কাতর হইয়া কাঁদিল।—

যখন ঘণ্টা-দুই পরে তাহারই জন্য নব-নিযুক্ত আয়া আসিয়া দ্বারের কাছ হইতে তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুমতি চাহিল, তখন চৌবাচ্চা হইতে এক আঁজ্‌লা জল লইয়া তাড়াতাড়ি চোখে মুখে দিয়াই কৃষ্ণা ধড়-মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, একটীও কথা না কহিয়া হতবুদ্ধি নবসেবিকার পাশ দিয়া সোজা ড্রইংরুমেই ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে তখন তাহার বিলম্ব দেখিয়া মিঃ লাহা তাহার পথশ্রান্ত ও কিছু অসুস্থ পিতাকে চা প্রভৃতি খাওয়াইয়া এখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে একটা শ্যাম্পেন গ্লাস ভরিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সেইটি ইচ্ছাসুখে চাখিয়া চাখিয়া পান করিতে করিতে নিমন্ত্রকের সহিত মৃদু-মৃদু স্বরে বোধ করি কোনরূপ বিশেষ কাজের কথাই কহিতেছিলেন। পর্দ্দার কাছে আসিতেই এইটুকু কৃষ্ণার কানে গেল,—"দেখ তরুণ! আমি বলি কি, ওকে অত সমীহ করে চল্‌বার তোমার কিছু দরকার নেই। প্রেভ্‌ জোর করবে। আমি যখন তোমার দিকে রয়েছি, তখন তোমার ভাবনা কিসের? এই ক'দিনের মধ্যেই আমার ইচ্ছা যে—"

কৃষ্ণার নিকটবর্ত্তিতা কিরূপে বলা যায় না—অনুভব করিয়াই সম্ভবতঃ মিঃ লাহা তাঁহার অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক সতর্ক মৃদু-স্বরে কহিলেন, "এখন থাক্।"—

কৃষ্ণা আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রে তাহার দিকে নিমেষমাত্র তীক্ষ্ণ-চক্ষে চাহিতেই তাহার এতক্ষণকার কার্য্য-কলাপ সমস্তই একখানা আয়নার প্রতিবিম্বের মতই মিঃ লাহার মনের চোখে বিম্বিত হইয়া গেল। বেশভূষা তাহার অপরিবর্ত্তিত, এমন কি, মোটরে আসার সময়ে চুলে ও কপালে যে ধূলা জমিয়াছিল, তাহাও ধৌত বা মার্জ্জিত হয় নাই। কেবল দুটি চোক্ ঈষৎ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তিনজনের মধ্যে কোন রকমেই কথাবার্ত্তা জমিল না। পথশ্রমে ও মনের উদ্বেগে অসুস্থ ডাক্তার শীঘ্রই ঘুমাইতে যাইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, কৃষ্ণা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া মিঃ লাহা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, একটু হাসিয়া কহিলেন, "আজকে ওঁর সেবার ভার আমারই নেবার কথা।"—তারপর তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-গৃহে পৌঁছাইয়া একজন ভৃত্যের হস্তে সঁপিয়া দিয়া বোধ হইল যেন ঊর্দ্ধশ্বাসেই বা ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণা ঠিক সেইখানে ঠিক সেই একই ভাবে যেমন তেমনই বসিয়া আছে, উঠিয়া পলাইবার কোন আগ্রহই তাহার সেই নিশ্চেষ্টতার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল না। দেখিয়া মিঃ লাহা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত এবং একটুখানি বিস্ময়ও বোধ করিলেন।

সাড়া দিবার ভাবে একটু কাশিয়া একটা চেয়ারে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা লাগাইয়া মিঃ লাহা অবশেষে তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "তোমার শোবার ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে, বেবি? বেশী ক্লান্তবোধ কর্‌চো কি? আয়াকে ডেকে দিয়ে যাব? না একটু বস্‌বে?"

কৃষ্ণা তাহার ক্লান্ত চোখের তারা ধীরে ধীরে উন্নমিত করিল।—"আয়ার তো আমার আর দরকারই হয় না, বাড়ীতেও তো আমি এখন আমার মাদ্রাজী আয়াটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু একটা হিন্দুস্থানী দাই আছে!"—

মিঃ লাহা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমার বাবার শরীরটা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে—দেখ্‌ছি। তিনি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন, যে তাঁর হার্ট খুব বেশী দুর্ব্বল হয়েছে।"—

কৃষ্ণা শুধু উত্তর করিল, "বোধ হয়।"—তারপর আবার দু'জনেই নীরব।

রাত্রি মধ্য বসন্তের, বাহিরে মৃদু জ্যোৎস্নায় মন্দ-বায়ু-হিল্লোলে মিঃ লাহার পুষ্পোদ্যানে ফুলের মেলা বসিয়াছে। ঐ বাগানের গোলাপ কুঞ্জের ধারে কত সাধ করিয়াই গৃহ-স্বামী একখানি মর্ম্মর-বেদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল, অপরাহ্ণে দু'জনে সেইখানে বসিয়া মঞ্জোত্থিত অজস্র সাদা ও হরিদ্রা গোলাপের শোভা ও সুরভির মধ্যে অন্তরের ভাব বিনিময় করিবেন, কিন্তু কোথায় বা সেই কাব্যোচিত কল্পনা, আর কোথায় এই কঠোর বাস্তব!—

অবশেষে মিঃ লাহা ডাকিলেন, "কিষেণ?"

কৃষ্ণা আবার নত-দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে চাহিল!—

"আমার উপর রাগ করে আছ?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কৃষ্ণার বুকে ব্যথা বাজিল, তাহার মানসিক চাঞ্চল্যে দুর্ব্বল বক্ষ মথিত করিয়া চোখের পাতা সজল করিয়া আনিল, বিষাদপূর্ণমুখে সে শুধু ঘাড় নাড়িল,—না।

তবে কেন অমন করে রয়েছ? কেন ভাল করে একটা কথাও কইছো না? কত আশা করেই যে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি, তা' কি একটুও বুঝ্তে পারলে না? সত্যি কি এতদিন পরে এতই অবুঝ হয়ে গেছ তুমি? বোঝনি কি, তুমি আস্চো জেনে মন আমার কি আনন্দেই নেচে উঠেছে!—কি স্বর্গ,—নন্দন মনের মধ্যেই রচনা করে নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করুচি। কিন্তু! আমায় নিরাশ ক'রো না।"

আবার সেই ব্যথিত-কণ্ঠের আঘাত-ব্যথা! কৃষ্ণার সঘন আন্দোলিত চিত্ত দুই বিপরীতমুখী চিন্তার আঘাতে অস্থির হইয়া উঠিবার যোগাড় করিল। আবার সে চোখের জল সামলাইল।—সে আনন্দ যে এখানের ধূলায় বাতাসে ছড়াইয়া গিয়াছে—কেমন করিয়া সে না বুঝিবার ভাণ দেখাইবে? আর এই যে নিরানন্দ-হৃদয়ের সুবিপুল অভিমান-ব্যথা, এও তো কিছু লুকান জিনিষ নয়!—সে নিজেকে বড় অসহায়, বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল।

"বেবি! বেবি! হ'তে পারে, তোমায় আমায় আজ মতের একটা অনৈক্য ঘটেছে। হতে পারে, তাই নিয়ে আমাদের অনেকগুলো আনন্দসরস দিনরাত্রি নীরস তর্ক গবেষণায় নষ্ট করে ফেল্তে হবে। কিন্তু তার জন্তে আমাদের মনের মিল কেন নষ্ট হতে বসেছে? বল,—কথা কও? কি এমন ঘটলো, যার জন্ত তুমি—সেই তুমি আমায় একেবারে সুদূরে ঠেলে ফেলে দিচ্চো? আমার সঙ্গ তোমার বিষ ঠেক্‌চে। আমার ভালবাসা তোমার অবজ্ঞার জিনিষ হয়েছে। আমার ঘর তোমার কারাগার বলেই বোধ হচ্চে। কি আমি করেছি, যার জন্ত এই যে দেখা হলো, তা একবার তুমি চোক তুলে আমার—আমার মুখের দিকে চেয়েও দেখ্লে না, একটি মিষ্টি কথাও আমায় বল্লে না।—" তরুণচন্দ্রের গলা কাঁপিয়া গেল।

কৃষ্ণা এবার জোর করিয়া সকল দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল, মুখ না তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়াই সে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "—আমায় আপনি অনেক দিন ধরে অনেক যত্নই ক'রে এসেছেন, কিন্তু আমায় আপনার এইবারে মাপ করতে হবে।"

কথাটার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই উল্টা বুঝিয়া তরুণচন্দ্র উল্লসিত-আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার একখানি সুগোল হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহ-কম্পিত কোমল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "মাপ কে কাকে করবে বেবি! মাপ করবার তো কিছুই নেই। তুমি ছেলে-মানুষ, আমি তোমায় কতদূর ভালবাসি, সে তুমি সব সময় হয়ত বুঝতেও পার না। যাক্, ও-সব কথা বলে আমি তোমায় বিরক্ত করতে চাইনে। শুধু একটা কথা—তোমার বাবা আমার কাছে আজ একটি প্রস্তাব করেছেন। তিনি বল্লেন, তিনি তোমাকেও তা বলেছেন!—" একটু নীরব থাকিয়া মিঃ লাহা জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া ফেলিয়া পুনশ্চ যোগ করিলেন—"তাঁর ইচ্ছা—এইখানে এই হপ্তার মধ্যে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান, বিয়ে অবশ্য হিন্দুমতেই হবে। তোমার কি মত?" মিঃ লাহা কৃষ্ণার হাতখানা নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে ঈষৎ আবেগভরে নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।—

বাঘের থাবার মধ্যে হাতটা অকস্মাৎ গিয়া পড়িয়াছে জানিলে মানুষ যেমন আঁৎকাইয়া

উঠিয়া সেটা সবেগে টানিয়া লয়, তেমনি করিয়া মিঃ লাহার হস্তমধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কৃষ্ণা নিজেরও কতকটা অজ্ঞাতে খানিকটা সরিয়া বসিল। দেখিয়া মিঃ লাহা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন ও দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "বুঝেছি, তোমার মত নেই;—সে আমিও জানতুম,—ও কি, অমন করে চাইচো কেন?—তুমি মনে করচো, তোমাদের এখানে নিয়ে এসে আর তোমার বাবাকে সহায় পেয়ে, তোমাকে ছলে-বলে আমি আত্মসাৎ করে নোব। তাঁকেও বলেছি,—তা আমি করবো না। তা করলে এতদিন, যখন তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ হয়নি, তখনি তার জন্য চেষ্টা করতাম। আমি চাই, তুমি ভালবেসে আমায় তোমার নিজের হাতের বরণ-মালা আমার গলায় আদর করে পরিয়ে দেবে। আমি তো শুধু স্ত্রী চাইনে। সে তো আমার ঘরেই আছে। আমি তোমার যে হৃদয় এতদিন পেয়েছিলুম, সেইটুকুই ফিরিয়ে পেতে চাই। যদি তোমার মত না থাকে, না হয় বিয়ে তোমার ইচ্ছামত আমার পূর্ব্ব-স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই হবে। এখন শুধু একটি কথা,—একবার নিজের মুখে তুমি আজ আমায় এইটুকু বল যে, তুমি আমায় ভালবাস। তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করবো, যতদিন বলবে অপেক্ষা করবো।" কৃষ্ণা এতক্ষণে যেন কতকটা সাহস পাইয়া কহিল—"তবে আমারও কিছু বলবার আছে।"

"বলো।"

"বলি,—" বলিয়া একটুখানি থামিয়া তারপর কৃষ্ণা নতনেত্রে আরম্ভ করিল—"আপনি দেখতেই পাচ্চেন, আমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। আমি আমার পূর্ব্বাভ্যস্ত জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে, এখন হতে সহজ সাধারণভাবে চলতে চাই।"

মিঃ লাহা শুধু বলিলেন, "বেশ!"—

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"অন্তঃসারশূন্য দেউলে পড়া বড়লোকত্ব দেখান আমার চক্ষে এখন অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আর তার পক্ষে সব চেয়ে সহজ যা পথ তাই-ই আমি নিয়েছি। বিলাসিতার সর্ব্বপ্রকার প্রশ্রয়দাতা বিদেশী-ধরণের জীবনযাত্রা ও তার জন্য বিদেশী-শিল্পের যতদূর সম্ভব সংস্রব বর্জ্জন আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।"—

মিঃ লাহা শান্তভাবেই কহিলেন,—"আচ্ছা।"—

কৃষ্ণা এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে এলে আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি? আপনি তা সইতে পারবেন কি? তাই বলচি যে, আমাদের দুজনের পথ যখন বিভিন্ন, তখন আমাদের এক না হওয়াই ভাল! কেমন, এই না?"

"বেবি! তোমার গায়ের ওই দু'দিন পরা মোটা গড়াখানা কি তোমার এই আট বছরের পরিচিত আমার চেয়েও বেশী প্রিয় হয়ে উঠলো? এই শেষ তিন বৎসর ধরে যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একদিনের একটা হুজুকে পড়ে তাকে তুমি এত বড় অপমান করতে পারবে? কিন্তু তুমি পারলেও তো আমি পারবো না। কাজেই যদি শুধু বাড়ীর মধ্যে এই রকম থেকে বাইরে আমার মর্য্যাদার জন্যে রাজী হও, আমি তোমার খাতিরে তাও না হয় সইবো, তা বলে তো তোমার মত অনায়াসে এত দিনের প্রেমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।—তুমি জানো, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তোমায় আমি কেমন করে মতের জন্য আমার জীবন থেকে বিদায় দিই?"

"কিন্তু"—

"আবার কিসের 'কিন্তু'? একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে তার নিজের বাড়ীতে 'খদ্দর' ব্যবহার করতে দেওয়ার দায়িত্ব কত বড়, তারও আজ আন্দাজ করতে ভুলে গেছ?"

"আরও বাধা আছে। আপনি দয়া করে আমার উপর থেকে আমার বাবার না বুঝে-সুজে কথা দেওয়া ফিরিয়ে নিন্, আর অবুঝ, অবোধ সংসারানভিজ্ঞ সামান্য স্ত্রীলোক জেনে আমায়ও ক্ষমা করুন। আমাদের যে অলীক অসম্ভাবিত সম্বন্ধের প্রত্যাশায় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার জন্য—আপনার কথাতেই বলি, সকল সমাজের সব লোকেই নিন্দা করচে, সেটা থেকে আমায় মুক্তি দিন, আমাদের দু'জনেরই পক্ষে সাধারণের হাস্যাস্পদ সে অবস্থাটা মোটেই প্রার্থনীয় নয়। আমায় ছেড়ে দিন্, আপনার স্ত্রীকে ভগবান্ বাঁচিয়ে রাখুন, আমি কেন কাক-শকুনির মত তার মৃত্যুর পথ চেয়ে থাক্‌বো।"

মিঃ লাহা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে অসহিষ্ণুভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু লোক-নিন্দা যদি কিছু উঠেই থাকে, আজ আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই কি সেটা থেমে যাবে?"

কথাটার মধ্যেকার নির্ঘাত সত্যের তীক্ষ্ণ খোঁচাটা বিঁধিয়া কৃষ্ণার মুখের ছবি ম্লান হইয়া আসিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বিজয়-দৃপ্ত-চরণে একটুখানি কাছে আসিয়া উঁচু-গলায় আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে মিঃ লাহা পুনশ্চ কহিলেন, "ভেবে দেখ বেবি! এখন যদি আমরা নির্লিপ্ত হয়ে সরেই থাকি তাতে আমাদের নামে যদি কোন দাগ পড়ে থাকে, সে কোন দিনই আর মুছা যাবে না। চিরদিনের জন্যই অনর্থক সাধারণের মনে একটা দাগ থেকে যাবে। থাক্, আজ তুমি ক্লান্ত হয়েছ যাও বিশ্রাম করগে। আর একদিন তখন শান্তভাবে এ সব কথার আলোচনা কর্‌লেই হবে।" মিষ্টার লাহা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই তিন পরের একটা অপরাহ্নে মিঃ লাহার সযত্নরক্ষিত গোলাপলতায় যখন সাদা ও হল্‌দে গোলাপের আশ্চর্য্য প্রাচুর্য্যে পথগামী পথিকের নেত্র প্রশংসার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া থাকিতেছিল, তখন সেই লতাবিতানের পাশে গৃহস্বামী তাঁহার সুন্দরী ও তরুণী অতিথিটীকে লইয়া নিজের সমস্ত অন্তর ও বাহিরে ঐশ্বর্য্যের জাল পাতিতে ব্যস্ত। লতানিয়া বৃক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত পুষ্পক্ষেত্র ব্যাপিয়া মণ্টিকৃষ্ণ, ভিক্টোরিয়া চায়না-রোজ, মার্শেল নীল, কুইন, মসরোজ, মাস্করোজ ইত্যাদি নানা মনোরম ক্ষুদ্র ও সুবৃহৎজাতীয় শ্বেত রক্ত হরিদ্রা বিচিত্র গোলাপী ও মিশ্রবর্ণের গোলাপ গাছ অপূর্ব্ব শোভায় আপ্রান্ত ভূষিত হইয়া আছে। এদিক্ ওদিকে শ্যামল তৃণাস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তখনও পপি, ডেফোডিল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঋতুপুষ্প বর্ণবৈচিত্র প্রদর্শন করিতেছিল। অদূরে কয়েকটা কলমের আমগাছ নবোদ্গত মুকুলের সুবাসে স্থানীয় মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি ও পাখীর দলের উৎসব-মন্দিরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ফুল ও ফলের অদৃপ্ত আলোচনা হইতে সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হঠাৎ মিঃ লাহা বলিয়া উঠিলেন, "তোমার আয়ার কাছে শুনলুম, তুমি তাকে কিছুই কর্‌তে দাও না, নিজে নাকি বিছানাতেও শোও না,—একি সত্যি বেবি?"

কৃষ্ণা প্রথমটা জবাব না দেওয়াই স্থির করিয়া থাকিয়া পরে মৃদুহাস্যের সহিত উত্তর দিল, "আপনি যে শোবার পথ বন্ধ করেই ব্যবস্থাটা করে রেখেছেন।"

"আমি!—কি করেছি?"

"সবই যে আন্‌কোরা নতুন বিলিতি জিনিস কিনে এনেছেন, কাজেই দেশী গালচেখানাতে বোম্বাই মিলের চাদর পেতে শুতে হয়।"

মিঃ লাহা ঈষৎ বিরক্তি-তিক্ত-স্বরে কহিলেন,—"কিন্তু তোমার নিজের শোবার ঘরে যে ঠিক ঐ রকমই খাট বিছানায় তুমি শোও, সে ত' আমি তোমার অসুখের সময় দেখে এসেছি।"

কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিল,—"তখন তো আমি ফ্রেঞ্চ বা চায়না সিল্ক ভিন্ন আটপৌরে পোষাক কমই ব্যবহার করতুম।"

মিঃ লাহার ললাটে নেত্রে ক্রোধের রেখা সুব্যক্ত হইলেও ক্ষণকাল পরে তিনি যখন কথা কহিলেন, তাহাতে উহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না।—"আমায় বল্‌লে না কেন? তা' হলে সেই রাত্রেই আমি তোমায় জন্য একসেট্ 'খেরোর'ই বিছানা না হয় আনিয়ে দিতুম।"

তাঁহার স্বরে কিছু অভিমান ও অনেকখানি বিদ্রূপ প্রকটিত হইল। কৃষ্ণা তাহা বুঝিয়াই তাঁহারই সান্ত্বনার হিসাবে একটুখানি সহানুভূতি দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, "আমার জন্য বড্ড তো দুঃখ করচেন, আর নিজের কি দশা? একটি ছোট্ট ঘরে, একখানা দেড়হাত চওড়া ক্যাম্প খাটে, নাকের উপর একটা মশারি ঝুলিয়ে বড্ডই বুঝি আরামে ঘুম হয়? পাশ ফিরতে গেলেই পড়ে যাবার ভয় করে না?"

তরুণের মুখ সুখের প্রসন্নতায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে তাহা হইলে তাহার এই আত্মত্যাগ দেখিতে পাইয়াছে! দেখিয়া অন্তরে অনুভব করিয়াছে! তবে তো কষ্ট সার্থক? মৃদু-হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন,—"অভ্যাস করচি, না হলে এর পরে কম্বল শয্যা সইবে কেন? —কথাটার গূঢ় নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেই কৃষ্ণার হাসি-মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল।

সে রাত্রে মিঃ মল্লিককে তাঁহার ঘরে রাখিয়া মিঃ লাহা নিজের সেই ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহটির উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে ড্রইংরুমের মধ্যটায় একবার উঁকি দিয়া যাইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণা তখনও উঠিয়া যাই নাই।—লোভে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া সেই ঘরে আসিলেন। এ কয়দিন সে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া যাইতেছিল।

মিঃ লাহা আসিয়া হাসি-মুখে বলিলেন, "কি বেবি! আজকের নূতন খদ্দরের বিছানায় যেতে ভেবে অস্থির হচ্চো যে! মোটা ও কোরা চাদরের গন্ধে ঘুম কিন্তু আজ হবে না, তা' বলে রাখ্‌ছি।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিতেই মিঃ লাহার মুখের আলো তাহার ছায়াপ্রতিহত হইয়া প্রায় কালো হইয়া আসিল। তিনি দুই পদ পিছাইয়া গিয়া যেন কঠিন আঘাত প্রাপ্তের ব্যথিত-কণ্ঠে সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "বেবি! বেবি! তুমি কাঁদ্‌ছিলে?"

কৃষ্ণার চোখ দিয়া তখনও ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা রোধ করিতে চেষ্টাই করিল না, অথবা করিতে পারিল না, তা' বলা যায় না। দেখিয়া নিজেদের

মাঝখানের এ'কয়মাসের সকল ব্যবধান ও বিরাগ সব বিস্মৃত হইয়া গিয়া তরুণচন্দ্র তাহার সোফার পাশেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবার জন্য তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখ তুলিতে গেলেন। "বেবি! আমি সব পারি, শুধু তোমার চোখের জল আমার অসহ্য! কেন কিষেণ! অমন করে কাঁদ্‌চো কেন?"—

আস্তে আস্তে তাঁহার হাতের স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া নিজের আঁচলেই মুখ মুছিয়া ফেলিয়া অশ্রুজলে-ভেজা কাতর-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, "মিঃ লাহা! আমাদের মধ্যে সে পুরনো দিন, যখন আর ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌চিই না, তখন এমন করে শুধু সেইগুলি নিয়ে থেকে দু'জন-কারই ক্ষতি হচ্চে,—আজ থেকে আপনি আমায় ছুটী দিন্, আমি আপনার কাছে এই জোড়হাত করে মুক্তি-ভিক্ষা চাইচি, আমায় মন থেকে বিদায় দিন্ আপনি। আপনার অনেক টাকাই বাবার কাছে পাওনা, আমি তা' জেনেছি। সে টাকা আমাদের বাড়ী বেচে আপনি নিয়ে নেবেন। শুধু বাবার জীবনের ক'টা বচ্ছর আপনাকে একটুখানি অপেক্ষা কর্‌তে হবে। তারপর যখন খুসী আপনি—"

মিঃ লাহা এতক্ষণ পরে বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়া যন্ত্রণাবিদ্ধ উচ্চ-কণ্ঠে বাধা দিলেন, "তারও পর? তারপরও—তোমার এই হৃদয়হীন খেলার অবসান হবে না? বেবি! বেবি! কি তোমার মনের ভাব আমি আজ একটু স্পষ্ট করে জেনে নিতে চাই!—এমন করে বুক তুমি আমার কেন যে দু'পায়ে মাড়িয়ে মড়্‌মড়িয়ে ভেঙ্গে দিচ্চো, এর কি অন্য কোন কারণ আছে? অথবা শুধুই তোমার এ একটা নির্দ্দয় খেয়াল?"

অনেকক্ষণ ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। মিঃ লাহার কথাগুলা সে ঘরের বাতাসে যেন বহুক্ষণ মূর্ত্ত বেদনার মতই ধ্বনিত রহিল, তারপর কৃষ্ণা নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল,—"আপনার সঙ্গে আমার বাগ্‌দান ফিরিয়ে নিন্, আমাদের—আমাদের বিয়ে কোন দিন হতেই পারে না!"

মিঃ লাহার দুই চোকের মধ্যে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহার বক্ষের মধ্যে গুপ্তঘাতকের ছুরি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তিনি যথাসাধ্য স্থির থাকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—"আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও না?"

কৃষ্ণা অত্যন্ত মৃদু-স্বরে উত্তর দিল, "না!"

"কেন, তা' জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "পারেন", কিন্তু কথা কহিতে তাহার একটু বিলম্ব ঘটিল।—সে বলিল, "প্রথমতঃ আপনার ও আমার জীবনের লক্ষ্য ও পথ ঠিক্ আর এক নেই।—আপনি একজন গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, আপনি রিপ্রেসনের পক্ষে—আর সেই রিপ্রেসন আমাদেরই উপর। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবাহিত হই, তা' হলে সে মিলন শুধু কি দৈহিক মিলনই হবে না—যাতে আপনার রুচি নেই ব'ল্‌ছিলেন?"

মিঃ লাহা ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—"বেবি! তুমি কি মনে কর, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তোমরা দু'চারটে ছেলেমেয়ে মিলে একটা হৈ চৈ কর্‌লেই, সেটা গুঁড়িয়ে পড়ে যাবে? জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অজেয় ব্রিটিশ-সিংহ তোমাদের মত অসহায় গর্ত্তের ইঁদুরের উৎপাতে

সোনার খনি ভারত-সাম্রাজ্যের সৌরসী-পাট্টা তোমাদের হাতে ফেরৎ দিয়ে নিজের বাসায় গিয়ে ঘুমুবে ?"

কৃষ্ণা ঈষৎ লজ্জাবোধ করিলেও দুর্ব্বলতা অনুভব করিল না, সে সাগ্রহে বলিল,—"তা' করিনে; সেইজন্ত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ আমরা তো করতেও চাইচিনে। আমরা, দুর্ব্বলের মধ্যেও যে একটা প্রবল শক্তি আছে,—ইউরোপীয় অনেক জাতিই যাকে সহায় করে উঠেছে, সেই একমাত্র সঙ্ঘ শক্তিকেই কেন্দ্রীভূত করতে চাইচি। যথার্থতঃ এতে ন্যায় ধর্ম্ম বা আইন কিছুই বাধা দিতে পারে না। এতে কারু উপর কোন অত্যাচার নাই, অথচ নিজের দেশের পক্ষে উন্নতির অপর্য্যাপ্ত আশা রয়েছে। এর একমাত্র ঐ বিদেশী শিল্পের নিতান্ত আবশ্যকীয় কল-কব্জা বই যন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি ছাড়া আর সব বর্জ্জনেতেই যে এই গরীব দেশের গরীব জাতের কত লাভ, তা' আমি নিজে এই চার মাসের মধ্যেই প্রভূত রকমে জানতে পেরেচি। এ চার মাস আমার বাবাকে আপনার কাছ থেকে এক পয়সাও ধার নিতে দিইনি, সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চেন ?"

মিঃ লাহা শেষ-কথাটা কানেই আনিলেন না, পূর্ব্বালোচনার অনুসরণে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা বেবি! এই জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে তুমি কি ইউনিটির যথার্থ আশা করো ? যে দেশের দুটো লোকের মধ্যে একতা নেই, তাদের সবাইকার মনে দেশাত্মাবোধ জাগ্‌বে, এবং তারা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করে, সঙ্ঘবদ্ধ হবে, এটা কি তোমাদের আকাশ-কুসুম নয় ?"

কৃষ্ণা কহিল,—"দেখুন, সংসারে আকাশ-কুসুম কি, আর কি নয়, তার কথা কেউ আগে থাক্‌তে বল্‌তে পারে না। জাতিভেদ প্রভৃতির কথাও আমরা ইংরেজ প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে শুনে কপচাচ্চি, ওর কোন ভিত্তি নেই। এই দেশেই চিরদিন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাগ্দী পাইক ছিল ও আছে। দরকার হলে তারা মনিবের জন্য প্রাণ দিয়েওছে এবং দিচ্চেও। আবার জাতিভেদ-হীন মোগল-পাঠানও পরস্পরের বুকে শতাব্দি শতাব্দি কাল ধরে ছুরি মারামারি করতে ক্রটি করেনি। ইউরোপের ইতিহাসেও বাহ্যতঃ জাতিভেদহীন জাতির পরস্পরে ও ঘরে ঘরে গলাকাটা-কাটির রক্ত ছড়াছড়ি কম যাচ্চে না, তবে আমাদের দেশের পুরান শিক্ষা দীক্ষায় শোণিত-তৃষ্ণাটা কম থাকায়, বিষয়-বৈরাগ্যটা বেশী থাকায়, অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা নূতন শিক্ষকদের হাতে পড়ে যখন নূতন হয়ে গড়ে উঠ্‌ছে এবং অবস্থাও যখন প্রাণ-সঙ্কট হয়ে দাঁড়াচ্চে, তখন একাত্মতা যে আস্‌তেই হবে। তা' হোক্ ত্বরিতে, হোক্ বিলম্বে। না এসে আর উপায় নেই।"

ঈষৎ একটুখানি কৃপার হাসি তরুণচন্দ্রের ঠোঁটের আড়ালে চকিত হইয়া মিলাইয়া গেল, শিশুর প্রলাপকে বিজ্ঞ-ব্যক্তি যেমন সকরুণ স্নেহে সহিয়া লইয়া থাকেন, তেমনি করিয়াই এই সব জটিল সমস্যার সমাধান চেষ্টা না করিয়াই তিনি কথা উল্টাইয়া কহিলেন, "তা না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, একদিন তোমাদের স্বপ্নই সফল হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তার মাঝখানে, ততদিন পর্য্যন্ত কি বিরুদ্ধ মতের পিতাপুত্র একত্র হবে না ? স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকবে ?"

'স্বামী-স্ত্রী' কথাটা কৃষ্ণাকে অত্যধিক উত্তেজিত ও বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে উদ্ধত-স্বরে উত্তর দিল, "স্বামী-স্ত্রী এ অবস্থায় পড়লে কি করবেন, তা' তাঁরা ভেবে দেখুন গে, কিন্তু আমাদের

অবস্থা এখনও অতটা সঙ্কটাপন্ন হয়নি, তাই আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, এতবড় মতদ্বৈধের মধ্যে আমাদের মিলিত হওয়া উচিত নয়।"

"কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রয়েছে, তখন এটুকু বিরোধকে আমরা অন্ততঃ একটুখানি সহনীয় করে নিয়েও অনায়াসে ঘরকর্‌না কর্‌তে পার্‌বো। উভয়পক্ষ থেকেই না হয় কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করা যাবে, কি বল? আর দেখ, ভালবাসা জিনিষটা বাইরে থেকে হঠাৎ একদিনে পাওয়া যায় না; নিশ্চয়ই যথাকালে তার আবির্ভাব হবে, যদি এখন তার অভাব যথার্থই ঘটে থাকে, আমার বিশ্বাস যে তা' ঘটে নি।"

কৃষ্ণা সঙ্কুচিত-স্বরে কহিল, "সেটা আপনার ভ্রান্তিও হতে পারে ত'?"

"কোনটা আমার ভ্রান্তি বেবি? তোমায় ভালবাসা? অথবা আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? ওঃ! তুমি কি আমায় আজ বোঝাতে চাও যে, এই তিন বৎসর ধরে তুমি আমার সঙ্গে যে আচরণ করে এসেছ,—সে সমস্তই তোমার ছলনা?"

নিজেকে অবমানিত বোধ করিলেও এই আঘাতের কোন কঠিন প্রত্যাঘাতই সে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। শুধু অপরাধী-ভাবেই কহিল, "নিজের মন হয়ত' আমি জান্‌তুম না।"

যন্ত্রণাহত কাতর মুখচ্ছবি লইয়া তরুণচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুষ্ট-ব্যঙ্গের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় যে কখনও ভালবাসনি, এটা এখন কেমন করে হঠাৎ জানতে পার্‌লে? বেবি! বেবি!—কিষেণ! আজ দীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই কথা তুমি আমায় বল্‌লে? আমায় কখন ভালবাসনি? কখনও না? কখনও না! এই কি সত্যি?"

কৃষ্ণার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল, রুদ্ধস্বরে কহিল, "আপনি—যে ভাবে বল্‌চেন, তেমন করে বোধ করি কখনই বাসিনি। তা' হলে—"

"হ্যাঁ, 'তা' হলে' কি আর এমন নির্ম্মম আঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে দিতে পার্‌তে!—এই বোধ হয় তোমার দ্বিতীয় আপত্তি? বেশ,—আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল ভোরেই আমায় মফস্বল বেরুতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে—তোমার তৃতীয় বাধার কথাটাও শোনা যাবে!—যাও—আজ শোওগে যাও।—তোমায় খুসী কর্‌বার বৃথা-চেষ্টায় অনেকগুলো টাকার 'চটি-ক্যাম্বিস্‌'ও কিনিয়ে আনিয়েছিলুম, আমার উপর দয়া করে সে ক'টা অন্ততঃ ব্যবহার করো, মাটিতে পড়ে থেকে কষ্ট পেয়ো না।"—

এই বলিয়া মিঃ লাহা নিজেকে জোর করিয়া দমন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধোত্তেজিত উপহাসপূর্ণ কণ্ঠ, তাঁহার হতাশা-ক্ষিপ্ত অন্তরের প্রবল উত্তেজনার গুরুপদক্ষেপে, কৃষ্ণাকে কতক্ষণের জন্যই যেন সেখানের জমিতে অচল করিয়া দিল, তথাপি অন্তরের মধ্যে সে যেন আজ অনেকখানি লঘুবোধও করিল। বোধ হইল যেন একটা অক্ষমনীয় জুয়াচুরির হাত হইতে সে নিজেকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনটাই সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের নিকট বিষতিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মোটরে বাহির হইবার সময়েই গাড়ির দরজাটা কষিয়া থাকার জন্য মোটর-ক্লীনারটারকে বুটের একটা ঠোক্কর

মারিয়া গাড়ি চড়িলেন, পথে একটা ছাগলছানার ঘাড়ের উপর দিয়া গাড়িখানা সগর্ব্বে চলিয়া আসিলে, সোফারটা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি তিরস্কৃত হইল। যে মোকদ্দমাটার তদারকে গিয়াছিলেন, তাদের সেদিন লাঞ্ছনার আর অবধি রহিল না। সাক্ষীদের মধ্যে যে দুজন খদ্দর পরিয়া আসিল, তাহাদের সাক্ষ্যে "অবিশ্বাস্য"—এই চিহ্ন দিয়া রাখিলেন!—ফিরিবার পথে একদল স্কুলের ছেলে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া একটুখানি স্ফূর্ত্তি করিয়া লইতেছিল, সঙ্গের পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টরকে হুকুম দিলেন, "রাজদ্রোহসূচক শব্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবমাননা দেখাইবার জন্যই বিশেষভাবে করা হইয়াছে, অতএব উহাদের গ্রেফ্‌তার করা দরকার।"

বাড়ী ফিরিতেই দেখা গেল, ফটকের সাম্‌নে একটা ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত ভিখারী তারস্বরে ভিক্ষা চাহিয়া চেঁচাইতেছে, তাহার এবং তাহাকে এতক্ষণ তাড়াইয়া দিতে অসমর্থ দরওয়ানটার পিঠে চাবুকের দুই চারিটা ঘা পড়িল; এবং রাত্রে চুরির মতলবে যে ভিখারীগুলা দিনের-বেলায় ভাগ্যবানদের ঘরের খবর লইতে আসে, তাহাকে থানায় পাঠান হইয়া গেল। বুট খুলিতে গিয়া সাহেবের মুখ দেখিয়া বেয়ারাটা তাই-শুদ্ধ লাথি খাওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইতে থাকিলেও কিন্তু তাহার কোন্ সঞ্চিত পুণ্যবলে সে বেচারা রক্ষা পাইয়া আড়ালে গিয়া হাঁপ লইল।

অপরাহ্নে চায়ের টেবিলে কৃষ্ণার সহিত দেখা হইল। মিঃ মল্লিক অনেক আদর-আপ্যায়নে সকাল-বেলার পথশ্রম ইত্যাদির বিষয়ে খুঁটিয়া নিংড়াইয়া খবর জানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এত বড় কার্য্যের দায়িত্ব, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিলেন; কিন্তু নীরব শ্রোতাযুগলকে লইয়া তাঁহার নিজের অধ্যবসায় বজায় রাখা দায় হইল। আহারান্তে কৃষ্ণা উঠিয়া চলিয়া গেলে, মিঃ মল্লিক ডাকিলেন—"তরুণ!"

"আজ্ঞে!" বলিয়া জবাব দিয়া মিঃ লাহা একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

"বেবির জন্য বড় ভাবনায় পড়েচি বাবা।"

"হু"—বলিয়া তরুণচন্দ্র পুনশ্চ নিজেরই চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া রহিলেন।

"সে কালই বাড়ী ফির্‌তে চায়। বলে, সে নাকি তোমাকে সব কথাই বলেছে; তুমি নাকি আর তার চলে যাওয়ায় অমত কর্‌বে না।—আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথাই সে আমায় আজ বলেচে।—আমায় মেরে ফেলেচে!"

আগ্রহহীন নীরস-কণ্ঠে মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেচেন?"

"সে নাকি তোমায় বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না, আর এই কথা নাকি তোমার মুখের উপরেই সে বলে দিয়েছে?—পাগল হয়ে গেছে তরুণ! মেয়েটা বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে!"

ডাঃ মল্লিকের কণ্ঠে বিলাপের করুণ মূর্চ্ছনা শ্রুত হইল। "কত বোঝালুম, বল্লুম—তোর জন্য শেষটায় আমায় গুলি খেয়ে মর্‌তে হবে দেখ্‌ছি। তাতে ও তার ওই এক কথা! কিন্তু আমি যে এই ঋণের বোঝা ঘাড়ে করে রাস্তায় কেমন করে দাঁড়াব; আমার দেশহিতৈষিণী মেয়ে সে কথার ত কোন জবাবই দেন না! বলেন কি জানো? আত্মগর্ব্বে মেয়েটা বলে কি না,—'চিরদিন কি সবার সমান যায়? গরীব হয়েছি, তাতে লজ্জা কিসের? বাড়ী বেচে গরীবের মতনই থাক্‌বো'।—সে না হয় তুই পার্‌তে পারিস্—তোর সখ, আমি সে পার্‌বো কেন বলো দেখি?"—বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ সম্ভাবনায় গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়া মিঃ মল্লিক ভূতভয়াহত

অসহায় শিশুর মতই ফোঁপাইতে লাগিলেন। "মাই বয়! মাই বয়! হোয়াট্ অ্যাম্ আই টু ডু? হোয়াট্ উইল বি কম্ অক্ মি!"

মিঃ লাহা নিজের মনের পূর্ণ বিরক্তি ও ক্রোধ দমনে রাখিয়া উঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি যতক্ষণ আছি, আপনাকে আমি দুঃখ পেতে দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—আপনার মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বার আর কোন কারণ দেখালেন?"

ডাক্তার-সাহেব মহা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কারণ আবার ও দেখাবে কি? অকারণ শুধুশুধুই আমাদের দুঃখ দেবে বলেই দিচ্চে বই তো নয়। বলে, 'ওঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।' আরও বলে, 'বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাগ্দত্তা হয়ে থাকার লজ্জায় আমি ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতেই পারিনে।' যে পাত্রের হাতে পড়বার জন্যে ভদ্র-সমাজের সমস্ত আইবড় মেয়ে আকুল হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে ওঁর নাম লোকের মুখে উচ্চারিত হতে শুন্‌লে উনি নাকি 'লজ্জায় মরে যেতে চান!' উঃ, কি ভয়ানক কালসাপকেই আমি গায়ের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছি! সর্ব্বস্ব খুইয়ে মানুষ করেছি! ওঃ কি অকৃতজ্ঞ, কি স্বার্থপর সন্তান!"

মিঃ লাহা এই সন্তপ্ত পিতাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য পর্য্যন্ত না বলিয়াই একটা সিগার ধরাইয়া নিতান্ত অন্যমনস্কে সেটা ধীরে ধীরে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আবার একটা কাতরোক্তি শোনা গেল, "তরুণ? চলে গেলে বাবা?"

"আজ্ঞে, না,"—বলিয়া মিষ্টার লাহা ফিরিয়া বসিলেন।

"তুমি কি ওকে ছেড়ে দেবে? ওরই একগুঁয়েমীর—স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভেসে যেতে দেবে? ওকে টেনে তুল্‌বে না?"

"আমি কি কর্‌তে পারি বলুন?"

"তোমার যা খুসী! আমি তো ওকে তোমার হাতেই দিয়েছি।"

মিঃ লাহার অধরপ্রান্তে একটু দুঃখের হাসি দেখা দিল, "আপনার দেবার ক্ষমতা নেই, আপনার মেয়ে নাবালিকা নয়।"

"ওঃ!" বলিয়া এই শেষ আশ্বাসভঙ্গে ডাক্তার-সাহেব একেবারে যেন এলাইয়া তাঁহার আরাম-চৌকিটার গায়ে হেলিয়া পড়িলেন। "তা হলে ওরই জিদ্ বজায় থাকবে? কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল বে-আইনী হাঙ্গামাকারীর দলে মিশে হয়ত কোন্ দিন জেলেও ত যেতে পারে? অ্যাঁ! তরুণ! তুমি ওকে এ লজ্জা, অপমান থেকে রক্ষা কর, বাবা!"

বৃদ্ধ অন্ধ হাতড়াইয়া মিঃ লাহার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিবার জোগাড় করিলেন। "সেভ্ হার—মাই চাইল্ড্!"

তাঁহার গ্লাসে খানিকটা পানীয় ঢালিয়া দিয়া মিঃ লাহা উঠিয়া পড়িলেন, স্থির-স্বরে কহিলেন, "আমি তাকে রক্ষা কর্‌বো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভোর-বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গরম বোধ হওয়ায় খোলা জানালার কাছে আসিয়া কৃষ্ণা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দিনের আলো তখনও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারেরও জমাট্ ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। নৈশ-নীরবতা তখনও চরাচরের বক্ষকে শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষ-রাত্রের মুমূর্ষু জ্যোৎস্না-ধারায় দূরের গোলাপ-বিতান যেন শুভ্রবসনা-

চ্ছাদিতা বৈরাগ্য-বেশধারিণী নারীমূর্ত্তির মতই দেখাইতেছিল। সরকারী রাস্তা-ধারের যেন সমান করিয়া ছাঁটা সুবৃহৎ অশ্বত্থ, বট ও পাকুড়ের শ্রেণী ঘন অন্ধকার গায়ে মাখিয়া মানুষের হাতে-গড়া প্রাচীরের মতই দেখাইতেছে। স্তব্ধ রাজপথ হইতে কদাচিৎ একখানা গো-যানের বা পথবাহী পথিকের আসা যাওয়ার সাড়া ক্বচিৎ উঠিতেছিল। ভারাক্রান্ত-চিত্তে বাগানের ভিতর চাহিতেই কৃষ্ণার দুই চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। কে একজন পুরুষমূর্ত্তি না—গভীর শব্দহীনা স্তব্ধরাত্রে একাকী বিনিদ্রনেত্রে ঊর্দ্ধে তারকাখচিত আকাশে চাহিয়া ধীরপদে পরিক্রমণ করিতেছে! নক্ষত্রালোকে এই সুপরিচিত দীর্ঘমূর্ত্তি কৃষ্ণা একবার চাহিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। কাহার চিন্তায় সেই পুরুষ নিজের সান্ধ্য-সজ্জা বদল পর্য্যন্ত না করিয়া সেই প্যান্ট-কোট, সেই টাই-কলার, এমন কি পায়ের ভারি জুতা জোড়া পর্য্যন্ত না খুলিয়া সারা রাতই হয় ত এই রকম পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এ কথা মনে হইয়াই কৃষ্ণার পদনখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন একটা অসহায় কাতরতাপূর্ণ ভয়ে ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। একি কঠিন বেড়াজালের মধ্যেই উহার সঙ্গে তাহার এই অভিশপ্ত জীবন জড়িত হইয়া গিয়াছে! কেমন করিয়া এ পাশ সে ছিন্ন করিয়া লইবে? কেমন করিয়া—ওগো, কেমন করিয়া? অথচ—অথচ না নিলেও এর চেয়েও যে ঢের বড় দুঃখের ঝঞ্ঝায় তার নিজের জীবনের দিবানিশি একাকার হইয়া যাইবে, সেও তো আর মিথ্যা নয়! সেই বা সে সহিবে কেমন করিয়া?

পুরুষমূর্ত্তি বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারই জানালার দিকে আসিতেছে দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া আসিল এবং দেখিতে পাইল, তরুণচন্দ্র সতৃষ্ণ চোখে সেই জানালাটার দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন। তখন নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে সে মুখ যেন বড়ই নিরাশা-কাতর, বড়ই বেদনা-বিধূর মনে হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলা হঠাৎ ঝড় উঠিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আকাশময় এখনও কালোয় সাদায় ধূসরে মেশান বৃষ্টি-আনা মেঘের পুঞ্জ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাছ ভিজা, মাটি ভিজা, পাখীর বাসাগুলি ঝড়ে উল্‌টিয়া গিয়া সেই ভিজা মাটিতে আর্দ্র হইয়া লুটাপুটি খাইতেছে। ঝড়ে ছিঁড়িয়া-পড়া গোলাপবাগানের ফুল ও খসিয়া পড়া রাশিকৃত পাপ্‌ড়ি, তাহাদের পূর্ব্ব-সন্ধ্যার বর্ণ-বৈচিত্র হারাইয়া কাদা-মাখা হইয়া পথের উপর ছড়াছড়ি যাইতেছে। লতাবিতানগুলি ঝড়ের হাওয়ায় লণ্ডভণ্ড, এবং সমরশায়ী বীরের মতই একটা সরল ঋজু দেহ দেবদারু সমুলোৎপাটিত হইয়া পথের উপর পড়িয়া।

প্রাতর্ভ্রমনের পোষাকে বাহিরে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িতে গিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দৃষ্টি সেদিনকার সদ্য আনিত ডাকের তাড়ার উপর পতিত হইল। চাপরাসী, সাহেবকে প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া ছুটিয়া কাছে আসিলে, কাগজ-পত্র উন্টাইয়া এক গাদা সরকারী খাম ও বে-সরকারী সংবাদপত্র ব্যতীত একখানি মাত্র পত্র দেখিতে পাইলেন। সাধারণ ডাকঘরের ছাপান খামের মধ্যে পত্র, উপরে বাংলা অক্ষরে নাম ও ইংরাজীতে ঠিকানা লেখা, চিঠিখানা কৃষ্ণা মল্লিকের নামে। চাপরাশীর হাতে সেখানা ফেরৎ দিতে গিয়া কিসের একটা অনিবার্য্য

লোভে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের চিত্ত একটি বে-আইনী কাজ করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

চিঠিখানা মাত্র পকেটে ফেলিয়া তিনি ঘোড়ার রেকাবে পা তুলিয়া দিলেন এবং অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার বাহন তাঁহাকে পিঠে লইয়া বাগানের পথ ছাড়াইয়া পথে পড়িয়া ছুটিল।

সে চিঠিখানায় এই রকম লেখা ছিল,—

সবিনয় নিবেদন—

আপনি যদিও আপনাকে আমার অ-পছন্দয় মিস্ মল্লিকের বদলে কৃষ্ণা বলে সম্বোধন কর্‌তেই হুকুম দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু সে আদেশটা রাখতে পার্‌লুম না,—দোষ নেবেন না। 'মিস্' বলে এদেশের মেয়েকে উল্লেখ করা আমার কানে ভাল শোনায় না বটে,—অথচ আমাদের মধ্যে ওই রকমের কোন কিছু ডাকবার সহজ পন্থাও তো নেই। সেকেলে লোকেরা হয়ত এ রকম ক্ষেত্রে অনায়াসে বলে বস্‌তেন, "কেন, মল্লিকের 'ঝি' অথবা একটু শুদ্ধ ভাষায় 'মল্লিককুমারী' বল্লেই হয়!"—কিন্তু যতই হোক, আমরা—আধুনিকরা এতদিন ধরে দেশের ঠাকুরের চাইতেও বিদেশী কুকুরের পক্ষপাতিত্ব করে এসে হঠাৎ একেবারে সবখানি উল্টে ফেলে পূরো সেকেলে বনে যাওয়া,—তা আমি যদিও এর খুব পক্ষপাতি আছি,—তবে আপনি কি অতটাই একেবারে বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বেন? বয়সে বড় হলেও না হয় 'দিদি' বলাই যেত, এ ত তারও পথ বন্ধ!

বেশ মজা করে বসে বসে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাড়ী খুব ভোজটোজ তো খাচ্চেন! এদিকে যে বড়বাজারে কলের কুলিরা ম্যাঞ্চেষ্টারকে রাজগী লিখে দিলে বলে! আস্‌ছেন কবে শুনি? মাড়োয়ারি জাতটা মোটেই আমাদের মানে না। তাদের বশ করে রাখতে পারে এক রাজা, আর যদি রাণীর জাতি আপনারাই কিছু পারেন,—দেখুন দেখি চেষ্টা করে?—আসুন—শীঘ্র—শীঘ্র শীঘ্র—ফিরে আসুন। আপনার কর্ম্ম-ভূমি—আর আপনার কর্ম্মসঙ্গীরাও ব্যাকুল-প্রাণে আপনাকেই যেডাকৃচে। আর দেরী কর্‌বেন না।—দোহাই আপনার!—

বিনয় শীল।—

সেদিন ফিরিবার পথে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ঘোড়া ও তার সহিসটা অনাবশ্যকেই কশাহত হইল। সেদিন এজলাসে গিয়া তিনি যখন বিচারাসনে বসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালান্তক যম বলিয়াই মনে হইল। সেদিনকার তিনটা মোকদ্দমার মধ্যে প্রথমটা ছিল এই, স্বামী মাতাল—স্ত্রীকে বৃথা সন্দেহে বেদম মার মারিয়া আধমরা করিয়াছে। স্ত্রীর চীৎকারে পাহারাওয়ালা বাড়ী ঢুকিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে এবং আত্মীয়-গৃহে পৌছাইয়া দেয়। অশুষ্ক ক্ষত-চিহ্ন প্রমাণ দিল, বিশেষ বিশেষ সাক্ষ্য-সাবুদে স্ত্রীর কথাই প্রামাণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু রায় বাহির হইল উল্টা! স্ত্রীর চরিত্র সন্দিগ্ধ, এ ক্ষেত্রে স্বামীগৃহেই তাহার বাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব রায়ের মধ্যে টিপ্পনি কাটিলেন। বিজয়ী বীরের মতই ভীষণ মূর্ত্তিতে স্বামী গিয়া ভয়ার্ত্তা স্ত্রীর হাত ধরিল। এজলাসের বাহিরে পা দিয়াই দম্ভ করিয়া বলিল,—"শুন্‌লি তো, ধর্ম্মাবতার কি বল্লেন? চল্ ঘরে, এবার তোকে কোতল কর্‌বো তবে ছাড়বো।"

দ্বিতীয় মোকদ্দমাটার এই রকম নিষ্পত্তি হইল।—কেরামত সেখ, গাঁয়ের মোড়ল গোছের, সে 'জুমা'র দিনে (শুক্রবারে) তার এলাকার সব মুসলমানকে 'খদ্দর' পরিয়া আসিতে হুকুম দিয়

দেয়। সবাই পরে, পরে নাই শুধু কালেক্টরীর দপ্তরী ফৈজু ও তার কুটুম্বসম্পর্কীয় জনকয়েক লোকে। দ্বিতীয়বারে কড়া হুকুম জারি করা হয়, তাহাতে ফৈজু নাকি গাঁয়ের অনেক লোকের সাম্‌নেই বলিয়া বেড়াইয়াছে যে, ওর হুকুম মান্‌তে গেলাম কোন্ দুঃখে? উনি জেলার জজ না 'মেজেষ্টার?'—এবং নমাজের সময় নূতন কেন ম্যাঞ্চেষ্টারের ছাপ লাগান ধুতি, কুর্ত্তা পরিয়া সে নমাজ করিতে যায়, কিন্তু মস্‌জিদে ঢুকিতে পায় না। তারপর হইতেই তাহারা দুইটি দলবদ্ধ হয়। সেখের দল ফৈজুর দলকে 'এক ঘরে' করে, ইহার মধ্যে ফৈজুর সম্বন্ধী এবং তার স্ত্রীও সংযুক্ত ছিল। অতঃপর মারপিট বেশ রীতিমতই হইয়া গিয়াছে। ক্রোধান্ধ ফৈজু ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হইতে গুণ্ডা জমা করিয়া সেখের দলকে হঠাৎ আক্রমণে জখম করিয়া দিয়াছে।—নিজের সম্বন্ধীকে আধমরা করিয়াছে—খুন অবশ্য কাহাকেও কেহ করে নাই।—শরীরে চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গিয়াছে সম্বন্ধীর আঘাত কিছুই মারাত্মক নহে। বিচারে ফৈজু বে-কশুর খালাস পাইল, 'অত্যাচারীর' দলস্থ জন-আষ্টেক লোক লইয়া দলপতি বুড়া করিম সেখ এক বৎসরের জন্য জেলে চলিলেন, সেখানে তাঁহাকে খাটিতে হইবে।

তিনেরটার কপালে হয়ত' বা কিছু সুখ ছিল, সেটা সিনিয়র ডেপুটীর হাতে চালান পাঠাইয়া দিয়া সাহেব কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। বুক-পকেটের চিঠিখানা তাঁহাকে আর সুস্থির হইয়া বসিতে দিল না।

বাড়ী গিয়া কৃষ্ণাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, সে আসিলে খাম-খোলা চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া সেদিনের বিচারের রায় দেওয়ার মতই মুখ করিয়া তেম্‌নি স্বরেই কহিলেন, "তোমার তিনের নম্বর 'বাধা'র কথাটা তুমি না বল্‌তেই আমার শোনা হয়ে গিয়েছে। অন্যমনস্কে খামটা ছিঁড়ে ফেলেছিলুম,—মাপ করো;—অবশ্য তখন মোটেই সন্দেহ করিনি যে, তারই মধ্য থেকে কাল-সর্প বার হয়ে এসে আমাকেই ছোবল মার্‌বে!"

বলিতে বলিতে কৃষ্ণার মুখ তীক্ষ্ণ অগ্নিবর্ষী চোখে চাহিয়া দেখিলেন, এবং এ'ও দেখিলেন অপরাধের গুরু লজ্জাভারে আনমিত সেই কমনীয় মুখে আরও একটা কোন কিছুর রমণীয়তা অতি গোপন আনন্দে সন্ধ্যাবেলার গোলাপের মতই ধীরে ধীরে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। আর নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কম্পিত আঙ্গুলগুলা চঞ্চল হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই খামের মধ্যের চিঠি-খানাকে টানিয়া লইতে চাহিতেছিল, ইঁহার সান্নিধ্যকেও তাহারা যেন সম্মান বা সঙ্কোচ করিতেও সমর্থ হইতেছিল না এটুকুও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না।

ঈর্ষার শত সহস্র বৃশ্চিকের তীব্র-দংশনে তরুণচন্দ্রের সমস্ত হৃদয় প্রাণ যেন অসহনীয় যন্ত্রণায় ফাটিয়া পড়িতে গেল। তবে এরই জন্য তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভোর হইতে চলিয়াছে!

তৃতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুরবেলা কর্ম্ম-কাজ সমাপনান্তে ধৌত ও মার্জ্জিত রান্নাঘরের দালানে বসিয়া বামুন-মেয়ে থাকির-মা দাসীকে দিয়া টাকপড়া মাথার পাকাচুল বাছাইয়া লইতে লইতে দুজনে মিলিয়া মুনিব বাড়ীর দোষগুণ গুঞ্জনস্বরে আলোচনা করিতে নিবিষ্ট হইয়া আছে। উপরের সেই মোটা মোটা

থামদেওয়া চওড়া দালানের এক পাশে গিন্নির ঘরের পাথরের ঠাণ্ডা মেজের মছলন্দ মাদুর পাতিয়া শোকে ও চিন্তায় অকাল-বৃদ্ধা গৃহিণী দিবানিদ্রায় হাঁতাইয়া পড়িয়া আছেন। যুবতী বধূটী এতক্ষণ তাঁহার গায়ের ঘামাচি খুঁটিতেছিল, এতক্ষণে তাঁহাকে নিদ্রিত এবং নিজের পোষা-বিড়াল রতনমণিকে ল্যাজ দুলাইয়া নিকটে আসিতে দেখিয়া সেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

সেই দালানেই সারি সারি পাখীর খাঁচা ঝোলান। তাহার গলার সাড়া পাইয়াই একটী লোহার খাঁচায় বদ্ধগলায় তিন-রঙ্গা তে-নরির কণ্ঠি-আঁকা চন্দনা আধহাত লম্বা পুচ্ছ নাচাইয়া শব্দ করিয়া উঠিল, "রূপু! রূপু! রূপু!"

উর্ম্মিলার কক্ষতলে সোহাগী বিড়ালীটার চোখ এই শব্দে চক্‌চকে হইয়া উঠিয়া গলা হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল, "পর্‌র্‌।"—

"কি রতুমণি! ঈশ্‌! নোলা যে সক্ সক্ করুচে"" বলিয়া সেই লোভাতুরের গালে দুই আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া সে পাখীর উদ্দেশ্যে মুখ তুলিয়া তাহারই অনুকরণ করিল,—"রূপু! রূপু! রূপু!"

ডাকটা ফেরৎ আসিল, মাঝে হইতে প্রকাণ্ড পিতলের দাঁড়ে-বসান কাকাতুয়াটা তাহার হাঁড়ির মতন মোটা গলার আওয়াজ বাহির করিয়া মুরুব্বি-চালে হাঁকিল, "রূপো—রূপো—রূপো!" পাখীটির নাম তাহার রূপের গরবে 'রূপসী' রাখা হইয়াছিল, ডাক নামটী রূপু।"

পাখীর শত্রু বিড়াল-বাচ্চাকে ঘাড়ে করিয়া তখন আর অধিকক্ষণ অরি-মিত্র যোগ না করিয়া উর্ম্মিলা 'রতুকে' লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং সেখানে তাহার নাদুশনুদুশ নরম দেহটি নিজের কোলের মধ্যে ফেলিয়া জানু দোলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল। দুটো ডব্‌ডবে সবুজ চোখের উপর করতলের মৃদু মৃদু আঘাত দিতে দিতে ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"আয় চাঁদ আয়!
বাঁশবনের ভিতর দিয়ে
চাঁপাগাছের উপর দিয়ে
নীলসাগরে সাঁতার দিয়ে
আয় চাঁদ আয়!—
দে'রে ধরা চাঁদের ফাঁদে—
নইলে যেরে চাঁদ কাঁদে—
আঁচল কোনে রাখ্‌ব বেঁধে—"

সিঁড়িতে এবং তারপর দালান দিয়া জুতার মস্‌মস্‌ রব তুলিয়া যে লোক এই ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরের ভিতরকার এই দৃশ্যটী চোখে পড়িতেই সে ব্যক্তি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! বাঃ! উর্ম্মিলা! বেশ তো তোমার চাঁদটি! আহাহা, যেন ষোল কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ!"

নিজ কণ্ঠের কলরবে এতক্ষণ উর্ম্মিলার কর্ণ ইঁহার জুতার শব্দে অজ্ঞ ছিল, এখন অপরিচিত

কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সে অকস্মাৎ ভীষণ ভাবে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল এবং ইত্যবসরে তাহার কক্ষ-স্থিত বিড়াল-শিশুও নিজের অনিচ্ছা-সেব্য আদরের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেই এক লাফ দিয়া নামিয়া পড়িয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।—তাহা দেখিয়া আগন্তুক ব্যক্তি আর একবার তেমনি করিয়াই উচ্চ কৌতুক-হাস্যে সারা কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

ইহার ভিতরে উর্ম্মিলা নিজের কোমরে-জড়ান রঙ্গে ছোবান বৃন্দাবনী-ছাপা সাড়ীর আঁচল খুলিয়া মাথায় তুলিয়া দিয়াছে, এবং কিছু বিমূঢ়ভাবেই অবাক্ চোখে এই অদ্ভুত আচরণশীল অপরিচিত ব্যক্তিটীকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এর সম্বন্ধে কোন্ পথ যে সে অবলম্বন করিবে, তাহার কিছুই এখনও ভাবিয়া পায় নাই।

নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই লোকটী কিন্তু দিব্য সপ্রতিভমুখে ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া অপর আসনের অভাবে বিছানা-পাতা খাটের উপরেই সটান বসিয়া পড়িলেন ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি-প্রায় উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি গো, "উর্ম্মিরাণি!" বলি, চিন্‌তেই পারলে না যে! আমি কিন্তু সিঁড়ি উঠ্‌তে উঠ্‌তে তোমার ওই 'দেরে ধরা চাঁদের ফাঁদের' সুর শুনেই তোমায় চিন্‌তে পেরেছিলুম! তুই তো এতবড়টা হয়েছিস্, তবু কিচ্ছুই ত প্রায় বদলাস্‌নি!"

উর্ম্মিলা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ কৃপালুভাবে তিনিই বলিলেন, "নাঃ! এ মেয়ে-মানুষের জাতের কাছে মনে রাখানর দাবী কর্‌তে যাওয়ার মতন দুরাকাঙ্ক্ষা দেখ্‌ছি সংসারে আর কিচ্ছুই নেই! অয়ি বিস্ময়-বিমূঢ়ে! তরুণচন্দ্র লাহা নামক কোন অভাগা—আত্মজনের কথাটা কি একটুও স্মরণ হয়? অথবা—"

"ওহো! বুঝ্‌তে পেরেছি—এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি,—আপনি বড় জামাই-বাবু! ও সেই জন্যেই যেন আপনাকে চিনি চিনি মনে হ'চ্ছিল, অথচ—"

"তোর মুণ্ডু হ'চ্ছিল! কোথায় 'চিনি চিনি' কর্‌ছিলি রে? মুখখানা তো বেজায় 'তেতো' 'তেতো' করেই চোক বার করে চেয়েছিলি! আচ্ছা, এখন চিন্‌লি তো? আয় এইখানে বস্‌বি আয়! ভাল ক'রে তোকে একটু দেখি।"

এতক্ষণে উর্ম্মিলার হারান সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রায় যুগান্তরের পরপার হইতে ভাসিয়া আসা এই প্রায় অচেনা আপনার লোকটীকে যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন থাকিতেও পারে, তেমন কথা মনের মধ্যে ভুলেও না ভাবিয়া সে এই আকস্মিক প্রাপ্তির গভীর আনন্দে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সানন্দ কলরব করিয়া বলিতে লাগিল, "তা' চিন্‌বোই বা আপনাকে কেমন করে? কতকাল হ'য়ে গেল আপনাকে যে চক্ষেই দেখিনি, সেইটী বলুন দেখি? ন' বছর দশ বছর তো খুব হবে। আর তখন তো আপনি সায়েবও ছিলেন না! আপনার গোঁফ ছিল, ধুতি টুতি পর্‌তেন। তা' এতকাল পরে যে বড় আমার কথা আপনার আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল? কি ভাগ্যি!"

শেষ কথাগুলা সে ঈষৎ অভিমানের সুরেই বলিল।—

তরুণচন্দ্র জুতা-পরা পা দোলাইতে দোলাইতে মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে সেই সকল সস্নেহ অনুযোগ শুনিতেছিলেন, শেষ কথাগুলা ও তার সুরটুকু গায়ে না মাখিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়াই

বলিলেন, "তুই বুঝি গোঁফ রাখার খুব পক্ষপাতী? তোর বরটীর বোধ হয়, চাড়া দেবার মতন খুব ভাল রকম গোঁফের জোড়াটী? হ্যাঁরে, তোর বরটি কোথায়? তাকে একবার ডাক্না, তার সঙ্গেও একটু ভাব করি।"

'বরের' কথায় লজ্জায় মাথাটি নামাইয়া উর্ম্মিলা মৌন হইয়া রহিল।

"ওকি রে উর্মি!—তোর বিয়ের দিনেই বুঝি তোকে সেই শেষবার দেখেছিলুম? তখন তো 'বরের' আহ্লাদে তোর দু'পাটী দাঁতের একটিও যদি ঢাকা পড়্ছিল! সেদিন তুই আমায় কি বলেছিলি মনে আছে? আমি তোকে 'কনে' বল্তুম কিনা,—তোর বর আসতেই গিয়ে বল্লুম, 'হ্যাঁরে উর্মি'! তোর যে বর এলো রে, এখন আমার দশাটা কি হয়? তুই তখন বল্লি—"

একটা বিসদৃশ কিছু বলিয়া থাকিবার আশঙ্কায় মাথার সঙ্গে নাকের নথটা শুদ্ধ ভীষণ বেগে দোলাইয়া উর্ম্মিলা ঝাঁজিয়া উঠিল, "যান্ যান্! ওসব আমি শুন্তে চাইনে। আচ্ছা বসুন আপনি, আমি ছুটে গিয়ে মা'কে একটু খবর দিয়ে আসি।" বলিয়া যথার্থই সে আনন্দ-মগ্না বালিকার মতন নাচিতে নাচিতে ছুটিল। তাহার চলন্ত-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তরুণ-চন্দ্র মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ অনুভব করিলেন।—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন:—"আমার স্ত্রীটা যদি এমনও হ'তো; তা' হ'লে কি আর আমায় এমন ক'রে—"

উর্ম্মিলা শাশুড়ীর কাছে সব কথা জানাইয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাঁহাকে শুদ্ধ নিজের পিছনে পিছনে টানিয়া আনিয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, তাহার 'জামাইবাবু' তখন ঘরের দেওয়ালে ঝুলান একটা ছবি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। উহার আগমন জানিতে পারিয়া মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কারা রে? তুই আর তোর বর বুঝি?"

"যাঃন"—বলিয়া ঝঙ্কার করিয়া উর্ম্মিলা পুনশ্চ শান্তস্বরে কহিল, "মা এয়েচে।"

তরুণচন্দ্র ফিরিয়া গৃহিণীকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভরে পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "এসো বাবা এসো। দীর্ঘজীবী হও, রাজা হও, মনের সুখে থাকো! হ্যাঁ বাবা! প্রেম আমার একটু সারুছে, টারুচে?"

"তেমন, কই।"—বলিয়া উত্তর দিয়াই তরুণচন্দ্র উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এক গ্লাস খাবার জল আন্তো উমারাণি!"

উর্ম্মিলা চলিয়া গেলে স্বর কিছু ছোট করিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রমিলার দুঃখময় জীবনের শেষ হ'য়ে এসেছে, তার আর বাঁচ্বার আশামাত্র নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "আ—হা!"

তখন তরুণচন্দ্র আরও একটু নিম্নস্বরে ও ত্বরিৎকণ্ঠে কহিলেন, "দেখুন বিনয়ের সম্বন্ধে আমি দুটো খবর পেয়ে আপনাকে তাই জানাতে এলুম। দেখা শোনা নাই থাক্, তবু সে আমার আপনার লোক ত বটে! আপনি তা'কে ক'ল্কাতার হুজুগে পড়ে মাটি হ'তে দিয়ে রেখেছেন কেন?"

জগদ্ধাত্রীর মাতৃ-হৃদয়ের সন্তপ্ত অভিমানের উৎস এই কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তা'কে ফেলে রাখ্বার কে' বাবা! যে ফেলে রাখ্বো?—সে-ই যে এখন এ বাড়ীর হর্ত্তা, কর্ত্তা, সেই তো আমাদের দু'জনকে বনবাস দিয়ে রেখে যা' তার মন চাইচে তাই করে বেড়াচ্ছে!"

তরুণ অবাক্ হইয়া গিয়া কহিলেন, "আপনার কথা সে শোনে না, নাকি ?"

"হ্যাঃ—আমার কথা শুন্‌বে ! যাঁর বাড়া নেই, সেই তাঁকেই বড় মেনে ছিল ! 'বিনে' 'বিনে' করে যে পাগল হতেন, বিনয়ের তো বড় খোঁজ খবর ! কার দোষ দোব বল, বাবা ! ও আমার গর্ভের দোষ,—আমার ভাগ্যেরই দোষ ! পোড়া পেটে একটাও কি আর মানুষ জন্মাতে নেই ? দু-দুটো ছেলে হলো, দুটোই কি বাঁদর হ'তে হয় ? এই তো তুমিও তো বিলাত গেছ্‌লে বাবা, অতবড় একটা চাকরীও তো কর্‌চো, তা' মন তো আর তার মতন বিলিতি হয়ে যায়নি।"

তরুণ কহিলেন, "তা' এখন শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নিজেরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌লেই তো আর হবে না মা ! যা'তে ছেলেটা আপনার ঘরে ফেরে, জেল ফেল একটা না হয়,—তা' ছাড়া আরও যে একটা মস্ত রকম কেলেঙ্কারীরও জোগাড় সে ক'রে তুল্‌চে, সে সবগুলো থেকে যাতে রক্ষা পায়, তার জন্য তো আপনাকেই যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

মনে মনে অত্যন্তই শঙ্কানুভব করিতে থাকিয়া জগদ্ধাত্রী কাতর-কণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিলেন,—"বাবা ! তা' হ'লে কি হবে বাবা ? ওমা, এ হতভাগাও কি আবার ঐ বড়র পথেই গেল নাকি গো ? অ্যাঁ ! তের বচ্ছর বয়সে যে ওর ওই ভয়ে বিয়ে দিলুম, বলি তা' হ'লে আর কোন দিকে বুঝি চেয়ে দেখ্‌বে না। তা' এ আবার আমার দেখ্‌ছি উল্টে দুগুণ জ্বালা হলো !"

উর্ম্মিলা বাতাসে রুদ্ধ দ্বার ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গালভরা পানের সঙ্গে ঠোঁটভরা হাসি লইয়া কাঁচের গ্লাসের জল ভগ্নিপতির হাতে তুলিয়া দিল। "দেখুন তো, আমাদের নীচের কুঁজোর জল ঠিক বরফ জলের মতন ঠাণ্ডা নয় ?"

"তাই ত' রে !" বলিয়া তরুণ হাসিয়া জলপান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী অতিকষ্টে নিজের আহত হৃদয়ের জ্বালা চাপিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "বৌমা ! যাও তো বাবা ! বামুন-মেয়েকে দিয়ে বড় ছেলের জন্যে খানকতক গরম লুচি, একটু আলুর দম, আর দু'খানা আলু পটলের ভাজা চট্ ক'রে করিয়ে নিয়ে এস তো। আর কাপড় ছেড়ে ভাঁড়ার-ঘরের সিকে থেকে পেড়ে কাল্‌কের বানানো নাড়ু আছে, তাই দিয়ে দিও গোটাকতক। যাও শীগ্‌গির করে যাও।"

সন্তুষ্ট-মনে কর্ম্মিষ্ঠা উর্ম্মিলা লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া গেল। তাহার বন্ধনহীন-প্রায় অবসরকালকে কোন একজন আপনার লোকের জন্য একটুখানি উৎসর্গ করিতে পাইয়া সে যেন আজ বর্ত্তাইয়াছিল।

জগদ্ধাত্রী দুই চোখে ও কণ্ঠস্বরে কাতরতার সঙ্গে মিনতি ভরিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "হতভাগা ছেলে কি যে করেছে, জানিনে। তবে ওর রকম সকম দেখে দেখে অনেকদিন থেকেই আমারও কেমন যেন মনে একটা সন্দেহ হ'চ্ছিল। কলেজে পড়্‌লে সব কর্‌লে, শেষ পরীক্ষার সময় কোথাও কিছু নেই, হুট্ ক'রে কলেজ ছেড়ে দিলে। তাই না হয় না পড়িস্ ঘরেই চলে আয়। নিজের জাত-ব্যবসা যা' সব আছে, তাঁনার—অতবড়-কারবার, সেই সবই দেখ্, শোন্ না, পড়্‌বার তোদের দরকারই যে ছিল না ; সেও তো তোদের নিজের নিজেরই সখ। তা' নয়—আবার পাঁচজনেরই মুখে মুখে শুন্‌তে পাই, পথে পথে নাকি টোটো করে বেড়িয়ে—কোথায় কোন্ ভিখিরি মর্‌চে, কে কোথায় কার হাওয়াগাড়ী কি ট্রামে কাটা প'ড়েছে, তাদের নিয়ে সেবা হ'চ্চে ? খাওয়া

নেই, ঘুম নেই, পায়ে একটা জুতো,—মাথায় একটা ছাতা পর্য্যন্ত নেই—পথে পথে কাপড় বেচা হ'চ্চে; বক্তৃতা দেওয়া হ'চ্চে, দেশ নাকি এই ক'রে উদ্ধার করা হ'চ্চে! ভয়ে আমি আধমরা হ'য়েছিলুম বাবা! রাতে আমার ঘুম হয় না, কোথাও একটু শব্দ হ'লে যেন বুক আমার ধসে পড়ে। কেবলি মনে হয়, কোথা থেকে বুঝি কি কু-খবরই বা এলো! তা' এই তুমিই তো বল্‌চো যে, তার বিপদ নাকি এসেই পৌঁছে গেচে? মন যে অন্তর্য্যামী!—আর নেহাৎ বেশী কিছু না ঘটলেই কি আর এত কষ্ট করে তুমি নিজে এসেছ?"—জগদ্ধাত্রীর চোক দিয়া হুহু শব্দে জল পড়িতে লাগিল।

তরুণ তাঁহাকে অৰ্দ্ধ-সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "দেখুন মা! বিপদ বিনয়কে সত্যি সত্যিই ঘিরেচে। আমি কোন রকমে জান্‌তে পেরেচি, তারা ভিতর ভিতর একটা খুব বড় রকমই ষড়যন্ত্র কর্‌চে। তার জন্ম অস্ত্রশস্ত্রও নাকি নানাদেশ থেকে জোগাড় হচ্চে। এই সময় খুব বেশী সাবধান না হ'লে আর তা'কে রক্ষা করা যাবে না। তা' ছাড়া ক'ল্‌কাতার এক বিলাত-ফেরৎ ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেও তার নাম নিয়ে আজ কাল খুবই গোলমাল যা'চ্চে। তা'কে নাকি সে বিয়ে কর্‌তেও চায়। আচ্ছা, উৰ্ম্মিলাকে কি তার মনে ধরেনি? কেন, ওত খাসা মেয়ে!"

জগদ্ধাত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সকলি আমার বরাত রে বাবা! সকলই আমার এই পোড়া বরাত!—উৰ্ম্মিলাকে সেই একরত্তি বেলা থেকে যে পিঠোপিঠির মতন করে এসেছে কি না, এখনও ওদের ঠিক্ সেই রকমই চলে যাচ্চে। এখনও বাড়ী আসে তো অন্ম ঘরে শোয়; কেবল দুটিতে রাতদিন ছেলেমানুষের মতন মারামারি আর হুড়োহুড়ি! হাজার বল্লেও শোনে না, বোঝে না, আর বাড়ীতেও তো কেউ ওদের সমবয়সী নেই যে, তেমন করে বুঝিয়ে বলে। বউটাও হয়েছে বোকার একশেষ। আমি বলি তো ওকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে, তা গণ্ডারের চামড়া না, কি যে ওর গায়ে আছে, সকলই যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন ভুগুন হতভাগা মেয়ে!"

তরুণ একটু চিন্তিতমুখে নীরব রহিল দেখিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া আসিয়া একেবারে তাহার দুই হাত দুহাতে জড়াইয়া ধরিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "যদি পোড়াকপালীর মুখচেয়ে কষ্ট করে এতদূর এসেইছ বাবা! তা'হলে যাতে আবাগীর বেটিটে জন্মের মতন ভেসে না যায়্, তারই একটা উপায় কর। ওর এই সোমোত্ত বয়েস, দেহভরা রূপ, যা'হোক্ ঘরে দুটো পয়সাও আছে, ওকে দেখ্‌বেই বা কে? ওর দশা হবে কি?—আমি আর কদ্দিন! দোহাই বাবা! তুমি একটা মেজেষ্টার, তুমি মনে কর্‌লে কি না পারো? ওকে কোন রকমে একবারটী ঘরে পুরে দিয়ে যাও।"

"আমিও তো তাই চাইচি। আচ্ছা দেখুন; আপনি যদি বিস্তর কাঁদাকাটা করে ওকে বাড়ীতে আনিয়ে নেন্; আর ও এলেই ওকে ও উৰ্ম্মিলাকে সঙ্গে করে,—ধরুণ—এই বদরীনারায়ণই চলে যান এবং সেখান থেকে ফিরে হৃষিকেশে কিছুদিন ধরে ওদের নিয়ে বাস করে থাকেন। অর্থাৎ বৎসর খানেক ওই রকম অনেক দূরে দূরে জনসঙ্গ ছাড়া নিভৃত স্থানে ওকে যদি আটকে রেখে দিতে পারেন, তা'হলে হয় ত দু'রকম বিপদ থেকেই ও বেঁচে যেতে পারে। বুঝ্‌লেন? তা ভিন্ন আর তো কোনই উপায় দেখি না"

জগদ্ধাত্রী এ পরামর্শে কথঞ্চিৎ শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও অস্বস্তিতে অধীরা হইয়া পড়িলেন, "হ্যাঁ বাবা, এ যে তুমি বল্‌চো, এ তো খুবই ভাল কথা বাবা! তোমার বুদ্ধির উপযুক্তই ত পরামর্শ

দিয়েছ, তা, সে হতভাগা ছেলে কি আর আমার কথা কানেই তুল্‌বে? না, আমার সেদিন আর আছে? যা বল্‌তে বিনয় আমার এতদিন অজ্ঞান হতো, এখন 'দেশ' পেয়ে যে পোড়াকপালী মাকে সে ভুলে গেছে।—ও বাবা! আমার মুখ চাইবার আর কেউ নেই। ভগবান্ তোমার ভাল কর্‌বেন, আমার দুঃখ দেখে তুমিই দয়া করে যদি কোন উপায় করে দাও।"

তরুণ সবিনয়ে কহিলেন, "সেকি আর আপনাকে আমায় কষ্ট করে বল্‌তে হবে মা! দেখুন, আমার নিজের বোন্ নেই, ঊর্ম্মিলা আমার ছোট বোনটীর মতন। তার যা'তে ভাল হয়, সেকি আর আমি না কর্‌বো। তবে কথা কি জানেন, আজকালকার ছেলেরা একটু বেশী পরিমাণে স্বাধীন হ'য়ে উঠে্‌ছে। তারা আমাদের মতন লোককে কেয়ারই করে না, বরং গবর্ণমেণ্টের চাকরী করি বলে ওদের চোখে আমরা লোভী, ভীরু এবং অপদার্থ। তারা সব এ যুগের অর্জ্জুন, ভীষ্ম।—কাজেই তাদের সাম্‌নে যেতে আমরাও ভরসা কম করি। না হ'লে আমি তা'কেই তো নিজে ডেকে এ সব কথা বল্‌তে পার্‌তুম। অনর্থক এতদূর আস্‌বার তো কোন দরকারই ছিল না। তা আপনারা যতদূর পারেন চেষ্টা করে তো দেখুন, নেহাৎ না হয় তখন আমি ত আছিই।"

"বাবা! তোমায় ভগবানই কৃপা করে দুঃখিনীদের কাছে এনে দিয়েছেন, যা'তে সুবিধা হয় তাই করো। আমি মুখ্যু মেয়ে-মানুষ;—শোকে, রোগে জানোয়ার বনে রয়েছি; কি আর তোমায় বেশী বল্‌বো? তুমি একটা জেলার মেজেষ্টার, দিনরাতই তো ওই সব কর্‌চো, যা'তে হতভাগাটা বেঁচে যায়—তুমি তাই করো।"

হাস্য-কৌতুকের মধ্যে দিয়া জলযোগ সমাধা হইলে, তরুণ বলিলেন, "তোর সেই সোনার না হীরার চাঁদটিকে একবারটী কোলে করে নিয়ে আয় তো রে উমি! আহা, বেড়ে মোটা ল্যাজ্‌টি তার!"

ঊর্ম্মিলা তাহার পোষ্যপুত্রের 'ল্যাজের' প্রশংসায় আহ্লাদে ডগ্‌মগ হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ও খানিক পরেই অনিচ্ছুক বিড়াল-ছানাটাকে ঘাড়ে চাপাইয়া সেটাকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

তরুণচন্দ্র পকেট হইতে একটি ভেল্‌ভেটের বাক্স বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে খুব সুন্দর গঠনের একটি সোনার চেন্ লইয়া সেই বিড়াল-ছানাটার মাথার উপর সেটী ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। চেন্‌টার মাঝখানে একটা বড় ধুক্‌ধুকি। তাহাতে বড় একখানা ওপালের চারিপাশে সোনার পাতায় মুক্তা খচিত। জিনিসটার দাম আছে।—

"এ আবার কি? নাঃ!"—বলিয়া হারগাছা হাতে করিয়া ঊর্ম্মিলা বিড়াল-বাচ্চাকে ছাড়িয়া দিল।

তরুণচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোর খোকার মুখ দেখ্‌বো বলে আস্‌বার সময় কিনে এনেছিলুম রে! তা' আমার উমারাণীর যখন ঐ রকমেরই খোকা, তখন কাজে কাজে তাকেই দিতে হচ্ছিল! আচ্ছা আয় দেখি, তা' হ'লে তোকেই না হয় পরিয়ে দিয়ে যাই। দেখ্‌লে মধ্যে মধ্যে তবু এই অভাগা জামাইবাবুটার কথা মনে পড়ে যাবে এক আধবার।"

ঊর্ম্মিলার বিস্তর আপত্তি-সত্ত্বেও তাহাকে সেই বিড়াল-প্রসাদী হারগাছা পরিতে হইল, এবং শেষে মিট্‌মাট্‌টা হইল এই রকমে—"আচ্ছা ওটা তুই অম্‌নি না নিস্, ওর বদলে আমায় না হয়

ওর চাইতেও বেশী দামের খুব ভাল জিনিস একটা দিয়ে দে। কেমন রে! প্রাণ ধরে কি পারবি দিতে ?"

জিজ্ঞাসু-চোখে চাহিতেই তরুণচন্দ্র সস্মিতমুখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "তোদের দু'জনকার ঐ ফটোখানা।"

"ওঃ ভারি তো!" বলিয়া উর্ম্মিলা ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ ফিরাইল এবং তৎক্ষণাৎ সেখানা ফ্রেমশুদ্ধ খুলিয়া আনিয়া অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া ভগ্নিপতির হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, "ভারি তো, এর বুঝি আবার অত দাম!" আহাহা, যা বুদ্ধি গো!

তরুণ সেখানা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া সহাস্য-মুখে উত্তর দিলেন,—"যাহোক তোর বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তা' বেশ জেনে রাখলুম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণা ইংরাজীতে লিখিত এই পত্রখানা পাইল।—

আমার প্রিয় বেবি!

কাজের ভিড়ে ক'দিন তোমার খবরাখবর নিতে পারিনি, তার জন্য আমায় মাপ করো। আশা করি, তুমি শারীরিক বেশ সুস্থই আছ? তোমার বাবা কিছু সুস্থ হইয়াছেন কি? তাঁর জন্য যে নূতন প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে সেদিন পাঠাইয়াছি, তাঁর কাজ-কর্ম্ম বেশ মন দিয়া করিতেছে তো?

একটা অপ্রিয় সংবাদ দিতেছি। সত্যটাকেও 'প্রিয়'ভাবে প্রকাশ করা শাস্ত্রকারদের অনুমোদিত হইলেও অবস্থা-বিশেষ শাস্ত্রশাসনলঙ্ঘনে আমাদের যে অনেক সময়ই বাধ্য হইতে হয়, অবশ্য সেটা তুমি বোধ হয় এখনও অস্বীকার করিবে না?

দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার নবীন-বান্ধব ও উপদেষ্টা বিনয়-শীল নামধারী লোকটীর সকল রহস্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এই বিনয়কুমার শীল আমার মৃত্যুদ্বার সমাসীনা চিররুগ্না স্ত্রী প্রমিলার ছোট বোন্ উর্ম্মিলার স্বামী। সেই সম্বন্ধে সে আমার 'ভায়রা-ভাই।' তুমি জান, শ্বশুর-কুলের কাহারও সহিত আমার বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। বিনয়কুমারকে তাহার বিবাহ-রাত্রে একবারমাত্র এগার বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাই সেদিন রাস্তায় দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারি নাই। গতকল্য বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম, সেখানে বহুদিন পরে আমার শালী উর্ম্মিলাকে দেখিলাম। উর্ম্মিলাকে দেখিতে এখন খুবই সুন্দর হইয়াছে! তাদের দু'জনকার একসঙ্গে তোলা ফটোগ্রাফ একখানা উর্মি আমায় উপহার দিয়াছিল; ভা—রী সুন্দর ছবি উঠিয়াছে! এই সঙ্গে সেখানা তোমায় পাঠাইলাম, মিলাইয়া দেখিও, এই উর্ম্মিলার স্বামী বিনয় শীলই তোমার সেই নব-পরিচিত ও বন্ধু বিনয়শীল কি না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন তোমার নূতন-বন্ধুর আশা করা তোমার পক্ষে অধিকতর নিন্দনীয় হওয়ারই আশঙ্কাপূর্ণ, [যেহেতু, তার স্ত্রী তোমারই মত সুন্দরী ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্না, অধিকন্তু তোমাপেক্ষায়ও দু'এক বৎসরের অল্পবয়স্কা] তখন অনর্থক তাদের সুখময় আনন্দময় আশা-

[library stamp]

সরস তরুণ দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নিরানন্দের বিচ্ছেদের বেদনার হাহাকার না টেনে এনে যে লোক আজ দীর্ঘতম আট বৎসর একাদিক্রমে তোমারই ধ্যানে তন্ময় হয়ে বেঁচে আছে, তারই কাছে ফিরে এসো না কেন ? আমার স্ত্রীর অবস্থা প্রতিদিনের চেয়ে প্রত্যেক দিনেই সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে ; তার শেষ হ'বার আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু বিনয়কুমারের স্ত্রীর উর্ম্মিলার হয়ত' তোমার পরেও কিছুদিন বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। বিবাহিতের সহিত নিজের নামকে জড়িত রাখা তোমার বিশেষ অনিচ্ছা জানিয়াই এই খবরগুলি তোমায় দিলাম। বিনয়ের সহিত তোমার নামোল্লেখ ইতঃমধ্যেই কোথাও কোথাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, [ইহা ইচ্ছা করিলে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়]। চিররুগ্না ও উন্মাদ স্ত্রীর স্বামীর নামের সহিত উল্লেখ হওয়ার অপেক্ষা কোন সুন্দরী সুশীলা পুণ্যচরিত্রা রমণীর পতির সহিত সংযুক্ত হওয়াতে কি তোমার নামের গৌরব বৃদ্ধি হইবে আশা করো ? তদ্ভিন্ন, কোন ভদ্রমহিলার নাম সাধারণে যদি পাঁচবার পাঁচজনের সঙ্গে সংযোগ করে, তাহাতে সমুদয় ভদ্রসমাজেরই গ্লানি। ভরসা করি, আমার কঠোর কর্ত্তব্যপালনব্যপদেশে অপ্রিয়ভাবে প্রযুক্ত সত্যকথা গুলি তোমার পক্ষে অসহ্য হইবে না এবং এর জন্য আমায় তুমি ক্ষমাও করিতে পারিবে ? তোমাদের কুশল জানিতে ইচ্ছুক ও উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

তোমার চিরানুগত তরুণ।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণার মুখের উপর বিবিধ ভাবের তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ক্রীড়া করিয়া গেল। তাহার কষিত কাঞ্চনবর্ণ কখনও তীব্র বেদনায় কালো দেখাইল, কখনও অকথ্য অবমাননার অসহায় ক্রোধে হাপরে-ভরা স্বর্ণের মতই তাহা রাঙ্গা হইয়া উঠিল,—অবশেষে চিঠি পড়া সমাধা করিয়া সে সেই একই ভাবে কতক্ষণই যেন, অবসন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। কখন একান্ত অপ্রত্যাশিত মর্ম্মন্তুদ দুঃখে তাহার স্বভাব রক্ত কপোল ললাটের রক্তরাগ অপসৃত হইয়া গিয়া তাহাকে বিবর্ণ পাণ্ডুরাভ করিয়া তুলিল। সম্পূর্ণরূপেই অচিন্তনীয় ব্যাপার কিছু না ঘটিলে মানুষের সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বার, সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি এমন করিয়া বুঝি আচ্ছন্ন হইয়া যায় না !

যখন বহুক্ষণ পরে আপনাকে আপনিই আবার সম্বরণ করিয়া লইবার সামর্থ ফিরিয়া আসিল, তখন নিজের কোলের উপর চোক পড়িতেই মস্তবড় একখানা খামে মোড়া 'পেষ্টবোর্ডের' রক্ষণার মধ্যে সেই তথাকথিত ফটোগ্রাফখানার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তারপর আর একটুখানি সময় থামিয়া থাকিয়া বক্ষের উদ্দাম নর্ত্তন-বেগকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া মোড়ক খুলিতেই হাস্য-সরস, কৌতুকোজ্জ্বল একখানা বড় পরিচিত—বড় পরিচিত মুখের পাশেই এক সম্পূর্ণ অপরি-চিতা কিশোরীর হাস্য-প্রফুল্ল পূরন্ত মুখের উপর তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বাধিয়া রহিল। এই সেই নারী, যাহাকে তাহারই মত 'সুন্দরী ও অটুট্ স্বাস্থ্য-সম্পন্না' বলিয়া মিঃ লাহা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন ! ইনিই বিনয়কুমারের স্ত্রী উর্ম্মিলা শীল ! ফটোগ্রাফখানা নামাইয়া রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে স্তব্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন রেখা-চিত্রের ন্যায় তাহার কাছে কতকগুলো কালির আঁচড় মাত্র বোধ হইতে লাগিল ! জীবনের নব-জাগ্রত আশা স্বপ্নের অর্দ্ধেকখানাই তাহার বুঝি সেই সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল।

দু'দিন পরে মিঃ লাহা তাঁহার উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিত্য-প্রতীক্ষিত পত্রের এইরূপ উত্তর পাইলেন।—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার পত্রে আমার 'নবীন-পরিচিত' ও কর্ম্ম-সঙ্গী শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুকে আপনার নিকটতম-আত্মীয় জানিয়া বিশেষরূপ আনন্দিত হইলাম। বিনয়বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে, বড় সুন্দর মেয়েটী! যদি কখন আপনার বাড়ী তিনি আসেন, খবর দিলে গিয়া নিশ্চয়ই একবার দেখা করিয়া আসিব এবং সম্ভব হইলে তখন তিনিও আমাদের কর্ম্ম-সঙ্গিনী হইবেন।

আপনি অনেকখানি অনধিকার চর্চ্চায় অনর্থকই নিজের মাথা বকাইয়াছেন; এবং আমাকেও সেই সঙ্গে অহেতুক অপমান করিয়া ফেলিয়াছেন! আমার আপনার নামের সহিত আমার নাম নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া জড়িত রাখার ফলেই আজ এই পর্য্যন্ত আমার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে, যে আপনি এবং আপনার মত যে কেহই আমার সম্বন্ধে দুইটা কথা কহিতে পাইলে ছাড়িয়া দেন না। যাহা হউক, আমার সুনাম কুনামের চিন্তায় আপনি আর অনর্থক দুঃখভোগ করিবেন না। এখন হইতে আমাদের দু'জনকারই ঐ সম্বন্ধে ছুটী হইয়া যাক্। তবে নিতান্তই যদি দুর্ভাবনার জন্য আপনার নিদ্রাহীনতা জন্মে; সেই জন্যই জানাইলাম যে, বিনয়বাবু সম্বন্ধে আপনার ঐ অতি হেয় ঈর্ষ্যা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। আপনি বা আর কেহ—কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন ব্যক্তির সহিতই আমি নিজের নামকে আর সংযুক্ত শুনিতে ইচ্ছা করি না—এবং সত্যকথাই বলিব;—বিবাহে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। বিবাহেই আমার প্রবৃত্তি নাই। অতএব নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিজের গন্তব্যপথে স্বচ্ছন্দ্যে গমন করুন; আর দোহাই আপনার। আমার পথে আমায় একটু খানি স্বস্তিতে চলিতে দিন্। মিনতি করি, আমার পিছনে আর ধাওয়া করিবেন না।

আর এক কথা,—আপনার সহিত আমার বিবাহের বাগ্‌দান-ভঙ্গ স্বরূপ আপনার দেওয়া মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি আপনাকে ফেরৎ দেওয়া আমি উচিত বলিয়া মনে করি। ইন্‌সিওরড্ পার্শেলে আপনার টাকায় কেনা মুক্তার মালা,—আপনার দত্ত হীরার ও মুক্তার ব্রোচ দুটি, হীরার আংটি, চুনীর ব্রেস্‌লেট্ ও গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিমন্ত্রণের জন্য যে বেনারসীর সুট্ তৈরি করাইতে আপনার কাছে ধার লওয়া টাকার সাতশো পঁচিশ খরচ হইয়াছিল, সেই 'অব্যবহৃত' সাড়ী ও ব্লাউস দুইটিও ঐ সঙ্গেই পাঠাইতেছি। আমি গরীব, অতঃপর গরীবের মতই থাকিব। ওসব আমার আর কোন্ কাজে লাগিতে পারে? ভবিষ্যতে যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহিষী হইবেন, তাঁহার কাজে লাগিবে।—আপনার কাছে আমার বাবা অনেক ঋণে আবদ্ধ, অন্তরের ঋণও আপনার সঙ্গে আমাদের প্রচুরতর। অর্থ ঋণ বাবার ঘর-বাড়ী বিক্রী করিয়া শোধ হইতে পারে; আপাততঃ আমার কয়েক-খানা গহনা বেচিয়া যে দশ হাজার টাকা পাইয়াছি, এই সঙ্গেই দিলাম। আর আপনার স্নেহের ঋণ এ জন্মে শোধ হইবার নয়, সেটা ধারেই থাকিল। আশা করি, সকল অবস্থা এইবারে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লইয়া আমায় ছাড়ান দিবেন।

আপনার বিনীতা কৃষ্ণা মল্লিক।—

ইহার পর কৃষ্ণার এই সুদীর্ঘ পত্রের উত্তর সংক্ষেপেই আসিল।—

আমার প্রিয় বেবি! তোমার পত্র ও গহনা টাকা ইত্যাদি ফর্দ্দমত সমস্তই মিল্যাইয়া

পাইয়াছি, কেবল পাই নাই সেই আমার যত্ন-আহরিত অতি সুন্দর ফটোখানি! হীরা মুক্তার চাইতেও অমূল্য বোধ করি, সেইখানিই শুধু নিজের জন্য রাখিয়াছ?

তুমি যে লিখিয়াছ—বিবাহিত এবং কোন অবিবাহিত পুরুষের সহিতই তুমি সম্বন্ধে আসিতে আর সম্মত নও। কিন্তু এই মতটা তোমার—বিনয়কুমারের সস্ত্রীক ফটোখানা দেখার পূর্ব্বে যে ছিল না, ইহা নিশ্চিত!

যাই হোক্ 'বিবাহিত' এবং 'অবিবাহিতের' প্রতি বিরাগ জানাইয়া যে বিপত্নীকের প্রতি অনুকম্পাটুকু বাকি রাখিয়াছ, ইহাতেই আমি ভবিষ্যতের জন্য আশ্বস্ত রহিলাম। আশা করি, সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ? তোমার বাবার সংবাদ দিতে ভুলিয়া গিয়াছ, তিনি কেমন থাকেন খবর দিও।

তোমার চিরানুগত তরুণ।

ক্রোধোত্তেজিত বিকৃত হস্তাক্ষরে এই পত্রখানি কৃষ্ণা মল্লিকের নিকট হইতে ডাকে আসিল।

মহাশয়!

আপনার ব্যবহার ভদ্রতার সীমা বহুদিনই অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে একেবারেই অসহনীয় বোধ করিতেছি। আমার ইচ্ছা বাড়ীখানা বেচিয়া আপনার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিই। আপনার মত হৃদয়হীনের কোন সংস্রব রাখার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

আর এক কথা—যাহাকে আপনি অন্যানুরাগিণী বলিয়াই বিশ্বাস করেন; তাহাকে নিজের স্ত্রী করিতে চাহিতেছেন কোন্ হিসাবে? আপনার আরোপিত অপরাধের আমি প্রত্যাহার করিলাম না জানিবেন।—এইবার আমায় মুক্তি দিন্!—মুক্তি দিন্! মুক্তি দিন!—

কৃষ্ণা মল্লিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় সেদিন প্রথম হরতাল। বড়বাজার ও—হ্যারিসন রোডের কতকগুলি মাড়ওয়ারির দোকান ভিন্ন প্রায় সব দোকানই বন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও উপবাসী ছেলেরা দলে দলে অনভিজ্ঞ ও অধিকাংশ অশিক্ষিত নাগরীকবর্গকে 'হরতালের' বা সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার উপকারিতা ও উদাহরণ সচেষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বনে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোথাও কোথাও দুই দলে বেশ একটুখানি তর্ক জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 'সেরা প্রমাণ যে লাঠির গুঁতা' সেটা এ ক্ষেত্রে কোথাও উপস্থাপিত করা হয় নাই। কারণ 'হরতালী'রা একেবারেই লাঠিশূন্য!

'তৃতীয় পক্ষ' নিজেদের রেগুলেস্ লাঠি এবং বন্দুক, বেওনেট, কিরীচ প্রভৃতি সমস্ত উদ্যত করিবা মাত্র একটা ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় আছে। ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণের আকাশের মতই সমস্ত থম্‌থমে ও স্তব্ধ! রাস্তার দু'ধারে একতল হইতে চারিতল পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীর দ্বার জানালা বারান্দা ও পঞ্চম তলার ছাদে পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক জমিয়া উঠিয়া আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষায় যেমন করিয়া তড়িৎ মেঘে ব্যাপ্ত আকাশের দিকে চাহে, তেম্নি করিয়া হরতালী ও সশস্ত্র পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট ও গুর্খা সমাচ্ছন্ন রাজপথের দিকে উৎপ্রেক্ষিত-নেত্রে চাহিয়া আছে।

সেয়ালদহের কাছাকাছি, হ্যারিসন রোডের উপরের একটা বিলাতী কাপড়ের দোকানে জন-

কয়েক আফিসের কেরাণী কতকগুলি সৌখীন বস্ত্র ক্রয় করিতেছিলেন। 'মুটিয়া'র সাজ পরা গুটিকয়েক তরুণ ছেলের মাঝখানে একটী তরুণী হাতের উপর ঝুলাইয়া কতকগুলি চরকার সূতার মোটা কাপড় লইয়া সেইখানে দেখা দিলেন। ছেলেদের মধ্য হইতে একজন সেই পাতলা কাপড়ের খরিদ্দার-বাবুদের ডাকিয়া বলিল, "মশাই! আজকার দিনটাতে আর কেনা-বেচা না কর্‌লেই ভাল হয় না? একটা দিন বই তো নয়।"

বাবুদের মধ্য হইতে একজন রুষ্ট-বিদ্রূপে জবাব দিলেন—"যান্ মশাই! নিজের নিজের চরকায় তেল দেন গিয়ে, পরের উপর জুলুম কর্‌তে আস্‌বেন না, বল্‌চি।"

ছেলেটী হাত দুটি জোড় করিয়া সবিনয়ে কহিল—"আমরা দেশের তরফ থেকে দেশবাসীর সেবা কর্‌বার ভার নিয়েচি, জুলুম করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। একটা দিন জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের সহায়তার জন্য সকলেই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করুন এই অনুরোধ।"

আর একটী বাবু ইহার জবাব দিলেন, "তাতে আমার লাভ?"

"জাতীয় উন্নতি অবনতির মধ্যে আপনারও লাভ ক্ষতি আছে বই কি! আপনি তো আর জাতির বাহির নহেন।"

বাবুটীর মুখ তামার হাঁড়ির মত দেখাইল। রোখ দেখাইয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের গুণ্ডামী! একদিন হরতাল কর্‌লে কি দুখানা খদ্দর পর্‌লেই কি ভারত স্বাধীন হয়ে উঠ্‌বে?"

এদের দল হইতে উত্তর আসিল—"না হতেও পারে। কিন্তু আমরা যে একটা স্বতন্ত্র মহাজাতি, আমাদেরও যে একটা জাতীয় ঐক্য থাকা সম্ভব, আমরাও যে সংবদ্ধ হয়ে কঠিন কার্য্য সাধন কর্‌লেও কর্‌তে পারি, এ বোধটা অন্যের কাছেও কিছু মান বাড়ায় এবং নিজেদেরও প্রাণ-শক্তিকে সম্বর্দ্ধন করে। আর খদ্দর পর্‌লে? তা বোধ হয় আত্মগৌরব একটু বাড়ে বই কমে না এবং বিলাসিতার হ্রাসে অর্থ-সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হয়।"

যে বাবুটী প্রথম রুখিয়াছিলেন, তিনি একটু শীতল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তা কি কর্‌বে। বলি বাপু! দেশী কাপড়ে বিলাতির চাইতে অন্ততঃ জোড়া পিছু এক টাকা বেশী পড়ে, অথচ মোটা ও শ্রীহীন হয়।"

ছেলেটী বলিল, "মান্‌লুম! তেমন ঢের বেশী ট্যাক্‌সইও হয় তো এবং অনেক বাজে জিনিষ কিন্‌তে হয় না বলে বিদেশী বর্জ্জনে যেটা বেঁচে যায়, তাতে এই পয়সাটা পুষিয়ে গিয়েও লাভ থাকে। তা ভিন্ন চরকা ও তাঁতের চলন বাড়লে তুলোর চাষ বৃদ্ধি হলে কাপড়েও সস্তা হবে। বিশেষ বিলিতি কাপড় এখন তো সস্তাও নেই।"

বাবুটী কিছু নরম হইয়া গিয়া কহিলেন, "সে সব তো পরের কথা, এখন আজই যে আমার মেয়ের বাড়ী ফুলশয্যার তত্ত্বে নমস্কারী কাপড় পাঠাইতেই হবে, নতুন কুটুমরা তো আর তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বসে নেই যে, পাওনা-গণ্ডাটী ছাড়বে। মাঝে পড়ে কি আমার কুটুম চট্‌বে, আর মেয়েটার খোয়ার কর্‌বে।"

কৃষ্ণা চট্ করিয়া সাম্‌নে আসিয়া একখানা মোটা শাড়ী তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে এই কাপড় কিনুন শুভ-বিবাহে অশুভ বিদেশী জিনিষ দিবেন কি জন্য? আমাদের দেশে বিবাহ

প্রভৃতিতে চরকা-কাটার সূতার কাপড় ব্যবহারেরই নিয়ম রয়েছে, আজ পর্য্যন্ত তার নিদর্শন অনেক-গুলি অনুষ্ঠানের মধ্যেও দেখ্‌তে পাওয়া যায়? জানেন অবশ্যই?"

আবেদনকারিণীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বাঙ্গালী বাবুটীর মেজাজ একেবারেই গলিয়া পড়িল, তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা! আপনার মতন যদি এ দেশের সকল মেয়েই শিক্ষিতা ও ত্যাগশীলা হতে পারেন, তা হলে তো কোন দুঃখই ছিল না, কিন্তু একটু-খানি সৌখীনত্বর লোভে মেয়েরা এখন এতই পাগল হয়ে পড়েচেন যে, এই গড়া পরবার কথা তো দূরে থাক্, অল্পসল্প মোটা শাড়ীই তাঁরা পর্‌তে রাজী হন না। কম দামের ফ্রেঞ্চ জরি ও জর্ম্মাণ-সূতার শাড়ী দু'দিনে ছিঁড়ে যায়, তাই মোটা বেনারসী চেলি মেয়ের জন্যে কিনে এনেছিলুম বলে, ঘরে পরে লাঞ্ছিত হচ্চি। ও কাপড় দিলে কুটুমবাড়ীতে কি আর আমার চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ হতে বাকি থাক্‌বে? না হলে আমি কিন্‌তুম।"

কৃষ্ণা কহিল "আপনার জামাইটী তো শিক্ষিত? তাঁর বাপ কি করেন?"

"জামাই শিক্ষিত হলেই বা সে কি ক'র্‌বে? মা বাপের উপর সে কথা কি কথা কইতে পারে? বাপও অশিক্ষিত নন্; কিন্তু মা! আপনি ক'জন শিক্ষিত পরিবারকে আপনার মতন ত্যাগী ও উদ্যমশীল দেখ্‌চেন? মনে হলেও কাজে কে কতটুকু করে উঠ্‌তে পার্‌চেন? আপনার কথায় দু'খানা শাড়ী আমি নিচ্চি, কিন্তু বাকিগুলি আগায়—"

কৃষ্ণা হাত দিয়া দূরের একটা বড় দোকান দেখাইয়া কহিল, "তা হলে ঐখান থেকে অন্ততঃ দেশী মিলের ও তাঁতের শাড়ী নিন্। মঙ্গল-কার্য্যের ভিতরে আর ম্যাঞ্চেষ্টারের ছাপ মার্‌বেন না।"

বাবুর দল চলিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীর সহিত ছেলেদের তর্ককলহের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিল।

অল্প দূরেই একজনের হাত ঝুলান এনামেলের বাল্‌তি ও জাপানী সিল্ক হরতালীদের মধ্যের কেহ কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াতে প্রথমে দু'জনে হাতাহাতি বাধিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্যেন-বিহঙ্গবৎ পুলিশ আসিয়া তাহাদের বেষ্টন করিল।—দেখিয়া বিনয় উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ফিরিয়া দেখিল, তাহার জামার প্রান্তটা কৃষ্ণার মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরা।—

সে মৃদুস্বরে বলিল, "বিনয় বাবু! মনে রাখ্‌বেন,—'নন্ ভায়োলেন্স!' ছেলেটি ওর জিনিষ ফেলে দিয়ে কাজ একটুও ভাল করে নি,—এইবার যান্, তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন। আর—"একটু মিনতির সঙ্গেই বলিল—"নিজেও স্মরণ রাখ্‌বেন।"—

একখানা 'ক্যাল্‌কট্' বেগে আসিতেছিল; সেই মুহূর্ত্তে যেন একটা বিকট হিংস্র-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া পরক্ষণে ফুঁসিতে ফুঁসিতে আসিয়া পড়িল। গাড়ীর মধ্য হইতে মিঃ লাহা নামিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক্ এই কথাই আমিও ভেবেছিলাম, তবে এত শীঘ্র পাব আশা করিনি। থ্যাঙ্ক গড্!"

এমন করিয়া কথা কয়টা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা দম-ফেলা গোছ করিয়া দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল যে, সব কয়জন লোকেই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণার বুকটা ভিতরে একটু কাঁপিল, তার ভয় হইল, পাছে এই ভক্ত-

সম্প্রদায়মধ্যে তাহার মর্য্যাদা-হানিকর কোন আচরণ ইনি করিয়া বসেন; পাছে ইহারা তাহাকে ইঁহার গুপ্তচরই বা মনে করিয়া লয়!

মিঃ লাহা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিলেন, "ব্যস্! অনেক তো হলো? এখন ফিরে চলো দেখি।"

"কোথায়?" বলিয়া কৃষ্ণা কিছু ভীত-দৃষ্টিতে তাঁহার সুগম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। প্রতিক্ষণেই এই রাজপথের মধ্যখানে নিজেকে সকলকার নিকট একটা দর্শনীয় পদার্থ করিয়া তুলিবার আশঙ্কা তাহার মনকে পীড়িত করিতে থাকিয়া এই অনধিকারী উৎপীড়কের প্রতি তাহার বিরাগকে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছিল।

"বাড়ী চলো।" বলিয়া মিঃ লাহা নিজের মোটরের অভিমুখে এক পদ অগ্রসর হইলেন, "এসো বেবি! আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি।"

একটুখানি নিকটস্থ হইয়া অনুচ্চ অথচ দৃঢ় ভৎর্সনাপূর্ণ-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, "মিষ্টার লাহা! আমার পিছনে লেগে থেকে কেন আপনি আমায় অনর্থক অপদস্থ করতে এলেন? আমি আপনার কি করেছি যে, কিছুতেই আপনি আমায় ছাড়ান দিতে পারচেন না? যান্, আমায় মুক্তি দিন্।"

মিঃ লাহা এই কথা শুনিয়া শুধু একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিয়া তাহার কোপ-কুটিল চক্ষের উপর নিজের স্থির-দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া সস্মিত-মুখে উত্তর করিলেন, "তুমি! আমার! কি করেছ? কি করবে? কিছুই করতে পারো নি।"—তাহার কণ্ঠে মাত্র প্রবল পরিহাস ব্যক্ত হইল।

অদূরে জনতাবর্দ্ধিত হইতে হইতে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছিল। পুলিসের লাল-পাগ্‌ড়ী ও গুর্খার খাকিতে জনতা জম্‌জমে হইয়া উঠিয়াছে। যে সব দোকান এতক্ষণ হরতালকারীদের অনুনয়ে বন্ধ হয় নাই, সেগুলা লুঠ-তরাজের ভয়ে চট্‌পট্ বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ছাদ বারান্দাগুলা উৎকণ্ঠিত দর্শকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিল।—

কৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে চাহিতেই মিঃ লাহার দৃষ্টিও সেই সঙ্গে তথাকার জনতা ভেদ করিয়া রহস্যোদ্ধার চেষ্টা করিল; এবং এক নিমেষেই সমস্ত বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ দৃঢ়-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আর তোমার এখানে থাকা চল্‌বে না, বেবি! তুমি শীঘ্র উঠে পড়ো, যে রকম দেখ্‌ছি, এইবার একটা খুনোখুনি কাণ্ডও হয়ে পড়্‌তে পারে।"

কৃষ্ণা তাহার গভীর আবেগে উদ্বেলিত আতঙ্কিত অন্তরকে প্রাণপণে সংযত রাখিবার চেষ্টায় নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। সেই কোলাহলময় দাঙ্গাস্থলে তাহার অনুসন্ধিৎসু ব্যগ্র-দৃষ্টি যেন আলোকাকৃষ্ট পতঙ্গের মতই উগ্র আগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, অন্তরের মধ্যে তাহার চিত্তটা যেন রণবাদ্য শ্রবণে উন্মত্ত যুদ্ধাশ্বের মতই উন্মুখ হইয়া সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে তাহাকে দু'হাতে ঠেলিতেছিল, ও তাহার বক্ষের মধ্যে এই সবল উত্তেজনায় হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রায় নিরুদ্ধশ্বাসে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "নিরস্ত্র নিরপরাধীদের উপর গুলি চালাবে! ওদের হাতে যে বন্দুক রয়েছে দেখ্‌চি!"

মিঃ লাহা সেইদিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন ও তাচ্ছল্যভাবে কহিলেন, "শান্তিরক্ষার দরকার হলে চালাবে বই কি!"

"নিরস্ত্র জনতার শান্তি-রক্ষার দরকার এমন কি হতে পারে, যাতে গুলি চালাতে হয়! উঃ কি অন্যায়!"—

জনতার মধ্য হইতে সত্য সত্যই একটা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হইল, ও সঙ্গে-সঙ্গেই জনতা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণা দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তভাবে চোক বুজিল।—তাহার সমস্ত অন্তর কাঁপাইয়া সে ধ্বনি যেন বুকের ভিতরে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল, চোক চাহিতে গেলে হয়ত' বা কোন্ দৃশ্য তাহার চোখে পড়িবে! ওঃ হয়ত' কোন্ পরিচিত রক্তাপ্লুত প্রাণশূন্যদেহ,— হয়ত'—হয়ত'—

মিঃ লাহার নিরুদ্যম কণ্ঠ তাহার অবসন্ন শরীরে বলাধান করিল।—"ফাঁকা আওয়াজ! এঃ!— রাস্কাটিয়া সব পালাচ্চে! মোটে তিনটে লোককে অ্যারেষ্ট করেচে।"

কৃষ্ণা গভীর শ্বাস-গ্রহণপূর্ব্বক দেখিল, ছেলে তিনটিই তাহার অপরিচিত এবং ইহার মধ্যের একটিও সেই যে জাপান সিল্ক ও বাল্‌তি ফেলিয়া দিয়াছিল, সে নয়। দোষীর চেয়ে নির্দ্দোষী বড় সহজেই ধরা পড়িয়া থাকে।

রাস্তার লোকেদের আবার এই দিকে ফিরিতে দেখিয়া মিঃ লাহা নিজের কাজে মনোযোগী হইলেন। অদূরে বিনয়কে আসিতে দেখিয়া বিশেষ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "আর আমার অপেক্ষায় রেখ না, কিষেণ! সকাল ৭টায় খবর পাই; তক্ষণি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চার্জ্জ দিয়ে মোটর একদম ফুলস্পীডে ছুটিয়ে এসেছি। সকালে সেই যা একটু চা' আর একটু ডিম্‌টিম্ খেয়েছিলুম। এসো, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে একটুখানি ঠাণ্ডা হয়েই আবার আমায় ছুট্‌তে হবে। কাল একটা 'রায়েট্ কেস্' আমারও কাছে আছে।"

কৃষ্ণা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া পরপারে বিনয়ের নিকট যাইতে চেষ্টিত বুঝিয়া তিনি সহসা পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?"

কৃষ্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই সুর প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, "না।"

"এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আর কোন ভদ্রমহিলা যোগ দিতে এসেছেন কি? তুমিই কি একজন জোয়ান অফ্ আর্ক ফিরে জন্মেছ নাকি!"

নিরুত্তর দেখিয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "কেন অনর্থক গুলি খেয়ে মরে পড়্‌বে, অথবা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হবে। পুলিসের হাতের নিগ্রহ কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়, এটাও ভেবে দেখ।"

কৃষ্ণা কোন জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া রাস্তা পার হইয়া ওপারের ফুট্‌পাতে বিনয় প্রভৃতির পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ লাহার মুখ অপমানে কালো হইয়া গেল, তাঁহার কপালের শিরা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল, দু'চোখ ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপেই সংযত রাখিয়া সোফারকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন, সে গাড়ী লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, নিজে তিনি শিকারীর খাকি পোষাকের পকেট্ হইতে সিগারকেস্ লইয়া একটা মোটা সিগার ধরাইলেন ও বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপ মাথায় লইয়া মুখের সঙ্গে মনের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতে দিতে দৃষ্টিদ্বারা কৃষ্ণাকেই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পকেট-ভরা বামহস্ত বারম্বার চঞ্চল হইয়া সেখানে গোপনে রক্ষিত ছোট্ট দোনলা

পিস্তলটাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাস্য-ভাবাপন্না কৃষ্ণার পার্শ্ববর্ত্তী বয়সে তরুণ এবং সুন্দর গঠন বিনয়কুমারের বক্ষ লক্ষ্য করিতে লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও তিনি বাহিরে শান্ত উদাসভাবেই চুরোট্ টানিয়া যাইতে থাকিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার শ্যামলাল মল্লিকের নামে গাঙ্গুলী এবং দত্ত এটর্ণীর আফিস হইতে এক পত্রে জানা গেল, তাঁহার বসত-বাটী জঙ্গীলাল ও মোহনলালেদের ঋণের দায়ে নিলাম হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মক্কেল মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জী উহা ক্রয় করিয়াছেন, সপ্তাহমধ্যে উহাতে দখল লওয়া হইবে।

এবার আর ডাক্তার মল্লিকের কাছে ব্যাপারটা লুকান রহিল না, তিনি তাঁর অন্ধকারময় জগতে প্রবল ভূকম্প অনুভব করিয়া কৃষ্ণাকে ডাকাইয়া অতি তীব্র তাপযুক্ত ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "তোমারই কল্যাণে আজ আমার পথের ভিখারী হ'তে হ'বে। তোমার শিক্ষার জন্তই যে বিপুল অর্থক্ষয় আমি বৃথা করেছিলুম, শুধু সেইটে জমিয়ে রাখ্‌লেই আমার জীবনটা সুখে কেটে যেতে পার্‌তো। তোমার মত সন্তান যদি আমার না জন্মাত!"

চির-আদরিণী কৃষ্ণা পিতার কঠিন বাক্যে মনের মধ্যে বেদনা পাইলেও নিঃশব্দে সবই সে সহ্য করিল। পিতার বাক্য অংশতঃ সত্য হইলেও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতার জন্য তিনিই যে প্রধানতঃ দায়ী, সে সত্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার লোক ছিল না, এবং দিলেও কেহ দেখে না। সাধারণতঃ অধিকাংশ বিলাত-ফেরতের মতই তাঁহারও যত্র আয় তত্র ব্যয় থাকায় কমিতেও ব্যয় কমে নাই। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—এই নীতির অনুসরণে তিনি 'ঘৃতের' পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা ব্যয়সাধ্য ও তদনুসঙ্গিক সকল প্রকার ব্যসনেরই অভ্যাস, সামর্থ্যের একবিন্দু থাকিতেও ত্যাগ করেন নাই, আজও না। পোষাক তাঁহার প্যারিসের দোকানে তৈরি হইত, কাচিতেও যাইত সেই দেশে। স্ত্রী, কন্যার পিছনে ফ্রেঞ্চ গবর্ণেস্ এবং তাহাদের মেলামেশা, চাল-চলন সমস্তই বিলাতি লর্ডেদের স্ত্রী-কন্যারই অনুরূপ। অক্ষম এবং অন্ধত্বের সীমায় পৌঁছিতেই ডাক্তারীর সমস্ত আয় একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়া অকুল-পাথারে ফেলিয়া দিল। কিন্তু স্বভাব বদ্‌লাইয়া দিতে পারিল না। কথিত আছে, মরিলেও নাকি ওটা বদল হয় না।

যাই হোক্ ডাঃ মল্লিক তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, তাঁহার নূতন প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে দিয়া মিঃ লাহাকে 'জরুরী' তার করিলেন এবং পত্রও লেখান হইল। সেদিন কাটিয়া গেল, কোন উত্তরই আসিল না। মল্লিক-সাহেবের অসুস্থ-শরীর এবং উদ্বিগ্ন-চিত্ত যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তরুণ তবে সত্য সত্যই তাঁহার আত্মম্ভর ধৃষ্ট ও অর্ব্বাচীন মেয়ের দুর্ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধ ত্যাগ করিল! মনের সহিত শরীরও তাঁহার অবসাদের চরমে গিয়া পৌঁছিল।

কৃষ্ণা সেদিনের সকল কাজের মধ্য দিয়াই নিজের ভবিষ্যৎটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। এই বাড়ী—সার্কুলার রোডের এই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদ-ভবন, এ আর তাহার নাই! সাত দিনের মধ্যে এ গৃহ জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।—শুধু তাই নয়; বৃদ্ধ অন্ধ অসুস্থ পিতার হাত ধরিয়া নিঃসম্বলে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। কোথায়?—এ প্রশ্নের উত্তর সে চারিদিক্ হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। মিঃ লাহা যে এতবড় অত্যাচার করিতে

পারিবেন, এ সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও তাহার চিত্তে কোনও দিনই উদিত হয় নাই। তা' হইলে সে এতদিন নিজেদের একটা বিলিব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেও সচেষ্ট হইত। এই বাড়ীখানার দাম—উচিত মূল্যে বেচিতে পারিলে তিন-চারি লাখ টাকাও হইতে পারিত। কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই জুয়াচুরির আশ্রয় লইয়া তাহাদের অজ্ঞাতে এর অর্দ্ধেক টাকার চেয়েও অল্প ঋণে এই বাড়ী উহারা দখল করিয়া লইয়া তাহাদের একেবারেই আজ অকূল-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল! ইহার বলেই সে যে এতদিন নিজের মনে বলসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ী বেচিয়া ঋণ শোধ দিলেও তাহার অবশিষ্ট অর্থে তাহারা অনায়াসেই ভদ্র গৃহস্থভাবে কালাতিপাত করিতে পারিবে। কিন্তু এখন? মহাজনের নিকট হইতে কোন তাগিদ তাহারা পায় নাই, আদালতের পিয়াদা শমন ধরাইয়া যায় নাই, নিলাম ইস্তাহার জারি করা হয় নাই, একেবারেই এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

এর কি বিচার নাই? বিচার! বড় দুঃখে কৃষ্ণার অধরে তীব্র শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল। যদি এই অত্যাচারী যথার্থই জঙ্গীলাল, মোহনলালরা হইত, তাহা হইলে বিচার পাওয়া যাইত কি না, তবু সন্দেহস্থলও ছিল। কিন্তু তা' যখন নয়; জঙ্গীলালেদের আড়ালে দাঁড়াইয়া যে ছদ্মবেশী মেঘনাদ তাহাদের উপর গুপ্ত শরসন্ধান করিতেছেন, তখন তাঁহার সে লক্ষ্য যে ব্যর্থ হইবে, এমন আশা বাতুলে ভিন্ন কে' করিতে পারে?—বিশেষতঃ বিচারশালার পণ্যক্রয়ের পক্ষে আজ কৃষ্ণা মল্লিকের অধিকার কেই বা সাব্যস্ত করিতে পারিবে? তদ্ভিন্ন সে নিজেও সেখানের দ্বারে আশ্রয় লওয়ার অপেক্ষা নিরাশ্রয় হওয়াকেও নিরাপদ মনে করিয়া থাকে যে। সে যে নন্‌কো অপারেটার,—কোন্ মুখে এ অবিচারের বিচার সেখানে সে খুঁজিতে ছুটিবে?

মল্লিক-সাহেব সেদিন বিছানা হইতে উঠিলেন না, কোন মতেই তাঁহাকে সে এতটুকু কিছু আহার করাইতে পারিল না, অবোধ বালকের মতন কাতর হইয়া তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন এবং মেয়ের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোর ভাগ্যে নির্ঘাত জেলখানার ভাত লেখা আছে, সে আমি আমার এই অন্ধ চোখেও দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু আমার মাথা হেঁট্ কর্‌বার আগে কেন তুই মরে গেলি না? আমায় তুই পথে বার কর্‌লি!"

"বাবা!"—বলিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিয়াই কৃষ্ণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এটর্ণী আফিস, মেকেঞ্জিলায়েলের আফিস এবং যে জহুরীর দোকান হইতে তাহারা জহরত ক্রয় করিত, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সে যখন রাস্তায় পা দিল, তখন তাহার মনে সর্ব্বস্বান্তের একটা সর্ব্বনাশা শান্তি তাহার গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়কে অত্যন্তই লঘু ও লঘুতর করিয়া ফেলিয়াছে। যে বৈরাগ্যে চৈতন্যদেব, বুদ্ধ প্রভৃতি সুখের আলয় জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতই পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বালিকা-চিত্ত যেন সেইরূপই একটা তীব্র রিক্ততা নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিল, যাহার সহিত আরও একটা তেমনি সুবিপুল অনুপম শান্তিও বিজড়িত।

এটর্ণী জানাইলেন, জঙ্গীলালদের দেনাটা সুদে আসলে জড়াইয়া এক লক্ষ সাতাশ হাজার ছয় শত টাকা ক' আনা ক' পাই দাঁড়াইয়াছিল; ইহার জন্য রীতিমত এটর্ণী আফিস হইতে চিঠি দিয়া এবং আদালত হইতে শমন প্রভৃতি ধরাইয়া আইনমত কার্য্য করা হইয়াছে। প্রমাণ—তা যদি 'ম্যাডাম' অনুগ্রহ পূর্ব্বক খবর লয়েন, অথবা তাঁহাকেই সে ভার দেন, যথাযথ জানিতে পারিবেন। নিলাম-ইস্তাহার জারী করার পরেও তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট দেখিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিতই তাঁহাদিগকে

যথাকর্ত্তব্য করিতে হইয়াছে। অন্য খরিদ্দার না থাকায় তাঁহারই এক মক্কেল উহা ঐ এক লক্ষ সাতাশ হাজার ছয় শত কত আনা কত পাইয়েই কিনিয়া লন। এক্ষণে তাঁহাদের অত্যন্ত বিনীত অনুরোধ যে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত তারিখমধ্যে বাটীর নূতন অধিকারীকে দখল লইতে দেওয়া হয়।

এক লাখ সাড়ে সাতাশ হাজার টাকা? যে বাড়ীর চার লক্ষ টাকা দর হওয়া অনভিজ্ঞেও স্বীকার করিবে, তাহা জলের দামেই চলিয়া গেল! এত বড় অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে তাহার শরীর মনের প্রতি অণুটী পর্য্যন্তই যেন তারস্বরে অস্বীকার করিয়া উঠিল। অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য লোকেরা যে ভাবে ইহাদের হাতে নিপীড়িত হয়, সেই অত্যাচার এই সহরের বুকে বসিয়া তাহাদের মতন লোকেরাও যদি স্বীকার করিয়া লয়, তবে তো ইহাদের স্পর্দ্ধার সীমাই থাকে না! কিন্তু ফল কিছু হইবে কি? এ সংসারে আজ কাল 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' এ বাক্যের সার্থকতা ঘুচিয়া 'যতো অর্থ স্ততো জয়'ই ঘটিতে দেখি। তাহার সে বস্তুটাতেই যে টান পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন—মাথায় তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ো পড়ো হইল।—মিঃ লাহার পঁচিশ হাজার টাকা দেনার মোটে সেই দশটি হাজার শোধ হইয়াছে, এখনও পনের হাজার টাকা শোধ দিতে বাকি! সে টাকা ও এই বাড়ীর ভিতরে শোধ হইল না!—উঃ! এত বড় সয়তানী—মানুষের সঙ্গে মানুষেও করে!

আদালতে—কার আদালতে সে যাইবে? যেখানে একজন গণ্যমান্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে (কারণ জঙ্গীলাল, মোহনলাল বলিয়া কেহ বাস্তবিকই আছে কি না—তাহাও সন্দেহ স্থল) একটা নগণ্য নিঃস্ব স্ত্রীলোকের বিরোধ; সেখানে তার মীমাংসা হইবে সাধারণ বিচারশালায়? আর বহু উর্দ্ধে উঠিবার পক্ষে সে যে এখন একান্তই অশক্ত!—

জহরতের দোকানের যিনি ম্যানেজার, তিনি কৃষ্ণার মায়ের আমলের পুরাতন লোক, কৃষ্ণাকে গহনা বেচিতে উদ্যত দেখিয়া অবাঙ্মুখে চাহিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন "এ কি বেবি-দিদি! ও সব জিনিষ তুমি বেচে ফেল্‌তে চাও? এর এক একটা ডিজাইন, আমার কত মাথা খাটিয়ে বার ক'র্‌তে হয়েছ জানো? এমন সব ভাল ভাল জিনিষ কি আর আজকের বাজারে তুমি পাবে?"

কৃষ্ণা স্থিরকণ্ঠে কহিল,—"আমি তো আর এ সব পরি না,—তুমি কোন্‌টার কি দাম দেবে—তাই বলো।"

বিস্তর বাদানুবাদের পর গহনা বিক্রয় হইল। মুক্তা ব্যতীত জহরতের দাম পুরাতনে অত্যন্তই কমিয়া যায়। ভগবান্ প্রসাদ যতটা সম্ভব উচিত মূল্যই দিল। একগাছি একনলি অম্লান সুগোল অথচ অনতিবৃহৎ মুক্তাহার কৃষ্ণার গলায় পরান ছিল, সেইটি খুলিয়া হাতে দিতেই সে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া উহা তাহার পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিল,—"বেবি-মল্লিক! তুমি কি তোমার ঠাকুরদাদার বইসি বুড়োর সঙ্গে আজ তামাসা ক'র্‌তে এসেছ! যাও যাও—তোমার গলা থেকে খোলা ও মালা আমি হাতে ক'রে ছুঁতে পার্‌বো না। নাও, শিগ্‌গির কুড়িয়ে নাও বল্‌চি!"

কৃষ্ণার ডাগর চোকে দুইটি বড় বড় মুক্তার মতই অশ্রুবিন্দু তাহার প্রবাল রক্ত অধরের একটি ফোঁটা হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের হুকুম তামিল করিয়া পুনশ্চ মিনতির সুরে সে কহিল "আচ্ছা দাদা-ভাই! এর দামটা কত হতে পারে সেটা তো বলে দাও! "না নাও, না নেবে।"

বুড়া গুম্ হইয়া জবাব দিল, "ভারি চালাক মেয়ে! দাম জেনে তুমি অন্য জায়গায় বেচে

এস আর কি! দেখ দিদি! ও সিলোনী মুক্তো। ওর দাম মোটে বেশী নয়, ওটা তুই ভাই কিছুতেই বেচিস্ নি। হ্যাঁ জিনিষ বটে সেই সে দিন যেটা লাহা-সাহেব কিনে নিয়ে গেছেন।”

বৃদ্ধের মিথ্যা বিজড়িত এই সস্নেহ স্তোকবাক্যে মনে মনে সকৃতজ্ঞ হাসি হাসিয়া সে মুক্তা-মালাটি কুড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছিল, পিছন হইতে ম্যানেজার বড়ই কুণ্ঠিত-ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে ফিরিয়া ডাকিল।

“ডাক্তার-সাহেবকে মনে করে দিও তো—বেবি-দিদি! তাঁর সেই হীরের নেক্‌লেশটার দরুণ যে টাকাটা ক’ বচ্ছর থেকে দোকানের পাওনা আছে, সেইটে যদি সুবিধা করে দিতে পারেন, তা হ’লে—”

সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া কৃষ্ণা বলিয়া ফেলিল, “বাবা কিনেছিলেন! হীরের নেক্‌লেশ! কই, না।”

বৃদ্ধ অত্যধিক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া তাহাদের হিসাব বই বাহির করিল, ও হিসাব এবং রসিদ বই হইতে মিঃ মল্লিকের হাতের সই দেখাইল। দুই বৎসরকার পূর্ব্বের ঘটনা। তখন মিঃ মল্লিক চোখে অল্পস্বল্প দেখিতে পাইতেন। দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া সে সাড়ে তিন হাজার নেক্‌লেশের ও পুরাতন হিসাবের কয়েক শত টাকা শোধ করিয়া চলিয়া আসিল।

একখানা থার্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে নিজের পরিশ্রান্ত দেহ-মনকে এলাইয়া দিতেই একটা অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিতে তাহার সেই শ্রান্তশরীর মন যেন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে নিঃস্ব! এই বিপুল বিশ্বের বিরাট কারবারে সে এই জীবন প্রভাতেই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়া বিদায় লইল।—এইবার তার নবজীবন প্রভাত! অমনই বিপরীত দিক হইতে তাহার এই আশা-সূর্য্যকে আড়াল করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাপের মুখ! কি অসহায়, কি দুর্ব্বল, কি অসহিষ্ণুতায় চঞ্চল সেই বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখ! কৃষ্ণার বৈরাগ্যের শান্তিতে ভরা চিত্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা গভীর অশান্তির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিল। কোথায় মুক্তি? কেমন করিয়া সে মুক্তি পাইবে? অন্ধ এবং আতুর পিতা যে তাহার এই অনাবিল, আত্ম-প্রতিষ্ঠ শান্তিময় জীবনকে নিজের ক্ষোভ জর্জ্জরিত অন্তরের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আতপ্ত করিতে ছাড়িবেন না, সে কথা দিনের আলোর মতই যে সত্য—সত্য,—সত্য! পনের হাজার টাকা দেনা এখনও তাহার বুকের উপর পাথর হইয়া ঝুলিয়া আছে, বাজার-দেনা এখনও যে তাহাকে কত দিক্ দিয়াই বেড়িয়া ধরিয়া আছে,—তাহার হিসাব করাই এক ভয়াবহ কাণ্ড! সে কেমন করিয়া মনে করিতে যাইতেছে যে, সে মুক্ত? এই সুবিপুল ঋণজাল হইতে ছাড়ান পাইয়া মুক্তি তাহার জন্য কে জানে যে কত—কত দূরেই বসিয়া আছে! সেকি তবে পাওনাদারেদের ফাঁকি দিয়া আজই রাতারাতি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে পলাইয়া যাইবে? এই চিন্তাতেও তাহার সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। যাহারা বিশ্বস্ত-মনে এতদিন পর্য্যন্ত ভদ্রলোক বোধেই তাহাদের কাছে পাওনা টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সেই সরল বিশ্বস্ততায় কঠিন আঘাত দিয়া চোরের মত লুকাইয়া ফিরিবে?—এ কাজ করিলে যে শান্তির এক কণামাত্র এত অশান্তির মধ্যেও সে উপভোগ করিতে পাইয়াছিল, এ জীবনে আর কি কখন ইহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারাও সম্ভব?

তুফানে পড়া টলমলে মনের মধ্যে একটা নূতন কথা একবার মাত্র উঁকি দিল। বিনয়বাবু তো শুনেছি বড়লোকের ছেলে, তাঁর কাছে কিছু ধার নিলে হয় না? কিন্তু সেই একটী ক্ষণের

আশার প্রদীপ পরক্ষণেই আত্ম-তিরস্কারের দমকা হাওয়ায় অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া কঠিন হইয়া গিয়া সে মনে মনে বলিল, "না, আমার এ জাগতীক সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁকে আমি কোন কিছুরই জন্যে টান্‌বো না, তা'তে আমার ভাগ্যে যত কিছুই ঘট্‌তে পারে ঘটুক্। তিনি শুধু আমার পথপ্রদর্শক, আমার গুরু, আমার কর্ম্ম-জগতের বন্ধু,—কিন্তু ব্যবহারিক-জগতে তিনি আমার এতটুকুও কেউ নন্।"

'রোখো' 'রোখো' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ীখানা হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং লাফাইয়া পাদানে উঠিয়া পড়িয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, "কোথায় চলেছেন ?"

কৃষ্ণা চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাসি-মুখের দিকে চকিত কটাক্ষ করিয়া নতমুখে কহিল, বাড়ী।"

"চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"—বলিয়াই সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না রাখিয়া সে গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল এবং কোচ্‌ম্যানের উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া বলিল, "চলো।"

এই যে অতর্কিত কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, বিনয় তো দিব্য নিশ্চিন্ত হাসিমুখে সাম্‌নের আসনে ধুপুস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, কোথায় কিরূপ কাজকর্ম্ম হইতেছে, পুলিস সার্জ্জেণ্ট কোন্ নিরুপদ্রব খদ্দরধারীকে মাত্র তাহার পোষাকের দৌলতে কিরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহারই গল্প জুড়িয়া দিল, কিন্তু কৃষ্ণা নিজেকে যেন কোন মতেই আর সহজ করিয়া লইতে পারিতেছিল না। বুকের মধ্যে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা তাহার বিপুল বেগে নর্ত্তিত হইতেছিল, ও সমস্ত মন ভরিয়া সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জা ও বুঝি তাহাদেরই অন্তরালে এক ফোঁটা অতি তীব্র সুখও উঁকি মারিতেছিল।

আপনার মনে অনর্গল বকিয়া যাওয়ার শেষে যখনই হু'স হইল, বিনয় বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণার নিরুত্তর ও নিরুদ্যম মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, "আপনার কি হ'য়েছে বলুন তো ? মুখ অত শুক্‌নো কেন ? খান্‌নি বুঝি কিছু ? না অসুখ করেছে ?"

কৃষ্ণা বিপুলবলে উথলিত অশ্রু দমন করিয়া রাখিয়া ঈষৎ হাসিতে গেল, "কিচ্ছুই তো হয়নি।"

বিনয় অবিশ্বাসের সহিত প্রবলবেগে মাথা নাড়িল, "হয়নি বই কি ! আপনার অত সুন্দর মুখ, আজ কি রকম বিশ্রী দেখাচ্চে ! হাস্‌লে যে আপনাকে কত মানায়, আজ যেন সেও অন্য রকম দেখাল। সত্যি, বলুনই না ? আমি যদি কিছু কর্‌তে পারি।"

প্রচণ্ড প্রলোভনকে প্রাণপণে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কৃষ্ণা শুধু মাথা নাড়িল,—"কিচ্ছু না।"

বিনয়কে কিছু দুঃখিত দেখাইল, সে ক্ষণকাল গম্ভীর-মুখে থাকিয়া তারপর হঠাৎ চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ও, বুঝেছি ! মিঃ লাহার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করেছেন, না ? তা' অমন হ'য়ে থাকে, ওর জন্য দুনিয়ার উপর চট্‌লে চল্‌বে কেন ? দেখুন, একটা কথা আমি যখন তখন ভাবি।"

কৃষ্ণা সে 'কথা' শুনিবার জন্য কোনই আগ্রহ-প্রকাশ না করিয়া যেমন তেমনি স্থির হইয়া রহিল।

"আচ্ছা, মিঃ লাহার সঙ্গে আপনার বন্‌বে কি করে ; আমি তো সেই কথাই ভেবে কোন হিসেব পাইনি ! উনি তো স্বদেশীর স'টী পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌তে পারেন না, ওঁর কোন পুরণ আমলা নাকি খদ্দর পরে আসার জন্যে সেদিন বরখাস্ত হয়েচে, আর আপনি তো এই—"

আচম্বিতে মুখ তুলিয়া স্থির-কণ্ঠে কৃষ্ণা বাধা দিল, "তাই জন্যই তো আমাকেও 'বরখাস্ত' না ক'র্‌বার সুযোগ দিয়ে তাঁহাকে মুক্তি দিয়েছি।"

"তা' হ'লে তাঁকে আপনি বিয়ে করুচেন না?" বিনয়ের কণ্ঠে বিস্ময় যেন ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

"না।"—

কচি-ছেলের মতন করতালি দিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, "আঃ, বেশ হবে,—বেশ হবে! এটা আমার এত বিশ্রী লাগ্‌ছিল যে, সে কি বল্‌বো আপনাকে! আপনার মত ত্যাগী, মহচ্চরিত্রা মহিলার—যাই বলুন তিনি উপযুক্ত নন্। তা' হ'লে এইবারে আপনাকে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনার করে পাব, কেমন না?"

কৃষ্ণার হৃদ্‌তন্ত্রীর সব কয়টা তার সজোরে বাঁধা এস্‌রাজের সব কয়টা তারের মতই একসঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল এবং তারপরই যেন তাহা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে গেল।

ততক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া গাড়ী থামিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়াই পিতার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম চাক্ষুষ হইল। জানিতে পারা গেল, মল্লিক-সাহেব এ পর্য্যন্ত জলস্পর্শও করেন নাই এবং ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িয়া কেবলই তাহাকে খুঁজিয়াছেন।

অপরাধ-সঙ্কুচিত পায়ের মৃদু শব্দও অন্ধের কাছে অজ্ঞাত রহিল না। অধীর আবেগে উঠিয়া বসিয়া প্রত্যাশাপূর্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হলো, বেবি! তরুণের কাছ থেকে কোন তারটার এলো? তুমি চিঠি লিখ্‌লে? আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করেই লিখ্‌লে না কেন?"

কৃষ্ণা মৃদুস্বরে কহিল, "আমি এটর্ণীর ওখানে গিয়েছিলুম।"

ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মত আবার হতাশভাবে শয্যা লইয়া তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তা'তে কি লাভ হ'বে? তারা কি তোমায় বাড়ী ফিরিয়ে দেবার জন্যে এ সব জোচ্চুরির খেলা খেলেছে! এক যে পারে তারই জন্য চেষ্টা করো বেবি! তাকেই ফিরিয়ে আন্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা করো, সে ভিন্ন তোমার আর দ্বিতীয় গতি নেই।"

কৃষ্ণা আজ মিঃ লাহার উপর যথার্থই রাগিয়াছিল। যে মানুষ নিজের স্বার্থের দিক্‌টাকে সুখের দিক্‌টাকে অতবড় প্রচণ্ড প্রশ্রয় দিয়াও সেটাকে লাভ করিতে চাহে, তার সেই হীন স্বার্থ-পরতার লভ্য হওয়ার চাইতে গলায় দড়ি দেওয়াও তার কাছে যেন গৌরবের বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছিল। পিতার অন্যায় আদেশ ও উপদেশকে আজ সে তাই সহ্যমাত্র করিতে না পারিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "বাবা! আপনি কি বুঝ্‌তে পারুচেন না, কে' আজ জঙ্গীলালদের ছদ্ম নামে আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ালে? যে লোক এতবড় অন্যায় করুতে পারুলে, এখনও তারই হাতে আপনি আমায় দিতে চাইচেন?"

ডাক্তার মল্লিক অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিলেন,—"সে এ সব জানে না,—সে এ সব করেনি, সে আমার তেমন ছেলেই নয়।—কিন্তু যদি করেই থাকে, তা' হলে তুমিই তা'কে এ কাজ করুতে বাধ্য করেচ। তোমায় ভালবেসে—তোমায় পেতে চেয়েই সে আজ অপরাধী—"

"বাবা! আপনাকে আমি কেমন করে—বোঝাব? একে আপনি ভালবাসা ব'লেন? এত জুলুম কি কেউ তা' হ'লে কর্‌তে পারে?"

ডাক্তার অধীর হইয়া কহিলেন, "পারে বেবি! পারে। সব্বাইকার স্বভাব একরকম হয় না। আমি কি তোমার মাকে ভালবাসিনি? আজও যে তাঁকে আমি প্রায় প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। কিন্তু সঙ্গে ও স্বভাবে পড়ে কত বড় বড় দুঃখ তাঁর মনেও কি দিয়ে ফেলিনি? তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততাও কই ঠিক রাখ্‌তে পেরেচি? তা' বলে কি বল্‌চি!" তাঁকে ভালবাসা আমার কারুর চাইতে কম ছিল?—না বেবি! তরুণ তোকে ভালই বাসে।—ভালবাসে বলেই পাগল হ'য়ে গিয়ে যদি করে থাকে তো কি করুচে না জেনেই করেচে। তা'কে ডাক্, তা'কে ফিরিয়ে আন্, তা'কে ভালবেসে কাছে টেনে নে! আমার শেষ দিন ক'টা আর লজ্জার মধ্যে, অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যাস্‌নে! আমি সে সইতে পার্‌বো না,—আমি সে সইতে পার্‌বো না,—"উঃ আমি! কি থেকে কি হলুম! কি থেকে কি হলুম!"

মিঃ মল্লিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ পুনঃ চমকিয়া চমকিয়া উঠিলেন।—খবরের কাগজে হয়ত' আমার সম্বন্ধে একটি প্যারা এডিটোরিয়াল বেরুবে। ওরা তার হেড্ লাইনে লিখ্‌বে—"এ রিচ্ ম্যান রুইনড্" তারপর মায় গবর্ণমেণ্ট হাউস থেকে, ক্যাল্‌ক্যাটা ক্লাব থেকে যাই না যাই যেখানের যত বড় বড় নেমন্তন্ন আস্‌তো সব বন্ধ,—বাগ্‌চী, নিয়োগী, হালদার, এমারসন্, রিচ্‌মণ্ড, কার্লাইল কেউই আর আমার বাড়ী ভুলেও মাড়াবে না। মিসেস্ হালদার একদিন আসেন তো শুধু তোমার আহাম্মুকীর জন্যে দু'কথা শুনাতে,—আর কেউ না বেবি! আমাদের কাছে আর কেউ আস্‌বে না! উঃ! আমি সে সব সইবো কেমন করে? একে এই চোখ গিয়েই তো সব গেছে, তার উপর, বেবি! বেবি! তুই আমার কি কর্‌লি বেবি? কি কর্‌লি, কি কর্‌লি!

"ভিতরে যেতে পারি?"—জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারী গৃহে প্রবেশ করিল, হাতে খোলা টেলিগ্রাফ।

"এই তারটা যশোর থেকে এক্ষুণি এসেছে।"—

"পড়ো,—পড়ো,—পড়ো।"—

"ভেরি বিজি, কান্‌ট গো নাউ" (বড় ব্যস্ত আছি, এক্ষণে যাইতে অক্ষম)।—

"অ্যাঁ! এই কথা সে লিখ্‌লে! আমি তা'কে কাতর হ'য়ে মিনতি ক'রে ক'রে তিনখানা তার কর্‌লুম, তার এই জবাব এলো! তবে আর সে আস্‌বে না, তবে আর সে আমার দিকে চাইবে না, তবে আর সে,—তবে আর সে,—তবে আর সে,—ডাক্তার মল্লিক হাঁপাইতে লাগিলেন।"

"বাবা! বাবা! স্থির হ'বার চেষ্টা করুন,—এইটুকু খেয়ে ফেলুন!"

হাত দিয়া মেয়ের হাত শুদ্ধ স্যাম্পেন গ্লাসটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অস্বাভাবিক উচ্চ-কণ্ঠে ডাক্তার পাগলের মতই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বেবি! বেবি! যদি তুই আমার বেঁচে থাকা চাস,—যদি আমার পরে' তোর কোন কৃতজ্ঞতা থাকে,—এই মুহূর্ত্তে যশোর চলে গিয়ে তা'কে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে আয়। না হ'লে এ জন্মে তোর সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। তুই আমার মেয়ে নোস্। তুই আমার শত্রু—মহাশত্রু! আমি তোকে অভিসম্পাত কর্‌বো। তুই কখন সুখী হবিনে।"

স্যাম্পেন-গ্লাসটা কৃষ্ণার হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া চূর্ণিত হইয়া গেল। পায়ের তলায় টল্‌টলে মাটি তাহার ভারও যেন আর বেশীক্ষণ বহন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

বিনয় সেদিন যখন নিজের বাসায় ফিরিল, পাখীর মত লঘু আনন্দে মনের মধ্যে নাচিতে নাচিতেই সে যেন পথটা অতিক্রম করিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠার কালেই গুন্‌গুনিয়া সে একটা পুরাতন গান মনের স্ফুর্ত্তিতেই গাহিতে গাহিতে উঠিল।

"ওহে সুন্দর! মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।

আমি রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।"—

তারপর সঙ্কীর্ণ খোলা বারান্দার রজনীগন্ধার টবের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

তুমি এসো, তুমি এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ!—

মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণহাস্য ভাতি।

তারপর গাহিতে গাহিতে তাহার সমুদয় প্রাণ মন যেন নিজের গীতসুধারসে মাতিয়া মাতাল হইয়া উঠিল। সেই পরমোৎসব রাত্রির সমুদায় উৎসব এবং সকলটুকু আমোদই যেন তাহার অন্তর-গহনের কন্দরে কন্দরে অটুট ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের রাগিণীতে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল। যেন এই ধূম ধূলি এবং কোলাহল-মুখর কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত দৈন্য এবং কদর্য্যতা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া এই তরুণ চিত্তের আনন্দ মাত্র তাহার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যেন ইহার রাজপথে ট্রাম মোটরে ঘোড়ার পায়ে কারখানার হাতুড়ি পেটায়, মানুষের কল কল শব্দে শুধু আনন্দেরই অনাহত ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, এম্‌নি সে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং তাহার সেই আনন্দ-রসে পরিতৃপ্ত কণ্ঠ সুরের পর সুর চড়াইয়া গাহিয়া চলিল—

"তব কণ্ঠে দিব মালা—

দিব চরণে ফুল ডালা;—

আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূঁতি, জাঁতি।

তারপর হঠাৎ একটা সময় তাহার মনে পড়িয়া গেল, যে এত আনন্দের আজ তাহার মনের মধ্যে আমদানি হইয়া গেল কোথা হইতে? সেই মূল তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত হইতেই সহসা নিরতিশয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সেই আনন্দোৎসের গোপন রহস্য ফাঁক হইয়া গেল এবং যা' দেখিল তাহাতে সে একেবারেই স্তম্ভিত হইল। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার জীবন-গৃহে পরমোৎসবের রাত্রি আজ আনন্দমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সে একজন সুন্দরী তরুণী। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তটীতেই তাহার পুলকাঞ্চিত দেহে মনে ব্যথার বজ্র সবলে হানিয়া সত্যের বিজুলী অসহনীয় আলোক-ধাঁধায় তাহার চোখের পর্দ্দা টানিয়া তুলিয়া ধরিল,—কিন্তু, তাহাকে—যার আগমনের আনন্দে বিশ্ব আজ অযাচিত আনন্দের অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছেন, সেই তাহাকে কণ্ঠে মালা পরাইয়া তাহার জীবন-সাথী করিয়া লইবার কোনই উপায় নাই!—

দেখিতে দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দের জ্যোৎস্না যেন নিরানন্দের অন্ধকারে ঢলিয়া পড়িল। তার উপরে যখন প্রথম অভিব্যক্তির প্রবল ধাক্কাটা কাটিয়া আসিল, তখন জানা গেল যে, বন্যার জল আসিয়া তাহার ঘরের সঞ্চয়টুকুকেও টানিয়া লইয়াছে, সুখ-সাগরের জোয়ারের টানে গা

ভাসাইয়া সহসা যেন তাহাকে অশ্রু-সাগরের কূলে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। যে জিনিষটার অস্তিত্ব আজ এই চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার কাছে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল, আজ সেইটেই সে নিজের অন্তরেরই অভ্যন্তরে ভয় পাইয়া গেল। সত্যই কি স্রষ্টার সৃজন-গৌরব-স্বরূপা সুরূপা কৃষ্ণাকে সে ভালবাসে! শুধু ভালবাসিলেই কিছু দোষ ছিল না, তা নয়, তার সম্বন্ধে তাহার মনে যেন একটা প্রবল স্পৃহা, একটা তীব্র কামনা তলায় তলায় যেন লুকান ছিল, সহসাই আজ সেটা এতটুকু সুযোগকে হাতে পাইতেই দেখা দিল কি? তা কৃষ্ণা এখন তো আর মিঃ লাহার বাগ্‌দত্তা নয়, তাহার কথা একটুখানি ভাবলেই বা আজ দোষ কি? কিন্তু দোষ নাই, এই ভাবনাটাই কি সত্য? দোষ কি যথার্থই নাই? জীবনে সর্ব্বপ্রথম দিন আজ যুবক বিনয়ের সুপ্ত যৌবন জাগিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরকে যখন বিপুল ঝঙ্কারে সাড়া দিল, তখনই তাহার মধ্যে আরও একখানা ঘুমন্ত মুখকেও সে তার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিল না।—সে উর্ম্মিলা। বিনয়ের আজ প্রথম মনে পড়িল সেই উর্ম্মিলা তাহার স্ত্রী। এ কথা আবিষ্কার করিতে গিয়া বুক আজ ভাঙ্গিতে চাহিল, তথাপি আজকের দিনে এই সত্যকে ছেলেমানুষী করিয়া উড়াইয়া দেওয়া আর কোন মতেই চলিতে পারে না। অন্ততঃ নিজের মনকেও আজ তাহার এ খবর পাইতে দিতে হইবে। উর্ম্মিলা তাহার স্ত্রী, তাহার যৌবন-সহচরী তাহার বাল্যসখীর অনধিকৃত সিংহাসনে কোন মতেই নিজের গৌরবাসন বিস্তৃত করিতে সমর্থা নহেন। যেহেতু, কেহ দিক্, না দিক্, সে আসন উর্ম্মিলারই। কারণ সে-ই তাহার স্ত্রী।

কিশোর—তাহার বন্ধু আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অর্থ এবং পরমার্থ একসঙ্গে দুইয়ের সাধনায় কোমর বেঁধে লেগে গেছ যে দেখ্‌চি! রাত্রিটা কিন্তু বেশ 'উৎসর-নিশায়' পরিণত হতে দেওয়া কর্ত্তাদের ইচ্ছা নয়। আজকের বোম্বে মেলেই বেরিয়ে পড়ে 'পরেশনাথ' যাবার হুকুম হয়েছে সেখানে নাকি জৈনী-সমাগম হবে বিস্তর। দু-একটা মোটা মহাজনকেও যদি টলাতে পারা যায়, মন্দ হয় না।"

চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিনয় সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "আমি প্রস্তুতই রয়েছি।"

এমনি করিয়া কোনওখানে নিজেকে জোড়া করিয়া দিতে দূরে ঠেলিয়া দিতে তাহারও নবজাগ্রত ভয়ত্রস্ত অন্তর ব্যাকুল উদ্বেগে ঠিক এই একই সময় পথ খুঁজিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাকাতুয়াটা মোটা গলায় 'ক্যাঁক্ ক্যাঁক্' করিয়া কেবলই ডাকাডাকি করিতেছিল; 'ব-উ-মা! —অ-ব-উ-মা'! উর্ম্মিলা খন্ খন্ করিয়া আসিয়া তাহার শিক্‌লীটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নাড়া দিয়া ভেংচাইয়া উঠিল—ব-উ-মা! অ-ব-উ-মা! আহা! আমার কতকালের গিন্নি রে!"—

ময়নাটা শিষ্ট ছেলের মত আপনা হইতেই "কালী কল্পতরু, শিবো জগৎ গুরু,"—বলিতে আরম্ভ করিয়া পালিকা-মাতার আদরটুকু বেশ করিয়া আদায় করিয়া লইল।

পক্ষীসমাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিলেও উর্ম্মিলার মনের মধ্যে সেদিন কিছুমাত্রই যেন সুখ ছিল না। শুধু আজই কেন, যতই দিন যাইতেছে, মনের ভিতর তার একটা দারুণ অশান্তি যেন বাসা বাঁধিয়া বেশ জমিয়া বসিতেছিল। বিনয়ের কলিকাতা গমনাবধিই তাহার মনের শান্তি

নষ্ট হইয়াছে, এখন অশান্তিটা ষোল আনা মনের উপরই পাকা বনিয়াদ্ তুলিয়া বসিল। যে বয়সে বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়েরা ছেলের মা ও ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত হইয়া বসেন, ততখানি বয়স পর্য্যন্ত অনবরত পুতুল খেলিয়া খেলিয়া পুতুলখেলার উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধা হইয়া গিয়া উর্ম্মিলা সেগুলাকে পাড়ায় বিলাইয়া দিয়াছে। সখ করিয়া একটা বিড়ালছানা এবং কয়েকটা লাল মাছ পুষিল। বিড়াল মাছ কয়টাকে খাইয়া ফেলিল। তখন বিড়ালটাকে সে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। এক গাদা পাখী মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া সে যোগাড় করিয়াছে বটে, তবে সেগুলাকে লইয়া তার এক মহা জ্বালা ঘটিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মনে করে—অন্যমনস্কে একদিন এদের খাঁচার দোর খোলা থাকে, আর এরা উড়িয়া যায় তো বেশ হয়! শাশুড়ী, বউএর হাসিখুসী দেখিতে পান না' মুখখানা ভারি করিয়া সে এখানে ওখানে বসিয়া শুইয়া বেড়ায়, অসুখের ভয়ে তিনি মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কপালের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও বধূর কাছে র্ভৎসিতা হন।

বিনয় এবার ফিরিয়া গিয়া অবধি সবশুদ্ধ দু'খানা পত্র বাড়ীতে লিখিয়াছে। একখানা গোমস্তাকে বিষয়-সংক্রান্ত; আর একখানা উর্ম্মিলাকে যেমন সাধারণতঃ সে লিখিয়া থাকে, কোন কাজের কথাই নয়।

আজ এতদিন পরে আর একখানা চিঠি সে পাইল। সেখানায় পূর্ব্বের মত—"ওরে বাঁদ্রি! এই সভ্য সম্বোধনটি নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাব ভাষা সকলই যেন অন্য রকম এবং তাই জন্যে উর্ম্মিলার কাছে উহা কিছু রহস্যময়। তাহা এই;—

উর্ম্মিলা!

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, অবসর ছিল না এবং ইচ্ছা ছিল শীঘ্র একবার তোমাদের কাছে যাইব, কিন্তু ফলে তাহা ঘটিল না। বিশেষ জটিল কার্য্যোপলক্ষ্যে 'পরেশনাথ' পাহাড়ে যাইতেছি এবং ইচ্ছা আছে তার পর কিছুদিন পশ্চিমপ্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, এখন শীঘ্র যে কলিকাতায় ফিরিব, তাহার সঙ্কল্প মনের মধ্যে তো নাই, পরে কি দাঁড়ায়।

উর্ম্মিলা! আজ একটা কথা তোমায় বলি বলি মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই ভরসা করিতে পারিতেছি না! মন বলিতেছে আমার সব কথাই অকপটে তোমার কাছে জানান উচিত; আমার জীবনের কোন রহস্য, কোন সঙ্কট কোন কিছুই তোমার অজ্ঞাত থাকা সঙ্গত নহে; এবং তাহাতে মনও আমার নিরতিশয় পীড়িত হইতেছে। কিন্তু উর্ম্মিলা! তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমায় আমি যেটুকু জানি, তাহাতে আমার আজিকার এই সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার চিত্তের দুর্ভাবনার অংশ তুমি বহন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমার ভরসা হয় না। তাই এখন আমার এই গোপন কথা আমার মনের নিভৃত গহনেই লুকানো থাক্। যদি কখনও জীবনের এই জটিলতার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি; যদি কখনও গুরু অপরাধের বোঝা নামাইয়া হৃদয় লঘু হয়, তবেই তোমার কাছে গিয়া সেইদিন সকল কথাই তোমায় জানাইব। আর যদি তা নাই হয়, যদি না পারি, যদি পিচ্ছিল পথে পদস্খলিত হইতে থাকে, তবে যে স্রোতে ভাসিয়াছি, শুধু তাইতেই ভাসিয়া যাইব, আর পিছনে ফিরিয়া চাহিব না। এ সব কি লিখিতেছি? জানি না, তোমার মত বালিকাকে এ সব জানানর সার্থকতা কি? জানি না। শুধু যা মনে আসিল লিখিলাম।—একটা

কঠিন কার্য্যের মহাভার মাথায় লইয়া বহির হইলাম, দেখি কতদূর কি হয়। হয় মারিব, নয় মরিব। এর আর তৃতীয় পন্থা নাই।

বিনয়কুমার।—

উর্ম্মিলার মনে এ পত্র ক্রমাগতই হেঁয়ালির জাল বুনিয়া দিয়াছে। এ রকম সমস্যায় সে তার সারা জীবনেও কখন পড়ে নাই। পাখীর খেলা ভাল লাগিল না, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে একটা কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল ও আর একবার ইহার মধ্যগত গভীর রহস্যোদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়া দিল।

দালানে জুতো-পায়ের শব্দ হইতেই উর্ম্মিলার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই কিন্তু জুতার ও চলনের পার্থক্যে তাহার অধিকারীকে চিনিতে পারিয়া একদিকে তাহার আশার জোয়ারে ভাঁটা পড়িয়া আসিলেও অপর পক্ষে আনন্দোত্তেজনায় সে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। ততক্ষণে মিঃ লাহা ঘরের সম্মুখে আসিয়া হাসি-মুখে কহিয়া উঠিলেন—"কিরে উমি! আজ বুঝি তোর ছেলে-পিলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে?"

তাঁহার গলার সাড়া পাইয়া সেই রূপসী-পাখীটা কলরব করিয়া উঠিল, "রূপু, রূপু, রূপু"!

"ময়না ডাকিল "কিরে উমি!"

কাকাতুয়া তাহার হেঁড়ে-গলা বাহির করিল;—

মিঃ লাহা হাসিয়া উঠিলেন।

উর্ম্মিলা ইতঃমধ্যে নিজের সমস্যা-পূরণের 'সমস্যা' ভুলিয়া মহাস্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে মিঃ লাহার একটা হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিতে আনিতে অনুযোগের সহিত কহিয়া উঠিল, "খুব তো শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসেছেন, জামাইবাবু! বলে গেলেন, 'এবার থেকে তোর কাছে সর্ব্বদাই আস্‌বো!' কি আসা গো!"

মিঃ লাহা শ্যালীকার নথের নোলকে একটুখানি দোলা দিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, "উর্ম্মিলে! তুমি যে আমার জন্য পলকে প্রলয়-জ্ঞান কর্‌বে, আমার এমন সৌভাগ্যের আমার তো কল্পনাও ছিল না! কোন্ একটা পত্র-দূতকেই আসামী গ্রেপ্তার করে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে?"

উর্ম্মিলা উঁহার কথা বলার ধরণে লজ্জা বোধ করিতেছিল, শেষ উপমাটায় সে একেবারে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।—"মাগো মা! বড় জামাইবাবু 'আসামী' আর 'গ্রেপ্তারের' মধ্যে এম্‌নি জড়িয়ে গ্যাছেন যে, ভাল কথা বল্‌তে গেলেও তার মধ্যেও 'আসামী-গ্রেপ্তারের' চেষ্টা বেরিয়ে পড়ে!"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই মিঃ লাহা তাহার প্রদর্শিত আসন গ্রহণপূর্ব্বক জবাব দিলেন, "কি করি বল্, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ওই বই আর তো কিছুই জুটলো না রে!"

উর্ম্মিলা বলিল, "জামাইবাবু! আপনি বুঝি কবি? গান গাইতেও পারেন, বোধ হয়? একটা গান্ না—তা' হ'লে।"

অল্প একটু নিশ্বাসের সহিত হসিয়া তরুণ কহিলেন, "পার্‌তুম রে সবই; শোন্‌বার লোকের অভাবেই সব ছেড়ে দিয়েছি।"—

উর্ম্মিলা তাহার উন্মাদিনী ও চিররুগ্না দিদির কথাই মনে করিয়া মনের মধ্যে লজ্জা ও ব্যথা

বোধ করিল। ঈষৎ অপরাধীভাবে কুণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি আজকাল কেমন আছে—জামাইবাবু ?"

"আর কেমন আছে !" বলিয়া এবার একটা নিশ্বাসকে তিনি বড় করিয়াই মোচন করিলেন।

উত্তপ্ত সহানুভূতিতে উর্ম্মিলার সরল বালিকা চিত্ত ইঁহার প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে সেই জন্ম-পাগল জীবন্মৃতা দিদির পরে' তাহার যেন একটা ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার অনাদৃত অবহেলিত নারীত্ব ভিতর হইতে পীড়িত হইয়া যেন এই কথাই বলিল, আমার সেই অর্দ্ধমৃত বোন্ যা' পেলে জ্যান্ত-মানুষ আমি তাও পেলুম না ! তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটা উত্তাপে-ভরা দীর্ঘতর শ্বাস সহসাই উঠিয়া আসিল।—সে যেন কেমন গম্ভীর ও অন্যমনা হইয়া গেল।

মিঃ লাহা তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর লক্ষ্য করিলেন অদূরে পতিত একখানা খোলা চিঠির খামের উপর। তারপর চোক ফিরাইয়া আনিয়া উৎফুল্লভাবেই উর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই গাইতে পারিস্ উর্ম্মিলা ?"

উর্ম্মিলা কুণ্ঠিতভাবে ঘাড় নাড়িল।—"উহুঁঃ।"

"শিখিস্‌নে কেন ? খুকি হ'য়ে নেচে বেড়ালে বেরাল বশ করা যায়, বর বশ হ'বে কি করে ?"

সকলকার এবং এমন কি নিজেরও মনের প্রতিধ্বনি ইঁহারও মুখে ধ্বনিত হইতে শুনিয়া অক্ষমতার লজ্জা ক্ষোভে উর্ম্মিলার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে গুম হইয়া গেল।

"উর্মি ! রাগ করলি ভাই ? আয়, বোস্, একটা কথা বলি শোন্ দেখি, আচ্ছা বিনয় কবে এসেছিল রে ? আমার কাছে লজ্জা কি ভাই ? আমি তোর ভালর জন্যেই এসেছি। তুই তো আর ছোট্টটী নেই ! নিজের ভাল মন্দ বোঝ্‌বার, ভাব্‌বার বয়েস তো তোর হয়েছে। এখন যদি এমন করে অবহেলায় সব নষ্ট হতে দিস্, চিরকাল ধরে যে কাঁদ্‌তে হবে, উর্মা !"

উর্ম্মিলা একটা অজানিত আতঙ্কে ধড়্‌ফড় করিয়া উঠিল। সে পাংশুমুখে ভগ্নিপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিবার অনেক ছিল, কিন্তু লজ্জা ভয় ও সঙ্কোচে কোন প্রশ্নই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।

মিঃ লাহা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করিয়া ফেলিয়া সেই ভূপতিত পত্রখানার উপর লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কার চিঠি রে ? বিনয়ের বুঝি ? ওঃ, তা হলে সে এখনও তোকে চিঠিপত্রও লেখে !"—বলিয়াই তিনি একটুখানি দ্ব্যর্থসূচক বাঁকা হাসি হাসিলেন। উর্ম্মিলার মন ক্রমেই আশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

"দেখি না ভাই, তোর বর তোকে কি চিঠি লিখেছে। একসঙ্গে দু'খানা নৌকা তা হলে সে তো চালাচ্ছে ভাল ! আমাদের মত আ-নাড়ি নয়। হ্যাঁরে উর্মি ! বরের লেখা প্রেমপত্র হতভাগা ভগ্নিপতিটাকে দেখাতে বুঝি মন সর্‌চে না ? কেন রে, আমি তাতে তাকে কি হিংসা কর্‌বো ? না রে, তা নয়, তুই আমার ছোট্ট বোন্‌টির মত ; তোর সুখের খবর জান্‌তে মন আমার সুখই পাবে। তবে যদি তোর লজ্জা কর্‌বার মতন কোন কথা এতে থাকে, তা হলে অবশ্য আমি তোকে বিপন্ন কর্‌তে চাইনে।—

এত বড অপবাদটাকে সহ্য করিতে না পারিয়া উর্ম্মিলা তড়িৎ বেগে উঠিয়া চিঠিখানা মিঃ

লাহার গায়ের উপরে ছুঁড়িয়া দিল। তিনি মনে ও মুখে হাসিয়া সেখানা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখে চোকে একটা অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবোত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল। পত্রপাঠ-শেষে সেখানা নিজের কোটের পকেটেই ফেলিয়া দিয়া মিঃ লাহা ডাকিলেন, "উর্ম্মিলা!"

স্বামীর পত্র পরের হাতে তুলিয়া দিয়া উর্ম্মিলা আজ একটু একটু লজ্জানুভব করিতেছিল, এবং সেইজন্য মিঃ লাহার দৃষ্টি-পরিহার-মানসে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, মিঃ লাহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়াহতভাবে মুখ ফিরাইল। সে প্রতিক্ষণেই ইঁহার বিদ্রূপে ভরা উচ্চ হাস্য ও ব্যঙ্গের ভাষা প্রতীক্ষা করিয়া লজ্জা-বিপন্ন হইতেছিল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বরে এ সকলের স্থানই ছিল না।

"উর্ম্মিলা! এ চিঠির অর্থ তুমি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিলে?—পারো নি বোধ হয়? কেমন করে পারবে! তুমি যদি অমন বোকাই না হবে, তা হলে আর আজ তোমার এ রকম সর্ব্বনাশ হতেই বা বসেছে কেন? শোন তা হলে, তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসে না, তোমায় সে কোন দিনই স্ত্রী বলে স্বীকার করে নি কেন জান? সে আর একজন স্ত্রীলোককে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে ভালবাসে,—তাকে সে বিয়ে ক'র্‌তে চায়। এ কথা তোমার শাশুড়ীও জানেন, ইচ্ছা হয় তাঁকেও তুমি জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে পার।"

একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বর উর্ম্মিলার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল।—

"বুঝ্‌তে পার্‌লে এখন ওই হেঁয়ালীর মানে? কোন্ পিছল পথে তাঁর পা পড়েছে; কোন্ স্রোতে তিনি ভেসে যাচ্চেন—" 'কোন্ সঙ্কটের মধ্যে তিনি জড়িয়ে গ্যাছেন,—এখন বুঝ্‌লে কিছু? —তিনি যাকে ভালবাসছেন, সে তোমার চেয়ে শত গুণে সুন্দরী এবং সহস্র গুণেই শিক্ষিতা, তুমি তার পায়ের কাছে দাঁড়াবারও যোগ্যা নও; এখন তোমার নিজের অবস্থাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে? উর্ম্মিলা! ও কি! ও কি ক'র্‌চো!"

ত্রস্তে উঠিয়া তিনি উর্ম্মিলার এলাইয়া-পড়া দেহ ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলেন। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া জলের কুঁজা হইতে এক অঞ্জলী জল আনিয়া মুখের উপর জোরে ঝাপ্‌টা দিতেই সে চোক চাহিল।

"কি বিপদ্! আঃ, মেয়েগুলো কি সব সমান সেন্টিমেণ্টাল! উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলা! ও রকম ক'র্‌চো কেন? এখন কি অত অধৈর্য্য হ'লে চলে? মনে বল করো, মাথা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে চেষ্টা করো, তবে তো তাকে রক্ষা করতে পার্‌বে।"

উর্ম্মিলার দু-চোক দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিতে লাগিল।—

"ছিঃ, কেঁদ না! স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে, এ তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ বলেই আজ এত করে তোমায় বোঝাতে হলো, নইলে এ ত আর নূতন কিছু নয়। যাই হোক্, আমি যখন সব জান্‌লুম, তখন তোমার যতদূর সুবিধা করা যায়, তা আমি কর্‌বোই। কিন্তু শুধু তো আর এই নয়, সে আরও একটা মস্ত বড় বিপদের মধ্যে যে মাথা দিয়ে রেখেছে।—সে বিপ্লবপন্থী।"

এই 'বিপ্লবপন্থা' সম্বন্ধে উর্ম্মিলার জ্ঞানও খুব বেশী নয় এবং এ কথাটা তাহার অসহ্য যন্ত্রণানলে বিদগ্ধপ্রায়-চিত্তে ভাল করিয়া স্থানও লাভ করিল না। সে যেন তখন কি এক রকম হইয়া গিয়া

শুধু এই কথাটাকেই এক এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গারের মত নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছিল, যে 'বিনয় তাহাকে ভালবাসে না, তাহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহাকে ভালবাসে, যাহাকে সে পাইতে চায়, সে তাহাপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী!' মিঃ লাহার কথায় কান্না তাহার থামিল না বরং এবার সে মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ছি, উর্ম্মিলা! ছি, চুপ করো। বিনয় বরাবরই তোমার সঙ্গে নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ করে আস্‌চে, আর তুমিও এতদূর সহ্য করে থেকেই তো তাকে এতবড় প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছ! তা সে যা হবার হয়েছে, আমার উর্ম্মিলার চোখের জল ফেলান তার ব্যর্থ হবে না। এর জন্য তাকে কঠিন শাস্তি পেতেই হবে। আচ্ছা, এখন তুমি তোমার শাশুড়ীকে একটীবার ডেকে আনতো, তাঁকে প্রণাম করে এখ্যুনি আমি বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, ভাল কথা, তাঁকে ডেকে দিয়ে আমি যা লিখে দিই, এই কথাগুলি তুমি একখানি চিঠিতে লিখে বিনয়কে পাঠাও দেখি। দেখ, এ সব সময় লজ্জা সঙ্কোচ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হবে, মনকে জোর করে বাঁধ্‌তে হবে, না হলে তোমার হারানিধি তুমি ফিরিয়ে পাবে কেমন করে? আচ্ছা, তুই ওপোরে পাঠ কি লিখিস্ রে? কিছু না! হারে বোকা-রাম! এম্‌নি করেই স্বামীটীকে একেবারে হারিয়ে বসেচ?

সে চিঠিখানার মিঃ লাহার উপদেশ ও আদেশ মত উর্ম্মিলা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিল। সেখানা এই রকম।—

তোমার চিঠি পেয়ে আমারও বড্ডই ভয় ও ভাবনা হচ্চে! আমি কত কাঁদ্‌লুম।—কি করেছ তুমি? কি সঙ্কটের মধ্যে তুমি ঢুকৃতে গেছ? তোমার জীবনের কোন্ রহস্যের কথা লিখেছ? যে কাজ আজ ক' বচ্ছর ধরে তোমরা করৃতে চেষ্টা করৃছিলে, সেই গুপ্ত কথা কি কেউ জান্‌তে পেরে গেছে? অথবা আর কিছু? তুমি জানো, তোমাদের মতন অত ধারালো বুদ্ধি আমার নয়। আমি কি অত সব ছেঁদো কথা ধরৃতে পারি? আমার মন ছট্‌ফট্ করৃচে, কেবলই কান্না পাচ্চে, (এইখানে চোখের জলে কাগজ ভিজিয়া কালি মাখা হইয়া গিয়াছে) কেন তুমি সঙ্কটের মধ্যে পড়্‌তে গেলে? কেন তুমি আমার কাছে ফিরে এলে না? তাই এসো; ও-সবে আমাদের কাজ কি? 'মারিতে গেলে যখন মরিবারও' সম্ভাবনা নিজেই লিখেছ, তখন কাজ কি তেমন দুঃসাহসিক কাজে যাওয়ায়? না, আমাদের স্বরাজ চাই না, স্বাধীনতা চাই না,—সাহেবরা সব যেমন আছেন থাকুন, তুমি শুধু চলে এসো। ওগো, তুমি শীঘ্র না এলে আমি মরে যাব।— সত্য বল্‌চি, ভয়েই মরে যাব। তুমি শীঘ্র এসো।—

উর্ম্মিলা।

মিঃ লাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, "তোমার উর্ম্মিলা।' সেখানটা লিখিতে গিয়া খুব এক চোট গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উর্ম্মিলা 'তোমার'টা বাদ দিয়া লিখিল শুধু উর্ম্মিলা। তাহার,— বিনয়ের কই তা তো সে নয়!—উর্ম্মিলাকে তো সে এক দিনের জন্যও সে পদ, সে অধিকার দেয় নাই! তবে শুধু শুধু গায়ে পড়িয়া আর এ আদর কাড়াইতে যাওয়া কেন? তাহার মনের প্রাণের সবখানি যে জুড়িয়া আছে, সেই হয়ত কত আদরে গলাইয়া আজ তাহাকে কত কথাই লিখিতেছে! উর্ম্মিলা কিসের জোরে ও-সব কথা লিখিতে যাইবে? সে ত আর তার মত সুন্দরী বা শিক্ষিতা নয়! রাগে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উর্ম্মিলার নাক চোক সব

ফুলিয়া উঠিল। মুছিয়া মুছিয়া কিছুতেই আর আহত অশ্রু-প্রবাহকে সে রোধই করিতে পারে না। একবার চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়াই সঙ্কল্প স্থির করিল। ঠিক্ এম্‌নি সময়ই মিঃ লাহা জগদ্ধাত্রী-প্রদত্ত আহার্য্য এক আধটুকু নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিবার ত্বরায় অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া ডাকিলেন,—"উর্ম্মিলা!"

উর্ম্মিলা যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, এম্‌নি করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা মুড়িয়া লাহার অনুকরণে বাংলায় ঠিকানা লেখা খামের মধ্যে ভরিয়া ফেলিল, এবং সেখানা হাতে করিয়া ত্বরিতে বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়া আরক্ত ও স্ফীত মুখখানা অস্বাভাবিক দীপ্ত দেখাইতেছে।

"আমায় গাড়ি অবধি পৌঁছে দিবি আয়। ওঃ, বড্ড ভুলে গেছ্‌লুম রে! তোর জন্যে এই একটা রুবির ইয়ারিং এনেছিলুম যে!"—

"নাঃ, রোজ রোজ এ সব কেন?"

"দিলুমই বা? দেবারও তো আমার নেই কেউ, মনুষ্য-জন্মে সাধ তো সবই যায়। তোর দিদি যদি মানুষের মতন হতো, তো সে কি দিত না?"

উর্ম্মিলা এই স্নেহের দান আজ আর কোন কিছুরই জন্য নয়—শুধু একমাত্র হিতকামীর দেওয়া বলিয়াই অত্যন্ত অনাগ্রহ ও অনিচ্ছার মধ্যেও গ্রহণ করিল। নহিলে বিনয়ের প্রতি তীব্র অভিমানে সমস্ত পৃথিবীটাই তাহার কাছে তখন তুচ্ছ—তুচ্ছতম হইয়া গিয়াছে এবং সেই মর্ম্মভেদী অভিমান ক্রমশঃই তাহার বক্ষের মধ্যে উত্তাল ক্রোধের আকার ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নীচে নামিয়া আসিয়া মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি লেখা হয়েছে রে?"

উর্ম্মিলা মাথা হেলাইয়া জানাইল 'হ্যাঁ'।—

"তা হলে সেটা আমার হাতেই দাও না কেন? ষ্টেশনেই পোষ্ট করে দিয়ে যাই।"

নিরুত্তরে উর্ম্মিলা চিঠিখানা মিঃ লাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চক্ষে প্রশ্ন বুঝিয়া এবং তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ লাহার মনেও একটু দুঃখ বোধ হইল। তার পিঠে হাত দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "কি রে উমি?"

চোক নত করিয়া উর্ম্মিলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চিঠিতে ও-সব কথা লিখেছেন কেন?"

মিঃ লাহা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিলেন, জোর করিয়া মনের দ্বিধাটুকুকে সরাইয়া দিয়া পরে উত্তর দিলেন—

"তা হলে সে ভয় পেয়ে তোমার ভুল ভেঙ্গে দিতে ছুটে আস্‌বে, আর এলে পর মা'তে ও তোমাতে বিস্তর কাঁদাকাটা করে তাকে ফির্‌তে দেবে না। কেমন? কিন্তু দেখ, আমার কথা যেন কিছু বলো না তাকে।"

উর্ম্মিলা মুখে আর কোন কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল, "আস্‌তে হয় আস্‌বে, কিন্তু আমায় যে ভালবাসে না, অন্যকে ভালবাসে, আমি আর এ জন্মে কখনই তার মুখের দিকে চাইতে পারবো না। আমার সব কিছুই এ জন্মের মতন হয়ে গেল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিবসের অবশিষ্টাংশ ও সমস্ত রাত্রিই অভুক্ত বিনিদ্র এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহপরায়ণ বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে লইয়া তেমনি অনাহারী এবং বীতনিদ্রা কৃষ্ণার প্রাণ বাহির হইয়া উপক্রম করিতেছিল, অথচ যায়ও না ত! দু'দিন আগে যে সংসারাতীত সুখসৌভেগ্যের কোলের মধ্যে বসিয়াছিল, ঐশ্বর্য্যের চরম ভোগসুখে যে দেহ আজন্ম লালিত, সেই শরীর-মনে একসঙ্গে সকল দিক দিয়া এই যে প্রচণ্ড দুঃখের শ্রাবণ-ধারা বর্ষিত হইতেছে, সে যে কেমন করিয়া সহিয়া আছে, এই টুকুই যেন তাহার নিজের কাছেই পরম বিস্ময়ের মত ঠেকিতেছিল। কূর্ম্ম যেমন হস্তপদ সমস্তই ভিতরে টানিয়া লয় ও পিঠের কঠিন সর্ব্বসহ আবরণটাকে, এমন কি, এই বিপুলা ধরিত্রী-ধারণের ভারও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেও তেমনি করিয়াই তাহার উপর উদ্যত সকল দুঃখকেই সহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মন এই কঠোর ত্যাগ-ব্রতের মহা সন্ধিস্থলে পড়িয়া যেমন দৃঢ় তেমনই প্রশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের ও অন্তঃস্থলে সে যেন এই মহা পরীক্ষায় ভগবৎ-প্রেরণা ও তাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদের ধারা অনুভব করিয়া ইহারই মধ্যে মধ্যে একটা নিগূঢ় আনন্দ হৃদয়ের তলে তলে অনুভব করিতেছিল। মন যেন তাহার এই দুঃখ-দৈন্য-লাঞ্ছনা-অবমাননাকে মাথার মুকুটের মতই পরম পরিতোষে তুলিয়া লইয়া এই কথাই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল'—

"আরও দুঃখ সইবে আমার সইবে আমারো,
আরও কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।"

কিন্তু আর দুঃখ সহিল না। "জীবন-তার" এর চেয়ে কঠিন সুরের ঝঙ্কারে ছিঁড়িয়া পড়ে পড়ে হইল। সারা দিন-রাত্রের মধ্যে যখন মল্লিকসাহেব জলস্পর্শ না করিয়া 'প্যাসিভ্ রিজিষ্টান্স' (নির্ব্বিরোধ অবাধ্যতা) অবলম্বন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। এই দুর্ব্বল-বৃদ্ধ-শরীরে তাহাতে তাঁহার প্রাণহানিরও আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িয়া তখন কৃষ্ণার দৃঢ়সঙ্কল্পও শিথিলীকৃত হইয়া আসিল।

নিজেদের ভবিষ্যৎটাকে ইতঃমধ্যেই সে খানিকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল, গহনা-বেচা টাকার মধ্যে এক হাজার মাত্র হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট এগার হাজার সে মিঃ লাহার জন্য ইন্‌সিওরড্ পত্রে শীল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই হাজার টাকা এবং তাহাদের বিখ্যাত ফার্ণিচারগুলার, রূপার বাসন-পত্রের, যে দাম উঠিবে, উহাতেই খুচরা বাজার-দেনা কয়েক হাজার শোধ দিয়া একখানি ছোটখাট বাড়ী বালী বেলুড় এম্‌নি কোন জায়গায় ভাড়া লইয়া তাহারা দু-এক দিনের মধ্যেই সেখানে উঠিয়া যাইবে। সঙ্গে পিতার ভৃত্য দুইটী থাকিলেই যথেষ্ট। অবৈতনিক (মিঃ লাহার দত্ত বেতনভোগী) প্রাইভেট্ সেক্রেটারীটাকে শুদ্ধ সঙ্গে লওয়া হইবে না। সেখানে তার প্রয়োজনই বা কি? আর কি ধনীসমাজের কেহ তাহাদের সহিত সম্বন্ধই রাখিবেন? সেই ভোগবিলাসের জগৎ হইতে তাহাদের নাম দু-দিনেই তো মুছিয়া যাইবে; এটা বিশেষ জানা কথা।—তারপর তাহাদের চলিবে কিসে? সেই কথাটাই কৃষ্ণা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। কোন মেয়েস্কুলে সে শিক্ষয়িত্রী হইতে অক্লেশেই পারে, কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষ ক্ষতি এই যে, তাহার অন্ধ পিতার দেখা শুনা প্রভৃতির অসুবিধা ঘটিবে। তার চেয়ে কোন ভদ্রপরিবারের মেয়েদের গান-বাজনা শিখাইতে এক এক ঘণ্টা সময় দিলে, দু জায়গায় অন্ততঃ সত্তর আশী টাকাও তো পাওয়া যাইবে। একবার তাহার ঠোঁটের গোড়ায় একটুখানি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরই সে গম্ভীর হইয়া মনে

মনে বলিল, আমার নিজের এখন পঁচিশ টাকা হইলেই চলিয়া যায়। মিতব্যয়িতার পরম শান্তি অনুভব করিয়া সে তৃপ্ত হইল।—কিন্তু কল্পনা-রচিত, আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবে ভরা ভবিষ্যৎ তাহার বর্ত্তমানের মহা সমস্যার ভারে তখন টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশ সেদিন ঘন-মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষার বাতাস থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্ত ক্রন্দনের রোল তুলিতেছিল। মেঘ-ব্যাপ্ত অন্ধকার রাত্রির বক্ষে ভীতশিহরণ জাগাইয়া কাহার মমতা-হীন রোষ-দৃষ্টির ন্যায় তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিতেছে। যেন কোন মর্ম্মাহত অন্তরের অভিশপ্ত পরিতাপের মত বজ্র হাঁকিয়া উঠিতেছিল, কড় কড় কড়।—আর এই সকল কঠিন ও অসহ্য শাসনে লাঞ্ছিতা প্রকৃতি হু হু শব্দে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছিলেন, আর তাঁহার বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত-নিঃস্রাবের মতই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল—ঝর্ ঝর্ ঝর্।

সারা রাত্রি চোরের মত নিঃশব্দে বাপের ঘরেরই এক পাশে তাঁহার অকথ্য মনোবেদনার সাক্ষ্য স্বরূপে বসিয়া থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ফাটিয়াপড়া শরীর-মন লইয়া শেষ-রাত্রে সে নিজের ঘরে ফিরিয়া লুটাইয়া পড়িল। আর সহিবার বহিবার শক্তি তাহাতে নাই! আর আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রসাদকে সে ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—আর এ জীবনের সুখশান্তি আশা-তৃষ্ণাকে ত্যাগ-সংযম, দৃঢ়তা-নিষ্ঠাকে সে আশ্রয় করিয়া থাকিতে ভরসা করিল না। এমন কি, তাহার অন্তরের নবজাত সুকুমার—ভীরু, অথচ প্রগাঢ় ও পবিত্র প্রেমকেও সে জলাঞ্জলি দেওয়াই স্থিরীকৃত করিল। নতুবা যথার্থই যে তাহাকে পিতৃ-ঘাতিনী হইতে হয়!—কিন্তু একি পরাভব? ভগবান্! হা ভগবান্! বাস্তবিকই কি তুমি প্রবলের ঈশ্বর? দুর্ব্বলের কি তুমি কেহ নও? বলীর বাহু তোমার আশ্রয় স্থল বটে; কিন্তু তাহার অত্যাচারের খড়্গকেও কি তুমি প্রশ্রয় দিবে? কিন্তু কাহাকে এ বৃথা অনুযোগ? অত্যাচারের উদ্যত দণ্ডে কবে না ভাগ্যহীনের মাথা ফাটিয়া থাকে! আজ কি তাহারই জন্য এ নূতন সৃষ্টি হইল? মনে পড়িয়া গেল, সেই অত্যাচারিতা 'নবার মা' বুড়িটার কথা!—সে বলিয়াছিল, 'যারা মানুষের বুকের উপর দিয়ে চাকা চালিয়ে হাওয়া গাড়ি করে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়—তাদের বুক এম্নি করে মড়মড়িয়ে ভাঙ্গে তবে না আমার যন্ত্রণা যায়!—'

আজ তার সে মর্ম্মান্তিক অভিশাপই বুঝি ফলিতেছে। এর চেয়ে তার বুক যদি সত্যসত্যই সেই রকম করিয়া গুঁড়াইয়া পড়িত! না, তিনি যে ন্যায়ের দণ্ড বহনকারী—ন্যায়ের মর্য্যাদা এম্নি করিয়াই যে রক্ষা করেন। ভোরের বেলা প্রাইভেট্ সেক্রেটারী খবর পাঠাইয়া দিয়াছে মিঃ মল্লিকের অবস্থা বিশেষ মন্দ। তিনি ডাক্তার আনিয়াছিলেন, ডাক্তার বলিয়া গেলেন, নাড়ি অতি ক্ষীণ; হার্ট যতদূর দুর্ব্বল হইতে হয়, হইয়াছে। বলকারক ঔষধ পথ্য খুব শীঘ্র পড়া বিশেষ আবশ্যক।—

কৃষ্ণা কম্পিত-হস্তে কোন মতে কাপড়টা বদলাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

"বাবা! বাবা! বাবা!"

"অ্যাঁ!"—বলিয়া মিঃ মল্লিক অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন।

"সে কি, এসেছে? তরুণ! তরুণ! এলে কি তুমি?"

"বাবা! শীঘ্রই তিনি আস্‌বেন। তুমি যদি একটু কিছু খাও, তা হলে আমি এক্ষুণি তাঁকে আন্‌তে যাব। না খাও তো কিন্তু কিছুতেই যাব না"

"সত্যি যাবি? তাকে বিয়ে কর্‌তে আর অমত কর্‌বি নে? বেবি! ঐকি সত্যি বল্‌ছিস্?"

"তোমার কাছে কি মিথ্যে বল্‌বো ? তোমার জন্ত আমায় করতেই হবে। কিন্তু তা হলে এখন তুমি কিছু খাও, না হলে আমি যাব কি করে ?"

"তবে দে, খাচ্ছি। আঃ! বেবি! বেবি! মা আমার! কই, কোথায় তুই! আয় যাদু আমার! আমার অন্ধকারের আলো! বুকের মধ্যে তোর মুখটা রাখ। কত মন্দ কথাই বলেছি, কিছু মনে করো না বাবা আমার! বুড়ো হয়েছি, কাণা হয়ে গেছি। ভেবে দেখ দেখি, কত যন্ত্রণা আমার! কি ছিলুম কি হলুম, আরও কি হ'তে যাচ্চি ? তবু এ বিয়েটা হলে এখনও মানটা কতক বজায় রেখে যেতে পারি। যাও কিষু! মনে কোন ক্ষোভ না রেখে তাকে হাতে ধরে নিয়ে এসো।—কিছু করতে হবে না, সে তোমায় দেখ্‌লেই সব ভুলে যাবে। সে আমার তেমন ছেলেই নয়। তার তোমা-অন্তঃ প্রাণ যে!"

বাহিরে আসিতেই প্রাইভেট্-সেক্রেটারী পর্দ্দার আড়াল হইতে সরিয়া গেল।

নিজের কাজকর্ম্মটুকু সারিয়া বাপের যেটুকু কাজ তার নিজস্ব সেইটুকু সম্পন্ন করিয়া দিয়া বাহির হইতেই কয়েকখানা পত্র পাইল। তার মধ্যে দুইখানার উপর নজর পড়িতে হাত যেন তার আড়ষ্ট হইয়া আসিল।—দুখানা ঠিক দুজন প্রতিযোগীর নিকট হইতে আসিয়াছে।

প্রথম সে বিনয়ের খানা খুলিল, খুলিতে সময় কুলাইল না, দ্রুত-কম্পিতহস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে পত্র পাঠ করিল। পাঠকালে হৃদ্‌পিণ্ডের অত্যধিক চঞ্চলতায় মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষের দৃষ্টিও যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

"কৃষ্ণা!

কি লিখিব, ভাবিয়া না পাইয়া তোমায় তোমার নিজ নামেই সম্বোধন করিবার স্পর্দ্ধা গ্রহণ করিলাম। তোমাদের নব্য এটিকেটে এটা নিতান্ত অসভ্যতা তা জানি; কিন্তু তুমি তো জানই; কোন রকম সভ্যতার ইতিহাস যদি আমার পড়াই থাক্‌বে, তবে আমার এ রকম দশাই বা কেন ?—

আমাদের পক্ষে একান্ত লাভজনক একটা শক্ত কাজ হাতে লইয়া দূরে চলিলাম। যাত্রাকালে একটিবার তোমায় দেখিয়া যাইবার জন্ত লোভের সীমা নাই, কিন্তু এত বেশী আগ্রহ বলিয়াই তাহা দমন করিলাম। কিছুদিন ফিরিতে বিলম্ব হইবে। মধ্যে মধ্যে পত্র দিবার লোভটাকেও কি ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে ? দূরে থেকে একখানা একখানা চিঠি লিখ্‌লে আর দোষ কি ?—তুমি উত্তর দিবে তো ?—দিও, সত্যি দিও। তুমি তো আর এখন কারু কাছে বাঁধা পড়ে নেই ? তা হলে আমাদের এই নির্ম্মল বন্ধুত্বের বন্ধনটুকুকে ছিঁড়ে ফেল্‌বার কি এমন আবশ্যক আছে ?

ঐ যাঃ! আগাগোড়াই 'আপনি' লিখ্‌তে 'তুমি' লিখে এসেছি ভারি হাসি পাচ্চে! কিন্তু তাই বা কি বল্‌বো ? 'কৃষ্ণা' লিখে আর 'আপনি' লিখ্‌তুম কেমন করে, অ্যাঁ ?—ও ঠিকই হয়েছে। রাগ করো নি তো ? না, তুমি তো রাগ করো না। আজ আর মোটে সময় নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যে কাজটা হাতে নিয়েছি, তা'তে যেন সকলকাম হই।

তোমার বন্ধু—বিনয় শীল।

সেই চিঠিখানা কোলে করিয়া মৃত-প্রিয়তম ক্রোড়ে সর্ব্বহারা অভাগী নারীর মতই কৃষ্ণা বহু বহুক্ষণ অভিভূতাবৎ বসিয়া রহিল। চিঠিখানার এক একটা শব্দ শোকাচ্ছন্ন-চিত্তে—সদ্য-মৃত

প্রিয়জনের শেষ স্নেহাভিব্যক্তির ন্যায় তাহার অন্তরের ছিন্ন-ভিন্ন এলোমেলো তন্ত্রীতে ঘা দিয়া দিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনটা যেন দেখিতে দেখিতে একখানা নূতন সাজান চিতার মতই কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আগুনের দুরন্ত শিখা যেন তাহাকে আর একবার নূতন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিল।—তারপর শ্মশান-বৈরাগ্যের মতই বিরাগভরা শূন্যচিত্তে সে মিঃ লাহার পত্র গ্রহণ করিল। সে ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম এই—

আমার প্রিয় বেবি!

কাজ-কর্ম্মে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কদিন তোমার কোন খোঁজ খবরই রাখ্‌তে পারি নি, তার জন্য ক্ষমা চাইচি। বাইরে খবর রাখ্‌তে পারিনি বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তোমার মুখ সর্ব্বদাই যে পদ্মের মতন ফুটে রয়েছে!

তোমার বাবা আমায় যাবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাচ্চেন,—লিখ্‌ছেন,—তিনি নাকি বড়ই বিপন্ন! শীঘ্র যেতে ব'লেছেন।—কিন্তু বেবি! জান তো আমি পরের চাকর। ইচ্ছা ক'র্‌লেই তো আর আমার য'াবার শক্তি নেই। কি তাঁর বিপদ?—কি হ'য়েছে তাঁর? তুমি কিছু জানো কি? জান্‌লেও হয়ত' আমায় জানাবার মতন দরকার আছে বলে মনে কর নি? না হ'লে তুমিই তো তাঁর বদলে আমায় যাবার কথা লিখ্‌তে পার্‌তে? যাই হোক্, যদি প্রয়োজন বোধ করো, সেই মুহূর্ত্তেই আদেশ করো; তোমার কাছ থেকে একটুকু ইঙ্গিত পেলেই যেমন করেই হোক্, আমি ছুটে যাব। তুমি জান, তোমার জন্য এ পৃথিবীতে এমন কোন ভাল-মন্দ কাজই নেই—যা' আমি কর্‌তে পারি নে।

আশা করি, তোমার বাবা তেমন কোন বিপদে প'ড়েন নি? আশা করি, তুমি শারীরিক কুশলেই আছ?

তোমারই চিরানুগত—তরুণ।

সর্প-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুর কবলে অর্দ্ধ-পতিত মানুষের মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখে কৃষ্ণা তাহার অবশ অঙ্গুলী-মধ্যে কোনমতে কলম তুলিয়া লইয়া লিখিল।—এগ্রি টু ইওর্ টার্‌মস্—কম্ (তোমারই প্রস্তাবে সম্মত, আইস)।

নিজের হাতে এই টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিয়া সে যেমন বাহিরে পা দিয়াছে, দেখা হইয়া গেল—তার পিতার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর সঙ্গে। লোকটি দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই জানাইল, মল্লিক-সাহেব তাহাকে খুঁজিতেছেন।

কৃষ্ণা দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল, এবং কি মন্ত্রে বলা যায় না—কৃষ্ণার প্রেরিত টেলিগ্রামের মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ জানিয়া লইয়া নিজে এই মর্ম্মে মিঃ লাহাকে আর একটা তার করিয়া দিল, "বেষ্ট টাইম্ ফর্ ইওর্ কমিং" (আপনার আগমনের সমুচিতকাল উপস্থিত)।

নিজের বহনোক্ষম শরীরকে বহিয়া লইয়া সেদিনের বাড়ী ফেরাটাই যেন কৃষ্ণার কাছে এক মহাবিস্ময়! তারপর এই যে কাজটা সে করিয়া আসিল, ইহার পর আর শরীরের ক্লান্তিবোধ বা স্নানাহারের প্রয়োজনীয়তা তাহার কিছুই বাকি রহিল না। মন যেন তার এই কথাটাই শুধু নালিশ করিয়া বলিতে লাগিল,—

"ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা,
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।"

প্রথমেই পিতার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

মেয়ের সাড়া পাইতেই তিনিও ব্যগ্র হইয়া মাথা তুলিলেন, "কিরে, বেবি ?"

"তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে ?"

"কই না, কে বল্‌লে ? তুমি কোথায় ছিলে ?"

"টেলিগ্রাফ-অফিসে। মিঃ ভদ্র গিয়ে বল্‌লেন ; তুমি আমায় ডাকৃচো।"—

মিঃ মল্লিক ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিলেন, "বল্‌তে পারিনে তো, আমি তো কই ডাকিনি। তরুণকে তার দিলে ?"

মিঃ ভদ্র সম্বন্ধে মনে মনে কিছু সন্দিহান হইয়া কৃষ্ণা পরে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিল, "হুঁ।"

"যাবার খবরটা দিলে বুঝি ?"

"না, আস্‌তে বল্‌লুম।"

"যদি না আসে ?"

"না আসার কারণ তো কিছু নেই, তাঁর মতে সম্মত হয়েছি, এই কথাই তো জানালুম।"

"কি লিখ্‌লে ?"

কৃষ্ণা টেলিগ্রামে যাহা লিখিয়াছিল, বলিল। শুধু 'টারম্‌স্' না বলিয়া ওইখানে "প্রোপোজাল" শব্দটা ব্যবহার করিল। শুনিয়া ডাঃ মল্লিক কিছু সন্তুষ্ট কিছু অসন্তুষ্টভাবে মন্তব্য করিলেন, "হয়েছে মন্দ না, তবে কিনা, তোমার ওই পয়সা বাঁচাবার জন্য যেমন একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে, সে কোথায় যাবে! যাই হোক্, ভালই করেছ। শীঘ্র শীঘ্র তরুণ এসে পড়্‌লে বাঁচা যায় এখন। এতে সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। কাল তা'তে রবিবার আছে।"

শনি এবং রবিবারটা ডাক্তার মল্লিকের একান্ত অশান্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়াই তাহার আষাঢ়ান্ত বেলা লইয়া দিব্য মন্থরগতিতে বিদায় লইল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ছিয়ানব্বুইবারও তিনি প্রত্যেক পদশব্দে, এমন কি বাতাসের শব্দেও চমকিত হইয়া ডাকিয়া উঠিতেছিলেন— "তরুণ!

রবিবারে এই অধীর ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল! প্রাতে উঠিয়াই কন্যাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বেবি! আজ নিশ্চয়ই তরুণ আস্‌বে। নিজে আস্‌বে বলেই সে কাল তোমার টেলিগ্রামের জবাব দেয়নি। তুমি হয়ত সেই বিশ্রী মোটা শাড়ীই পরে আছ? চেহারা হয়ত তোমার অযত্নে শ্রীহীন হয়ে গেছে? কিচ্ছুই তো আর আমার দেখ্‌বার উপায় নেই! যাও, একটু যত্ন করে গা হাত সাফ করে নাও গে। ভাল দেখে কাপড়-চোপড় পরে, চুনির ব্রেস্‌লেট্ মুক্তার মালা আর যা কিছু তার দেওয়া আছে, সেইগুলি সব পর্‌বে। সে এসে দেখে যেন দুঃখিত না হয়, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ না করে।"

এক সময় বহুদিন অপরিচিত অল্প একটুখানি পুষ্পসারের মৃদু সৌরভে ও একখানা নূতন

শাড়ীর খস্‌খসানীতে কন্যার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত বেলা রে?"

"সাড়ে আট্‌টা, বাবা! এইবার তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে—"

"বলো কি বেবি! রাত্তির সাড়ে আট্‌টা?—তা হ'লে তো তরুণ আজও এলো না! সত্যিই তা হ'লে সে আমাদের ত্যাগ কর্‌লে!—"

"ও বাবা! বাবা! বাবা গো! অমন কর্‌চো কেন, বাবা? এখনও হয়ত আসবার সময় আছে। হয়ত সরকারী কাজের জন্য আস্‌তে পার্‌চেন না। না হয়—আমিই কাল্‌কে যাব। তুমি স্থির হও।"

"বেবি!—বে-বি! সে একটা চিঠিও তো আমাদের লিখ্‌তে পার্‌তো! তবে কি, তবে কি, তোমারই সন্দেহ সত্য? সেই কি আমাদের এই দশা ঘটালে? তারপর এখন নিঃস্ব পথের ভিখারী ডাক্তার মল্লিকের মেয়েকে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ তরুণ লাহার অযোগ্য বোধে ঘৃণা করে আমাদের দিকে ফিরে চাইলে না? তবে আমি মুখ দেখাব কি করে? হালদার, নিয়োগী, বাঁড়ুয্যে ওরা যখন জান্‌তে পারবে, আমি আমার সে লজ্জা লুকবো কোথা দিয়ে? ওরে বেবি! তোকে যে এক সময় সব্বাই হিংসা কর্‌তো রে! আজ তোর এত বড় অপমানও আমায় বেঁচে থেকে দেখ্‌তে হলো?"

"বাবা! অত অস্থির হলে কি হবে! আমি তো বলেছি, আপনাকে খুশী কর্‌বার জন্য আমি তাঁকে বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত আছি, কাল সকালেই আমি নিজে যশোর যাব।"

ডাক্তার মল্লিক একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার দুর্ব্বল বক্ষের প্রায় আধখানা খালি করিয়া ফেলিয়া সকাতরে এই কথা বলিলেন;—"আর তুমি যাবে! সে হয়ত এতক্ষণ অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড হয়েছে। আর কি সে তোমায় বিয়ে কর্‌তে রাজীই হবে?—আর কি সে তোমায় চেয়ে দেখ্‌বে! আর কি সে আমার মান-ইজ্জত বাঁচাতে চাইবে! কোন আশা নেই, কোন আশা নেই, ওরে আর যে আমার কোনই আশা নেই রে—!"

সে রাত্রে আরও একখানা আর্‌জেন্ট টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া তাহার উত্তরের প্রত্যাশা করা হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মল্লিকের খানসামাটা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণার গৃহদ্বারে দ্রুত করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল।

"কিরে আবদুল?" বলিয়া কৃষ্ণা নৈশবাসের উপরেই একটা শাড়ী ও জ্যাকেট্‌ টানিয়া জড়াইয়া বাহিরে আসিতেই সে খবর দিল, "ডাক্তার-সাহেব কি রকম শব্দ কর্‌চেন, কথা কইচেন না; নড়্‌চেন না; আপনি একবার আসুন।"

উহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া ভীতা কৃষ্ণা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিতেই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"আফ্‌টার অল্‌ ইউ আর রাইট্‌ মাই চাইল্ড্‌! আই অ্যাম্‌ ডিসিভ্‌ড্‌—মোষ্ট ক্রুয়েল্‌লী ডিসিভ্‌ড্‌। ওঃ তরুণ!—তরুণ! তুমি এই কর্‌লে?"—

আর কোন সাড়াই সে পাইল না।

ডাক্তার আসিয়া মন্তব্য করিলেন, "হার্ট ফেলিওর।"—

সন্ধ্যা-তারকার যথারীতিতে তাহাদের নিত্যব্রত পালন করিতে নীল সাগরের উপকূলে আসিয়া জমা হইয়াছে। মেঘপুঞ্জের অন্তরালে ক্ষণ অস্ত ক্ষণ সমুদিত চন্দ্র তাঁহার রূপালী আলো

দিয়া সুখদুঃখের ক্রীড়ার মতই ক্ষণে ক্ষণে ধরণীবক্ষকে আলো ছায়ায় বিচিত্রকর করিতেছিল। ডাক্তার মল্লিকের প্রকাণ্ড প্রাসাদ-ভবন এই ছায়ান্ধকারের মধ্যে কি নিবিড় শোকাচ্ছন্ন ও অসহনীয় নিস্তব্ধই মনে হইতেছিল! সাহারার মরুপ্রান্তরের মত সেই সজ্জাহীন শ্রীহীন জন-বিরল বাড়ীখানি যেন উর্দ্ধস্বরে হা হা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

মল্লিক-সাহেবের বিখ্যাত গৃহ-সজ্জার শেষ অংশ গোরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া ম্যাকেঞ্জি-লায়েলের নিলাম-ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করিতেছে, তেমন সময় একখানা টুসীটার কার আসিয়া এই বাড়ীর আইভি জড়িত চায়না টবে বিলাতি তালে এবং বিচিত্র ক্রোটনে-সজ্জিত গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করিল। মিঃ লাহা তাহা হইতে ত্বরিতে নামিয়া পড়িয়াই চারিদিকে নিজের বিস্মিত দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সাম্‌নের হল অন্ধকার, সিঁড়ির প্রথমে যে ধাতুময় কাফ্রিমূর্ত্তির হাতে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর একটা ঝাড় ছিল, সেটা নাই। ছবি, আরসি, কার্‌পেট্, আয়না পোরসিলেনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টব, সবই গিয়াছে। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া স্পন্দিত-বক্ষে প্রত্যেক জনহীন নিরালোক ও হৃতসর্ব্বস্ব ঘরগুলাকে অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে ডাক্তারের শয়নকক্ষে আলো জ্বলিতে দেখিয়া অর্দ্ধ আশ্বস্তভাবে মিঃ লাহা সেই ঘরেই প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রবেশমাত্রে তাঁহার সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইয়া আসিল। ডাক্তারের শূন্য-গৃহেও তাঁহার পরিচিত সাজসজ্জা কিছুই বর্ত্তমান নাই, শুধু শয্যাহীন খাটের উপর কে' একজন আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে।

তাহাকে কৃষ্ণা বলিয়া চিনিতে তরুণচন্দ্রের বিলম্ব হইল না।

"বেবি! বেবি! আমি এসেছি। আজ আমি আমার অসহ্য বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে তোমায় পাবার যোগ্যতা এবং দাবী নিয়েই এসেছি।"—তরুণচন্দ্র কৃষ্ণার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের উপর নিজের মমতাপূর্ণ হাত দুখানি রাখিলেন। "বড় দুঃখ যে আর একটী দিন আগে আস্‌তে কিছুতেই পার্‌লুম না! গত-রাত্রে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছে এবং—"

ধীরে—অতি ধীরে মিঃ লাহার স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া কৃষ্ণা বিছানার উপর বসিল। তারপর নিজের স্থির কটাক্ষ তরুণচন্দ্রের বিজয়-গৌরবানন্দে-পরিপূর্ণ অথচ সময়োচিতভাবে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যময় দৃষ্টির উপর নিবদ্ধ করিয়া শান্ত অথচ সুদৃঢ়স্বরে কহিল;—

"কিন্তু আপনাকে দরকার আমার যে এখন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়দের পরেশনাথ পাহাড়ের কাজে আশানুরূপ ফল মিলিল না। অন্তর-বাহিরে বণিক্-বৃত্ত মাড়োয়ারিরা বিলাতি পণ্য বর্জ্জনে সহজে কেহ সম্মতই হইতে চাহে না। দু' একজন ছাড়া সবাই বলে, "বাবুসাহেব! 'যাতে দু' পয়সা লাভ তাই ক'র্‌বো, কি ব্যবসা ফেল কর্‌তে বসে যাব?"—কেহ বলিল, "আরে যান্ যান্, বাবুসাহেব!—আপনাদের তো হুজুকে মাতা! আজ এই কথা বল্‌চেন, আবার কালই চাই কি, একটা চাকরী পেয়ে গেলে কলারের নীচে টাই বেঁধে দিব্যি সাহেব বনে যাবেন। তখন ওই খদ্দরের বোঝা আমি বেচ্‌বো কাকে? আপনাদের কি বেশী দিন সহ্য কর্‌বার শক্তি আছে?"

বিনয়ের দল এই ন্যায়সঙ্গত নির্ব্বিবাদ প্রচেষ্টার স্থায়ীত্ব-সম্বন্ধে অশেষ-বিশেষে আশা দিয়া

বুঝাইতে লাগিল। তাহারা বলিল, ইতঃপূর্ব্বে দু' একটা চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ সে সব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসঙ্গতভাবে করা হয় নাই। কোথায়ও বা ঐ চেষ্টার পথ সঙ্কীর্ণ ও জটিলতাপূর্ণ এবং অধর্ম্মমূলক হইয়া পড়িয়াছিল। এবার তাহা নহে। তদ্ভিন্ন এবার নেতৃত্বশক্তিসম্পন্ন নেতার অভাব ঘটিবে না বলিয়া দেশ আশা করিতেছে। এই মহৎ কার্য্যে মহাপ্রাণ নেতা ব্যতীত কখনই কার্য্য-সাফল্যের ভরসা থাকে না।

উঁহাদের সঙ্গে দুইটী শিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁরা বলিলেন ;—মানুষ-নেতার দ্বারা হইবে না, তবে যদি ভগবান্ নিজে আবার অবতরণ করেন, তা হলে কি হয় বলা যায় না।—

ছেলেরা বলিল, তিনি মানুষের মধ্য দিয়েই তো এসে থাকেন। গীতায় বলেছেন ;—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

উঁহারা বলিলেন, "তিনি সাধুদেরই পরিত্রাণের জন্য আগমন কর্‌তে প্রস্তুত আছেন, তোমরা এবং আমরা কি সাধু ?"

ছেলেরা বলিল, "না, কিন্তু হ'তে হবে। জন্মগত সাধু বা সাধক যিনি, তিনিই তো ভগবানের অবতার। সবাই সে কপিল বশিষ্ঠ শুকদেব বা সনক-সনন্দন-সনৎকুমার হবে না। কিন্তু বিশ্বামিত্র হতে পারে। মহা মহা পাপী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেও আদর্শ-জননায়কে পরিণত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যদি সে পাপ তার কেবলমাত্র শিক্ষা সমাজ ও সঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত শারীরিক পাপ হয়! কুটিল স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারটাই মনের কলুষ। সেটা নষ্ট হওয়া দীর্ঘকাল সাধ্য, হয় ত অমর লতার মত তার জড় কখনই মরে না।"

"কিন্তু ধরুন, আপনারা এই কম-বয়সী ছেলে, আপনাদের কি নেতা হবার শক্তি আছে মনে করেন ? আপনাদের মান্‌বে কে ? আর যারা মান্‌বে, তাদের যে আপনারা ঠিক পথেই নিয়ে যেতে পার্‌বেন, তার প্রমাণ কি ?"

ছেলেরা বলিল— "এ সন্দেহ অমূলক নয়। এই জন্য 'অন্ধেনৈব নীয়মানান্ধা যথা' গোছ ভ্রান্তি একটা তো ঘটে যাবার ভয় আমাদেরও সর্ব্বদাই কর্‌তে হয়। এ সব বড় বড় কাজের 'অর্‌গানাইজ' করাই তো সব চাইতে ভাবনার জিনিষ। তবে প্রকৃত নেতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন একজন মহাত্মার যদি অভ্যুদয় ঘটে, তা' হলে তাঁরই দৃষ্টান্তে ও প্রভাবে শত শত মধ্যশ্রেণীর দেশ-সেবক তৈরি হতে বাকি থাকে না। প্রধান পরিচালনাভার সেই একমাত্র নেতৃপুরুষের হস্তেই ন্যস্ত থাক্‌বে, আর তাঁর অধীনে কেন্দ্রে কেন্দ্রে একজন করে প্রধান ও অপ্রধান যত জন হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক থাকা চাই। এককে পেলে বহুকে পাওয়া কঠিন হবে না। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই এই নীতির অনুসরণে কাজ হয়ে থাকে। স্বদেশের সাধনায়, স্বধর্ম্মের পুনরুত্থানে, নূতন ভাব-প্রচারে এবং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণাতেও সর্ব্বত্রই এই একই পন্থা। 'কমান্‌ডার-ইন্-চিফ্' একই জন, এবং তাঁরই যথার্থ উপযুক্ততার প্রয়োজন। বাকি দু-দশজন ছাড়া সবই তো অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ।"

"কিন্তু 'নেতা' হবার যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা বুঝ্‌তে পার্‌বো কি' দেখে ?"

একটী ছেলে কহিয়া উঠিল, "কেন, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্য পুরাণ-স্বরূপ অমর-গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের 'নেতৃ-প্রতীক্ষা' প্রবন্ধটী পড়ে ফেলুন না ; এবং সেই ভবিষ্যৎ-বেত্তার নেতৃ-পরিচয়ের

সঙ্গে 'নেতার' লক্ষণ মিলিয়ে দেখে নিন্। যদি সাড়ে তিনভাগও মেলে, সাড়ে তিনভাগও ত বিশ্বাস করতে পারবেন ?"

বিনয় তাহাদের এই তর্কাতর্কির সব খবরটুকু সেই দিনেই বাসায় ফিরিয়া কৃষ্ণার পত্রে উপহার পাঠাইল। তারপর লিখিল,—যদি তোমার সামাজিক প্রবন্ধ পড়া না থাকে, সেইজন্ম ওই কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করেই দিতেছি। আমি নিজে পূর্ব্বে পড়িনি, এখন পড়ে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হচ্চি। কি অসাধারণ সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টির সহিত অনন্য-সাধারণ ও অকৃত্রিম দেশপ্রেম! আজিকার এই 'নন্-ভায়োলেন্স' সম্বন্ধে বহু বহুকাল পূর্ব্বেই তো তিনি পথপ্রদর্শন করে গ্যাছেন এবং নিজের জীবনের আদর্শে স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার উপকারে ও দেশীয় শিল্পের সাধনায় দেশকে আমন্ত্রণ করেছেন। সমস্ত বইখানাই তোমায় পাঠাতে সাধ হচ্চে! কারণ এর কোন খানটাই তো বাদ দেবার দেখ্ছিনে। তবে আজ শুধু ঐ টুকুই পাঠাই। যদি ইচ্ছা হয়—বইখানাও আনিয়ে পড়ো, বা আমায় লিখ, আমি পাঠিয়ে দেবো।—

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন।

(২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন-সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন।

(৩) তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন।

(৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে।

(৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মি-জালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা-লিপি কুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণের সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্য স্মরণ করিবে।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভব॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে।—

তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

বিনয় শীল।

সেই দিনের ডাকেই আর একখানা পত্রও কৃষ্ণার হস্তগত হইল।—

আমার প্রিয়তমা কিরণ! সেদিন তোমার অদ্ভুত আচরণের জন্য আমি কিছুমাত্রও বিস্মিত হই নাই। একসঙ্গে এত বড় বড় বিপৎপাতে আমাদের মত সবলচিত্ত পুরুষেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। তুমি তো কোমলমতি বালিকামাত্র।

বেবি! এতবড় কাণ্ডটা যে ঘটিয়া গিয়াছে, সে কথা আমায় তোমরা কেহই তো স্পষ্ট করিয়া লেখ নাই? আমি মনে করিয়াছিলাম নিশ্চয়ই তোমার বাবা আমাকে কাছে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তার দিতেছেন, সুযোগ পাইলেই যাইব। তোমার পাঠান টেলিগ্রামখানি, সেই আমার চির-ঈপ্সিত, ইহ-পরকালের সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ আমারই নিতান্ত মন্দভাগ্যবশে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন আমি যশোরে উপস্থিত ছিলাম না। সরকারী কাজে বনগাঁ গিয়াছিলাম। কাজেই উহা পাইতে একদিন বিলম্ব ঘটিল। তখন কাজ ফেলিয়া আসিবার উপায়মাত্র ছিল না, সেখানে তখন দাঙ্গার সম্ভাবনা চলিতেছে, আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যাই হোক্, আমার অযথা বিলম্বে তোমার বাবা হয়ত' আমার উপর বিশ্বাস হারা হইয়াই চলিয়া গেলেন, এ পরিতাপ আমার যে মরিলেও যাইবে না। তবে তুমি।—চির-আদরের বেবি আমার! আমার মন প্রাণ যে চির-তোমাময়, তাকি তুমি কোন কিছুতেই ভুল্‌তে পেরেচ? তা যে পারোনি—সে ত তোমার এই দুদিন বিচ্ছেদের পরেই চির-মিলনের আগ্রহ প্রকাশেই প্রমাণ দিচ্ছে।

তোমার বাড়ী আমি জঙ্গীলালদের কাছ থেকে তোমারই নামে কিনে নিয়েছি। (তাদের দুর্ব্ব্যবহারে আমি নিজের জন্যই নিরতিশয় লজ্জিত ও সন্তপ্ত!) তোমার ফার্নিচার সমস্তই 'সেল থেকে কিনে ফেলেছি, ভগবানপ্রসাদের কাছে তোমার গহনা সমস্তই জমা দেওয়া আছে। এ ভিন্ন তোমায় আরও দুইটা সুসংবাদ দিই। এই মাস থেকে আমি কন্‌ফারমড্ হলেম। আর আমার এক অপুত্রক জ্যেঠামশাইএর মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির (প্রায় আট দশ লক্ষ টাকার কম নয়) অধিকার আমিই পেয়েছি। আর একটা কথা;—আমার ৺ভূতপূর্ব্বা পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার, (তার মধ্যে শ্রীপুরের মল্লিক-বংশের পারিবারিক বিখ্যাত মুক্তামালাটাও আছে—সেটার দাম জহুরীদের মতে লাখ টাকার কম হবে না! আমাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ এটা পাঠান-রাজাদের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলেন শুনেছি।) সে সকলই, আজ তোমার। আর তার সঙ্গে আমার মন-প্রাণ সে ত তোমারই ছিল, এখন আমাকেও তুমি নিজের করে নাও, আর কি প্রতীক্ষা করা যায় বেবি? না, আর না, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, ইতিমধ্যেই।—

এখন একটীমাত্র কর্ত্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসৎ লোক তোমার ও আমার নামে অযথা ও অকথ্য গ্লানি সহস্র লোকের মাঝখানে প্রচার করিয়া তোমায় ও আমায় অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার জন্য আমার পবিত্র-স্বভাবা চিরসুখ-লালিতা, আনন্দময়ী কিষেণ আজ জনসাধারণের হাস্য-কৌতুকের পাত্রী—সেই অহেতুক বৈর-সাধনকারীর সমুচিত শাস্তি-বিধান-টুকুই বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি! তুমি সেদিনে নিতান্তই মর্ম্মাহত-চিত্তে ঐ পাষণ্ডকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই। তারপর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে, তার কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ জন্য তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব আমার এখনও ভাল করিয়া শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে, একটা দিন তোমার কাছে কাটাইয়া আসি।—তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিনয় শীলের সঙ্কট-কাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে।—এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে—যদি কেহ তাহাকে ইহার জন্য প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাকে চির-নির্ব্বাসন-দণ্ড হ'তে কেহই রক্ষা

কর্‌তে পার্‌বে না।—তারপর বিনয় শীলের নির্ব্বাসনের দিনেই যদি আমাদের শুভ-বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যায়, তা' হ'লে কেমন হয়? তোমার প্রতিশোধ-স্পৃহাটা সম্পূর্ণরূপেই মেটে না কি? কি বল? আমার প্রচুরতর ভালবাসা ও আদর আমার চির-আদরিণী বেবিকে দিলাম!—

তোমার চিরানুগত—তরুণ।

নবম পরিচ্ছেদ

বিনয় এতদিন বালকের মত সদানন্দচিত্ত ও আপনা-ভোলাভাবে কাটাইয়া হঠাৎ এই কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণযৌবনের প্রখর জ্বালাদীপ্তি নিজের অন্তরের মধ্যে বেশ স্পষ্ট করিয়াই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্যসখী উর্ম্মিলার উপর তাহার যে ভাব তাহাকে স্নেহ সৌহার্দ্দ সব কিছুই বলা চলে, শুধু তাহা প্রেম নয়। কারণ, সে জিনিসটা স্থির স্নিগ্ধ এবং ব্যাপকভাবেই তাহার সর্ব্ব দেহের শোণিত-স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার সমুদয় মনকে অলক্ষ্য হইতে ছাইয়াছিল। শরীরমধ্য গত একান্ত প্রয়োজনীয় শ্বাসবায়ুর মতই তাহা যেন স্বতঃই বর্ত্তমান। যে বস্তুটাকে চিরদিন ধরিয়াই পাইয়া আসিতেছি, সেটা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অভাবটাকে কোনমতেই অনুভব করিতে পারা যায় না, এতই তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠে। উর্ম্মিলাকেও তাহার বাল্য-কৈশোরাবধি এতই সহিয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার যৌবন জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। উর্ম্মিলার চিরপরিচিত হাসি-কান্না, তাহার চিরাভ্যস্ত আদর অভিমানের নিত্যকৃত্য তাহার যৌবনোদ্গমে চপল-চিত্তকে সুখে-দুঃখে আশার পুলকে নিরাশার অন্ধকারে ডোবা-ওঠা করায় না, তাহার চঞ্চল পদক্ষেপধ্বনি তাহার সর্ব্বশরীরের উন্মত্ত বেগে প্রবাহিত রক্তের তালে তাল দেয় না, তাহার হাসির ও গলার সুর তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-তাড়িতের ঝঞ্ঝনা বাজায় না। তাহার অভিমান-স্ফুরিত ক্ষুদ্র ও রক্তিম অধর তাহার অধীর ও উদ্বেল হৃদয়কে তৃষিত করিয়া তুলে না। কারণ সে উর্ম্মিলা,—তাহার সব দিনের পাওয়া, নিজের অঙ্গশোণিতেরই একটি বিন্দুর মতই নিজস্ব উর্ম্মিলা। ইহাকে নূতন করিয়া যে আবার নিজের অন্তরের কোনও খানে, কোন অপ্রাপ্ত-প্রদেশে এখনও পাইতে বাকী থাকাও সম্ভব, সে কথাটা বড় সহজ বলিয়াই সহজে মনে পড়ে নাই।

একদিন নব-বসন্ত-সমাগমে চিরদিনের অনাদৃত উপবনের মতই তরুণী কৃষ্ণা এই বিস্মৃত-যৌবন চঞ্চলমতি তরুণ-চিত্তকে আকস্মিক প্রাপ্ত যৌবনোচ্ছ্বাসে ভরাইয়া তুলিল। তাহার পদস্পর্শে অশোক মঞ্জরিত হইল, তাহার হাসি গানে এত দিনের মূকীভূত-কোকিল পাপিয়া পঞ্চমে সপ্তমে গাহিয়া উঠিল। কৃষ্ণার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রীতি যে ক্রমশঃই প্রবল আবেগ ও তীব্র আকর্ষণজনক প্রেমে পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথাটা তাহার নিজের কাছে সেই দিনই একান্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে অবসরপ্রাপ্ত হইল, যে দিন মিঃ লাহাকে কৃষ্ণার প্রত্যাখ্যান-করার সংবাদটা সে তাহারই মুখ হইতে জানিতে পারিল।—প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝখানেই তাহার আনন্দোৎসের মুক্তধারা সহসাই ঘোর নিরানন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া থামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা তরুণ লাহার হইল না, এ অতি সুসংবাদ বটে; কিন্তু বিনয়েরও তো তাহাকে নিজের মনে করিতে পারিবার কোনরূপ সাধ্য নাই! বিনয়ের মন ক্ষণিক আস্বাদিত ক্ষণপ্রভাবৎ চঞ্চল ও তেমনি তীব্র গভীর সুখের

অনুভূতিটুকু প্রাণপণ-বলে বুকের মধ্যে কাঙ্গালের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে ছাড়া একান্ত দুঃসাধ্য—এবং হয়ত বা অসাধ্য বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছে, তাহাকে, এমন কি তাহার স্মৃতিটুকুকে পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়াই তাহার মন হইতে মুছিতে হইবে। এর চেয়ে যদি সে লাহার স্ত্রী হইতে স্বীকৃত থাকিত, তবে হয়ত পরনারী-হিসাবে তাহার প্রতি নিজের মনোভাবকে সে কোন মতেই এতটুকু প্রশ্রয় দিতে সাহসী হইত না, এবং তাহার নিজের মনের কাছেও এই তীব্র অনুভূতিটা অস্পষ্টই থাকিয়া যাইত।—কৃষ্ণাকে ভুলিবার সঙ্কল্প লইয়াই সে কলিকাতার বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নিজের ভ্রান্তি তাহার নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার স্মৃতি আজ শত শত ক্রোশ দূরেও যে তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবিয়া দেখিল, তাহার ধ্যানে সে দিবারাত্রের মধ্যে অল্প সময়ই শুধু ডুবিয়া থাকে না। দেশ-সেবার মধ্যেও সেই তারই প্রতি কার্য্য প্রতি উদ্যম, নির্ভীক ও শান্ত ধৈর্য্যপূর্ণ ও উৎসাহিত আচরণ তাহাকে যেন সমধিক উজ্জ্বল ভাস্বর-মূর্ত্তিতে তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বিনয়ের মনে হইল, তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারিলে তাহার কর্ম্মোদ্যম শত গুণেই যেন বর্দ্ধিত হইতে পারে। তাহাকে ছাড়িলে আজ এ পথেও সে নিঃস্ব ফকির।

সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিল।—সে ভাবিল, মনে মনে আমি যদি তাহাকেই চিরদিন ভালবাসি গোপনে পূজা করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কথা সে না জানিলেই হইল। সে ত আমি জানিতে দিব না। অথবা যদি কোন মতে জানিতেও পারে, পারিলই। আমি কায়মনোবাক্যে কখনই আমার এই অন্তরের গোপন সাধনাকে, পূজার উপচারকে, বাহিরের ভোগের উপাদান করিয়া ফেলিব না, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কাছে দাঁড়াইয়া নিজের এই দুর্ব্বল অন্তরকে যদি এতটুকু একটুখানি উৎসাহের স্পর্শ বুলাইয়া সামর্থশীল করিয়া লইতে পারি, ছাড়িব কেন? আমার পক্ষ হইতে কোনরূপ শান্তির সুখের ব্যাঘাত আমি মরিলেও ঘটিতে দিব না, ইহা স্থির।

বিনয় কলিকাতা যাত্রা করিল। বাঁকিপুর, আরা, বক্সার ও বেনারসে পাঁচ সাত দিন মাত্র তাহার থাকা ঘটিয়াছিল; বেশী বিলম্ব তাহার আবেগ-চঞ্চল চিত্ত সহিতে পারিতেছিল না।—দু-এক রকম চরকার নমুনা সে সঙ্গে করিয়া লইল।

ট্রেনে সে থার্ডক্লাসের টিকিট্ লইয়াছিল। গাড়ীতে বেজায় ভিড়। তিল ধারণের স্থান আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বৈদ্যনাথ পার হইলে দেখা গেল, সেই জনারণ্য—রাত্রে যাহাদের লইয়া অন্ধকূপ-হত্যার উপক্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে বিনয় এবং কেবল আর একটিমাত্র বাঙ্গালী ঐ কামরাটিতে বাকি পড়িয়া গিয়াছে। বেহারীর ভিড় বেহারের সীমানাতেই নিঃশেষ হইয়াছিল।

এই লোকটীর সঙ্গে বিনয়ের একটুখানি আলাপ জমিয়াছিল। বিনয়ের চেয়ে বয়সে বৎসর দশেকের বড়, বড় বড় করিয়া রক্ষিত মাথার চুল, ছাঁটা দাড়ি, একটি ছোট্ট টিনের পেঁটরা, একটা ক্যাম্বিসের আধ-ময়লা ব্যাগ ও ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলীর সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধা একখানা পুরাতন তালি-সেলাই ও তৎসত্ত্বেও স্থানে স্থানে ছিদ্রওয়ালা ছাতা। থেলো হুঁকায় সে মধ্যে মধ্যে টিনের কৌটা হইতে বাহির করিয়া তামাক সাজিয়া খাইতেছিল। বিনয়কে তামাক খাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া

সে তাহার পকেট্ হইতে কলাপাতা-জড়ান সাজা পান বাহির করিয়া দিতে গেল। পুনশ্চ হাসিয়া ও বিনীতভাবে বিনয় তাহার সাগ্রহ উপহারকে প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু একটি জিনিসকে শুধু পারিল না। ঐ দরিদ্র ব্যক্তির পরণে হাতেকাটা মোটা সূতার খাটো ধুতি। বিনয় তাহার কিম্ভূত আকার ও আচার সত্ত্বেও মনে মনে সশ্রদ্ধভাবে প্রণাম করিল, বাহিরে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মেমারি-নিবাসী অশিক্ষিত দরিদ্র হরিপদ বাগ; শিক্ষিত সুসভ্য ও ধনী-সন্তান বিনয়কুমারের অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিল।

কথায় কথায় হরিপদ দুঃখ করিয়া বলিল, "দেখুন না মশাই, মেয়েটা শ্বশুর-বাড়ী চলে গেল, এম্নি ভুলো মন সব, পেঁটরাটি তার ফেলে গ্যাছে, কেমন করেই বা পৌছে দিই! আবার কতকগুলো টাকা খরচ হবে, গরীব ছাঁপোষা মানুষ মশাই, কোথা থেকে কি পাই বলুন না? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দু'বেলায় দুটো মুটো খেতেই আঁটে না। গরীব তারাও মশাই! আমারই মতন গরীব তারা, আবার যে দু'খানা হঠাৎ কিনে দেবে, তারও ত যুগ্যতা নেই। চাবিটী নে' গেল, বাক্সটা কি না রইলো পড়ে!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

দয়ার্দ্র হইয়া বিনয় সন্তপ্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী কোথায়? আমি না হয় পৌছে দোব। আমি তো ক'ল্কাতাতেই যাচ্চি।"

"বলেন কি বাবু! আপনি পৌছে দেবেন! আমাদের জন্যে এতকষ্ট আপনি কেন স্বীকার কর্‌তে যাবেন!"

বিনয় কহিল,—"আমার কোন কাজ মেমারিতে পড়্‌লে আমি যদি তোমায় লিখে পাঠাই, তুমি কি করে দেবে না? পরস্পরের সাহায্য পরস্পরকে তো কর্‌তেই হয়। তাদের ঠিকানাটা কি বলো তো, আমি লিখে নিই।"

"সাত নম্বর......লেন। শ্বশুরের নাম রত্নেশ্বর হাতি, আমার মেয়ের নাম কুসুম। জামাই সর্ব্বেশ্বর হাতি।"

বিনয় কাগজ পেন্‌সিল বাহির করিয়া উক্ত নাম ধাম সমূহ লিখিয়া লইল, উপরন্তু হরিপদর ঠিকানাটা শুদ্ধ টুকিয়া লইতে ভুলিল না।—

টিনের সেই ছোট্ট পেঁটারাটা রাখিয়া মেমারী ষ্টেশনে হরিপদ বাগ ট্রেন হইতে নামিয়া গেল। আর একজন ভদ্রলোক আসিয়া সেই কামরায় উঠিয়া বসিলেন। ইহাঁরও গম্যস্থল কলিকাতা।

ট্রেনখানা কলিকাতার যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই কি একটা গোপন সুখে বিনয়কুমারের মনের মধ্যটা যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালার সুজলা সুফলা শ্যামলা ছবি কয় দিনের অদর্শনেই তাহার বিরহ-বিধুর চিত্তে যেন নব-সম্মিলিতা প্রিয়ার মুখপদ্মের মতই অপরূপ ও নবীন সৌন্দর্য্যালোকের সমাবেশ করিয়া তুলিল। চারি পাশে নবকিশলয়বিমণ্ডিত হরিৎ ক্ষেত্র সমূহ, তাহার কিনারায় কিনারায় সুপ্রচুর বর্ষা-বারি-সঞ্চিত জলাশয়, কুমুদ-কহ্লার ও শ্বেত ও রক্ত পদ্মখচিত শোভায় সেই পবন-চঞ্চল নির্ম্মল সলিলাসনগুলি বঙ্গ-লক্ষ্মীর নিজস্ব কমলাসনবৎ পরম-রমণীয় শ্রীধারণ করিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া থাকিলে চোখ যেন ফিরিতে চাহে না। স্থানে স্থানে মজিয়া আসা নদীর উপর সেতু দিয়া গাড়ি ছুটিতে লাগিল। অপ্রশস্ত জলের ধারা বর্ষায় কিছু কিছু প্রশস্ততা লাভ করিতে পারিয়াছে মাত্র। দু'ধারে পরিত্যক্ত গ্রামের উপর অযত্নসম্ভূত

নিবিড় অরণ্যানী বাঙ্গালীর অক্ষমতার জলন্ত সাক্ষ্যরূপে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসকারী বীজ সৃজন করিতেছে। বিনয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসিল। এই সুবর্ণ-প্রসূ বাঙ্গালার মাটি অনর্থক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে; আর বাঙ্গালীর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ধূমাচ্ছাদিত জন-অধ্যুষিত সহরের বুকের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিতে করিতে শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় প্রাণ হারাই-তেছে। এই সব নদীতীর, ক্ষেত্র-খামার, বাগান-বাগিচা অনাবাদী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালীর ছেলে সাহেবের জুতা ও গালি খাইয়া অর্দ্ধাশনে কলম পিষিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে।—কিন্তু করিতে পারিতেছে কি?—

ক্রমে ছোট বড় সহর ও পল্লী আসিয়া আসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এক একটায় জন-মানবের সাড়া প্রচুরভাবেই পাওয়া যায়, এক একটা যেন রাক্ষসের কবলে পতিত জনহীনা পুরীর ন্যায় নিস্তব্ধ। বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা রুদ্ধদ্বার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিল, পুষ্করিণী কলমী-দামে হরিদ্বর্ণ, কুটীরনিবাসী দরিদ্র ভাগ্যবানের ভাগ্যছায়া বঞ্চিত দুর্ভাগ্য-সঙ্কিতস্থলে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছে। বিনয়ের চিত্তে তাহার নিজের পরিত্যক্ত স্বগ্রামের ছবিখানি জাগিয়া উঠিয়া তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে মমতা ও সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিম্‌নি ঊর্দ্ধাকাশকেও যতখানি সম্ভব বর্ত্তমান সভ্যতার তপ্তশ্বাসে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া নিজেদের গৌরবগাথা ধূম্র-রেখায় তাহারই গায়ে অঙ্কিত করিতেছিল। এখানে এঞ্জিনের বিকট গর্জ্জন, ওখানে অসংখ্য মোটরকারের উদ্ধত তর্জ্জন, নানা দিগ্দেশস্থ যাত্রীদলের কলকল কলকল শব্দে শব্দ-মুখরিত কলিকাতার মুখপত্র হাবড়া-ষ্টেশন দেখা দিল। বিনয়ের মনে হইল, গাড়ীতে উঠিয়া একখানা তার করিয়া দিলে হয়ত এখনই তাহার বুভুক্ষিত দৃষ্টির সমুদয় ক্ষুধা মিঠাইয়া দিয়া কৃষ্ণার মুখ-পদ্ম ফুটিয়া থাকিতে পারিত।

প্ল্যাট্‌ফরমে পা দিতেই একদল পুলিস কনষ্টেবল সঙ্গে যে ইউনিফরম পরা সাহেবটী দাঁড়াইয়া-ছিলেন, বিনয়ের সঙ্গী অপর ভদ্রলোকটি একটুখানি ইঙ্গিত করিতেই তাহারা বিনয়ের পথ রোধ করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।—বিস্মিত হইয়া বিনয় কহিয়া উঠিল' "একি!"

পুলিস-সার্জ্জেণ্ট কহিলেন, "আপনাকে আমরা অ্যারেষ্ট করলুম। এই দেখুন বিনয়কুমার শীলের নামে ওয়ারেণ্ট্ রয়েছে।"

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা-খানা পাঠ করিয়া বিনয় দেখিল, তাহাকে ষড়যন্ত্রের চার্জ্জে' ধরা হইয়াছে!

গাড়ীতে উঠিয়া সে কহিল, "এই টিনের বক্সটা সাত নম্বর......লেনে রত্নেশ্বর হাতির বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার—আমি অপরের কাছ থেকে নিয়েছি, এইটুকু শেষ করতে দিলেই আর আমার কোথাও যেতে আপত্তি নেই। আপনারা সঙ্গে থেকে এই দায়টা চুকিয়ে দিতে দিন্।"

ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ্ মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "বেশ; কিন্তু তার আগে ওটা আমাদের খুলে দেখতে হবে।"

বিনয় কহিল, "ওর চাবি আমি পাইনি, শুধু বাক্সটা পৌঁছে দেবার ভার পেয়েছি, ইচ্ছা হয় তাদের বাড়ী গিয়েই খুলিয়ে দেখ্‌তে পারেন।"

পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর আবার সেই রকম একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল। বলিল, "তা আমাদের

নিয়ম নয়। লালবাজারে গিয়ে 'সার্চ্চ' কর্‌বার পর এটা আমরাই যথাস্থানে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত ক'র্‌বো।"

বিনয় আর কিছুই বলিল না।

বাক্সটা খোলা হইবামাত্রে একটা বিষধর সর্পকে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া আৎকাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, বিনয়ের মুখ দিয়া আচম্‌কা তেমনতর ভয় ও বিস্ময়ের যুগপৎ মিশ্রণে সৃজিত একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হইয়া গেল।—

সে বাক্সটায় ছিল, একজোড়া রিভলবার এবং কয়েকটা কার্টিজ।

দশম পরিচ্ছেদ

বিনয়ের ধরাপড়া ব্যাপারটা লইয়া সমস্ত দেশময় খুব বড় রকমই একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল। এই উপলক্ষে ইংরাজ-সম্পাদিত খবরের কাগজওয়ালারা খুব করিয়া একবার দেশ-সেবকদিগকে আক্রমণ করিয়া লইল। তাঁহাদের বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত 'নন্‌-কো-অপারেসন' যে 'নন্‌-ভায়োলেন্স' নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই একমাত্র উদাহরণকে তাঁহারা একসহস্রবারও অন্ততঃ উল্লিখিত ও উদাহৃত করিয়া তুলিয়া 'কলমে'র পর কলম ওই একই কথা পল্লবিত পুষ্পিত ও ফলসংযুক্ত করিতে ছাড়িলেন না। দেশীয় খবরের কাগজগুলি এই আকস্মিক পুলিস-আবিষ্কারে লজ্জায় প্রায় অধোবদন হইয়া রহিল। এই ঘটনায় কেহ কেহ স্পষ্টই রাগতঃ হইয়া যে চপলমতি অদূরদর্শী বালক নিজের অনাবশ্যক খেয়ালে পড়িয়া দেশের এই নূতন প্রচেষ্টাকে সন্দিগ্ধ ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে গিয়াছে, তাহারই উপর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার কষাঘাত করিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পুলিসের কার্য্যাভাব ও তাহাদের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতাকেও লক্ষ্য করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিল, যদি যথার্থই কোন একজন বা এক দল লোক এই পবিত্র ব্রত ধারণের ছদ্মবেশের অন্তরালে এই প্রকার গুপ্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তবে সে বা তাহারা নিশ্চিতই দণ্ডনীয়। আবার কেহ ইহার ঈষৎ মাত্রায় সংশোধন করিয়া দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, হাঁ—সে কথা সত্য বটে, তবে কিনা ঐ ষড়যন্ত্রটি বাস্তবিকই নন্‌-কো-অপারেটরের, অথবা পুলিসের কৃত সেটি বিশেষভাবে অনুসন্ধান পূর্ব্বক, নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার অনুমোদিতভাবে দোষীর দণ্ড বিধান করা হউক। তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি থাকা সম্ভব বটে। অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের নবরোপিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করা, কি নরম পন্থী—কি চরম পন্থী অথবা নিরপেক্ষ পন্থার লোক কাহারই অভিপ্রেত নহে।

খবরের কাগজের কল্যাণে এ সংবাদ বিনয়ের বাড়ীতেও রাষ্ট্র হইতে বাকি ছিল না। শুনিয়াই জগদ্ধাত্রী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন এবং উর্ম্মিলা যে বিছানা লইয়া শুইল, সেখান হইতে তাহাকে নড়াইতে কাহারও সাধ্য হইল না। তারপর প্রথম ধাক্কাটা কাটাইয়া সে জগদ্ধাত্রীর জবানীতে তাঁহারই শিক্ষা-মত একখানা পত্র নিজের ভগ্নিপতি তরুণচন্দ্রকে লিখিল। এত বড় বিপদে তাঁহার কথাই দু'জনকার একসঙ্গে মনে জাগিয়াছিল। এ জগতে তিনিই যে এখন উঁহাদের একমাত্র ভরসাস্থল। এখন দু'জনকারই মনে হইতেছিল, তিনি তো পূর্ব্বেই এ বিপদের

আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। এখন বিশ্বাস করিয়াও যেন বিশ্বাস হয় নাই। সেই তো এখন ফলিল !

মিঃ লাহা পত্রের উত্তর দিলেন; "আমিও সংবাদ পাইয়াছি, মোকদ্দমা ভালরূপ তদ্বির যাহাতে হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভয় কি ?"

একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিতেছে ভয় নাই—এ অবস্থায় যতটুকু সান্ত্বনালাভ সম্ভব, দু'টি স্ত্রীলোকেই তাহা করিলেন।

কৃষ্ণা অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর হরিণবাড়ীর জেলে বিনয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিল, সে দিব্য প্রশান্ত-মুখে তখন নিজের কুঠ্‌রীটিতে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। সে তাহাকে নমস্কার করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইতেই বিনয় প্রতি-নমস্কার পূর্ব্বক উঠিয়া সানন্দ অভ্যর্থনার সহিত তাহাকে স্বাগত জানাইল। তাহার বিমর্ষ ও ছল্‌ছলে মুখের ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হাস্যের সহিত তাহাকে উৎফুল্ল করিতে চাহিয়া সাগ্রহে কহিল; "আহা, এখানে বসে বেশ স্বর-সাধনার সুবিধে। যদি একটা এস্রাজ বা সেতার দিত, দিব্যি আরামে থাকা যেত।

কৃষ্ণা একটা নিশ্বাস ফেলিল, একথায় হাসিতে পারিল না।

"আচ্ছা, আমি এই গানটা গাই, তুমি তো এ বিদ্যের একজন ওস্তাদ, শোন দেখি, সুরটা ঠিক হয় কি না ?"—এই বলিয়াই নিজের সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টি কৃষ্ণার যথাপূর্ব্ব রাহুগ্রস্ত মুখে তুলিয়া ধরিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, এবং তারপর গান ধরিল ;—

"নিঠুর হে ! এই ক'রেছ ভাল।
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বাল ॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ সে ত নাহি ঢালে ;
আমার এ দীপ না জ্বলিলে দেয় না সে ত আলো ;—
এই ক'রেছ ভাল !"—

শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণার চোক্ দিয়া দু'টি বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্, টপ্, করিয়া পড়িয়া গেল এবং সে সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া নিজের সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই হাসি-মুখের কান্নাভরা কঠিন অনুযোগ নিস্পন্দ হইয়াই শুনিতে লাগিল। গানের ভাষায় দু'জনকারই প্রাণের ভাষা একত্রিত হইয়া গিয়া তাহাদের উভয়েরই অন্তরে অন্তরে কাতর মূর্চ্ছনায় তাহা কাঁদিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। লুকান আবেগ বিপুল ও অসীম হইয়া উঠিয়া অশ্রু-নদীর কূল ছাপাইয়া পড়ে পড়ে হইল।

হঠাৎ গান থামাইয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর হাসি থামিলে সে বলিল, "হাসলুম কেন জানো ?"

কৃষ্ণা চোক মুছিয়া ঘাড় নাড়িল।—

"মনে হলো, তোমাকে আমার গান শোনালুম, এবার তোমায় একটা শুনিয়ে দিতে অনুরোধ ক'র্‌বো। তোমার গানের অতটাই খ্যাতি শুনেছি বটে, তবে কখনই কানে শুনিনি। তারপরই মনে হলো, এ জায়গাটা ঠিক সঙ্গীত-সমাজ বসাবার উপযোগী নাও হ'তে পারে। তুমি গাইবে একটা ? না, থাক্ কাজ নেই।"

কৃষ্ণার পা কাঁপিতেছিল, সে সেই অপরিষ্কৃত মাটির উপর অপরিসর গৃহে বিনয়েরই পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। বিনয় তাহাকে বিশেষ কাতর বুঝিয়া এবার আর হাসিল না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর একটা নূতন সন্দেহ অতি সহসাই তাহার মনের মধ্যে আসিয়া উদিত হইল। অল্প কালের ভিতর বিনয়ের মনের মধ্যে অনেকখানিই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন উচ্চ-শিক্ষিত অন্তর, বয়সের অভিজ্ঞতা অল্প দিনেই লাভ করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষণকাল কৃষ্ণার জলভারাতুর মেঘের মতই অশ্রু-সজল রক্তিম মুখচ্ছবি সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিয়াই সে ত্বরিতে তাহার একখানা হাত টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল।

"আমার জন্য দুঃখিত হ'য়েছ?—কেন? জান্‌তে না কি যে আমাদের সকল প্রকার বিপদই অনিবার্য্য? তোমার নিজের অবস্থাটাও যে আমার চাইতে বেশী নিরাপদ নয়, সেও কি তুমি জান না?"

কৃষ্ণা নিজের হাত সেই ভাবেই থাকিতে দিয়া বৃষ্টি-শেষের রামধনুর মত একটুখানি রঙ্গীন হাসি হাসিল,—"সে ত আমি জানিই। এ কিন্তু তুমি শুধু শুধু মিথ্যা অভিযোগে দুঃখ পাচ্চো যে। আমি তো তা পাবো না। তা হ'লে আমার কোন দুঃখই যে হতো না। তুমি কি তোমার প্রতি হঠাৎ এই ব্যবহারের জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ করো না?

বিনয় পরম পরিতোষের সহিত কৃষ্ণার সেই হাতখানি আস্তে আস্তে তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিজের মস্তক বারেকমাত্র সশ্রদ্ধভাবে স্পর্শ করিল। তারপর সেখানি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে শিশুর মতই হাসিমুখে কহিল, "তাতেও আমার আর কোন দুঃখ নেই। শুধু—যদি ফাঁসি যাই বা আন্দামান যেতে হয়, তখন তোমায় আমার মা'র আর উর্ম্মিলার ভার দিয়ে যাব। উর্ম্মিলা আমার স্ত্রী। বড্ড ছোটবেলায় আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কখন স্ত্রী বলে মনে ক'রতে পারিনি, বন্ধুর মত, ছায়ার মতই সে আমার বাল্য-জীবনের সঙ্গিনী ছিল, আজও আছে।"

প্রহরী ডাকিয়া বলিল—"আর দেরী করা যেতে পারে না।"

কৃষ্ণা উঠিয়া ত্বরিৎ-পদে বাহির হইয়া আসিল।

কৃষ্ণা চলিয়া গেলেও বিনয় সেদিন নিজের মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় ও অনাবিল আনন্দের তীব্র মধুর স্বাদ যেন অসীম-ভাবেই অনুভব করিতে লাগিল। সমস্ত অন্তর যেন তাহার সুবিমল ও অপরিসীম আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে—এম্‌নি অনুভূতির মধ্যে সে আপন-হারা হইয়া নিজের অন্তরে ভরা সুখের জ্যোৎস্নার একটুখানি ধারা সেই নির্জ্জন ক্ষুদ্র গহ্বরের অন্ধকার বক্ষে ঢালিয়া দিয়া গাহিতে লাগিল।—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'লো অঙ্গ মম, ধন্য হ'লো অন্তর।
সুন্দর, হে সুন্দর!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার একজন বড় ব্যারিষ্টার একদিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। বলিলেন, 'আপনি নন্‌-কো-অপারেটার' হিসাবে 'অ্যারেষ্ট' হন নাই, অন্য অপরাধে

আপনাকে ধরা হইয়াছে। এই 'কন্‌স্‌পিরেসির' চার্জ্জের বিরুদ্ধে 'ডিফেন্স' করতে না দিয়ে আপনি যদি দণ্ড নেন্, না হয় নিলেন ;—কিন্তু বরাবরের জন্য 'নন্-কো-অপারেটারদের' সম্বন্ধে গাল দেবার একটা যে মস্ত বড় সুযোগ দেওয়া হবে, সেইটের আমরা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনে। অতএব আপনার ইচ্ছা থাক্ না থাক্, আমরা আপনাকে ডিফেন্স করতে 'পাব্‌লিকের' পক্ষ থেকে কতকটা বাধ্যই, এবং তা করবো।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "এ এক রকম মন্দ জুলুম নয়। উভয়পক্ষই আমার উপর অত্যাচার চালালে, এই হরিণবাড়ীর জেলেও দেখ্‌ছি আমার টেঁকা দায় হবে।"

ব্যারিষ্টার তাহার হাসি দেখিয়া একটুখানি হাসিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, ওই টিনের পেঁটরাটার খবর বলুন দেখি ?"—তারপর আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"আপনার কি রাজনৈতিক ব্যাপার ভিন্নও অন্য কোন শত্রু থাকা আপনি সন্দেহ করেন ?"

বিনয়ের তখন চট্ করিয়া কৃষ্ণার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। 'তুমি কি তোমার হঠাৎ এ অবস্থার জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ করো না ?' সে একটুখানি ভাবিয়া দেখিল। তারপর অসংশয়ে চোক তুলিয়া জবাব দিল, "না।"

"ক্ষমা করবেন, কোন রকম ক'রে আমি জান্‌তে পেরেছি ; আপনার স্ত্রীই নাকি আপনাকে ধরিয়ে দেবার প্রধান উদ্যোগী। তাঁর কাছ থেকে আপনার কি চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, তাতেই নাকি এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানা যায়।"

বিনয় দণ্ডাহতের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল—"আমার স্ত্রী! ঊর্ম্মিলা ?—ঊর্ম্মিলা আমায় ধরিয়ে দিয়েছে! ঊর্ম্মিলা ?"—

ব্যারিষ্টার মাথা নত করিলেন, "ওই রকমই একটা খবর পেয়েছি, তবে ঠিক না হ'তেও পারে। তাঁর কোন একজন আত্মীয় সিবিল-সর্ব্বিসে আছেন, তাঁকেই নাকি তিনি ডেকে পাঠিয়ে আপনার চিঠি দেন। তারপর আপনার ট্রাঙ্ক থেকেও এই চিঠিরই উত্তর তাঁর লেখা ঐ সম্বন্ধীয় একটা চিঠিও পাওয়া গেছে, আজ খবরের কাগজেও গুজব ব'লে এ সংবাদটা বেরিয়েছে দেখ্‌লুম। এটা কি রকম, কিছু বুঝ্‌তে পারলেন ? সত্যি কি ওই রকম কথা আপনি তাঁর কোন চিঠিপত্রের কোথাও উল্লেখ করে—"

বিনয় শুধু মাথা নাড়িল "না।"

"আমারও এ ব্যাপারটা কিছু সন্দিগ্ধ মনে হচ্চে। আচ্ছা, সেই আত্মীয়টী কে বল্‌তে পারেন ? তাঁর নাম-টাম কিছু প্রকাশ পায়নি।"

বিনয়ের চিন্তা মেঘ সমাচ্ছন্ন-চিত্তে সহসা ঈষৎ চপলা চমকের মতই একটা পুরাণো কথার স্মরণ হইল। ঊর্ম্মিলার সবার চাইতে বড় বোন্ প্রমীলার স্বামী তাহার বিবাহের পরই বিলাত যায়। তারপর আর কখন তাহার খবর সে পায় নাই। মধ্যে একবার যেন শুনিয়াছিল, তিনি বিলাতেই কি বড় চাকরী পাইয়াছেন। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, অত খবরও রাখিত না। হইতে পারে, এই ব্যক্তিই সেই সিবিল-সার্ব্বিসের আত্মীয়!—কিন্তু কে সে ? ওঃ আচ্ছা মিষ্টার লাহা!—মিষ্টার লাহাই কি সেই আত্মীয় হওয়া সম্ভব ? ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মিষ্টার লাহা—যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট্,—তাঁর পুরা নামটা আপনি কি জানেন ?"

"জানি বৈকি! টি, সি, লাহা—তরুণচন্দ্র লাহা।"

"তাঁর কি পূর্ব্বে একবার বিয়ে হ'য়েছিল?"

"হ'য়েছিল কেন, তাঁর স্ত্রী তো এখনও জীবিতা রয়েছেন। তিনি পাগল ও যক্ষ্মারোগী। সে বেঁচে না থাক্‌লে তো এতদিন কোন্‌কালে ক'ল্‌কাতার বিখ্যাতা সুন্দরী মিস্ মল্লিক তাঁর স্ত্রী হতেন।"

"এক স্ত্রী বর্ত্তমানেই তা' হলে এঁর সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট হয়েছিল?"

ব্যারিষ্টার সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "তাতে কি! বিয়ে তো আর হয় নি। সে স্ত্রীটা তো জীবন্মৃতা। যাই হোক্, বুঝ্‌তে পার্‌লেন কিছু?"

বিনয়ের দুই চোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শুধু সংক্ষেপে উত্তর করিল, "বোধ হয়।"

বিনয়ের মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল। এক তো তাহার এই সম্পূর্ণরূপে অন্যায় বন্দীত্বকে জনসাধারণে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে জানিয়াই তাহার মনটা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, তার উপর উর্ম্মিলার কাণ্ডে তাহার মাথার ভিতরে আগুন ধরিয়া উঠিল। ত্যাগ তখনি সফল হয়, যখন তাহার সেই ত্যাগের মূল্য পাঁচ জনের শ্রদ্ধা দিয়া শোধ করিয়া দিতে পারে। এ ত আর তাহার নিষ্কাম ত্যাগ নয়; এ যে প্রচণ্ড কামনাতেই ভরা আত্মোৎসর্গ। একে নীরবে সঁপিয়া দিতে প্রাণও চায় না, আর এর প্রয়োজনীয়তাও তা নয়। বুঝিবার এবং বুঝাইবার সহস্র প্রয়োজন যে ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছে।—তারপর উর্ম্মিলা! বিনয়ের অমূলক ঈর্ষাকলুষিত গ্লানি শুনিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশ্চয়ই সে বিনয়ের বিরুদ্ধে এই ঘোরতর ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। মিঃ তরুণচন্দ্র লাহার যে বিনয়ের প্রতি মর্ম্মান্তিত আক্রোশের কারণ থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, সেটা দু'দিন আগে হইলে বিনয় হয়ত বিশ্বাস করিতেই পারিত না; এখন সহজেই পারে।

কিন্তু কি ভয়ানক নীচ এবং ঈর্ষ্যা-প্রবল চিত্ত ঐ উর্ম্মিলার? আশৈশবের সহচরী সকল সুখ-দুঃখের নিত্য সঙ্গিনী চির-অপরিচিত পরের মুখের দুইটা কথায় সে তাহাকে এত বড় অবিশ্বাস করিয়া বসিল, এবং এমন হিংস্র জন্তুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিল! উর্ম্মিলার প্রতি কবে কি অন্যায় সে করিয়াছে? সে যখন যাহা আব্‌দার করিয়াছে, তখনই যত টাকাই খরচ হোক্, তাহাকে যোগাইয়া দিতে ছাড়ে নাই। ছোট-বেলার কথা ছাড়িয়া দাও, বড় হইয়া অবধি কোন রূঢ়-কথা কোন দিনই বলে নাই। আর কি করিবে? তবে কৃষ্ণা-সম্বন্ধে তার রাগ করিবার কি ঘটিতে পারে? কৃষ্ণাকে সে ভালবাসিয়াছে, তা সে অস্বীকার করে না। করিবার কোনই কারণও নাই। কৃষ্ণার সংস্রবে আসিতে পাইলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? কিন্তু শুধু পরের মুখের একটা উড়ো খবরে নিজের চিরপরিচিত স্বামী-না হোক স্বামীরূপেই পরিচিত—তবু বন্ধুকেও এমন ঈর্ষ্যা-কলুষিত বজ্রবাণ হানিতে যাওয়া উর্ম্মিলার কি উচিত হইয়াছে? তাহার মনের চোখে সেই বহু বৎসরে অস্পষ্টপ্রায় ঘটনাটা আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠিল।—সে যেদিন তাহাকে 'স্পাই' বলিয়া নিজের ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সেদিনের কথা! আজ ভাগ্যচক্র সত্যই কি তাহাকে তাহাই তৈরি করিয়া তুলিল? সত্যই আজ উর্ম্মিলা পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করিল!

সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জনের কমনীয় মুখ তাহার মনোদর্পণে এই কালিমালিপ্ত কলঙ্কিত

মূর্ত্তির পাশেই ফুটিয়া উঠিল।—সে ত্যাগে সমুজ্জ্বল, অবিচলিত নারী-মহিমায় দৃপ্ত ও মহিমান্বিত, অথচ স্নেহময় ;—সে কৃষ্ণা!

ইহার পর হইতে যতবারই উর্ম্মিলার দুঃসহ স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার চিত্তে একটা অসহনীয় দুঃস্বপ্নের মতই উদিত হইতে লাগিল, ততই সে গভীর ঘৃণার সহিত ইহাকে সযত্নে পরিহার করিয়া লইয়া কৃষ্ণার কথাই ভাবিবার চেষ্টা করিল। যে উর্ম্মিলার সহিত তাহার পরিচয় ছিল, সে যাহাকে ভালবাসিত, সে ত নাই! তবে আর তাহার কথা ভাবিয়া কি হইবে? যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে গুরুতর রাজদ্রোহের অভিযোগে ফেলিবার সাহায্য করিতে পারে, সে তার স্বামীর চোখে মৃত। উর্ম্মিলা—সেই ক্ষুদ্র চঞ্চল সানন্দ চিরসঙ্গিনী উর্ম্মিলার শবদেহ কোথাও পড়িয়া থাকিতে পারে, সে নিজে নাই, ইহা সুনিশ্চিত।— আর সে বিনয়ও নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শরতের পূর্ণিমার চাঁদ প্রথম সন্ধ্যাতেই প্রচুরতর রূপালি আলো ধরণীবক্ষে ঢালিয়া দিয়াছেন। বিনয়দের বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানের সেই প্রকাণ্ড দীঘি! চারিদিকে তার ফুল ফলের চিত্রকরা ফ্রেমের মতই সবুজ ঘাসের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য রকম বৃক্ষ লতা। আর মাঝখানে যেন গগনাঙ্গনের কুলবধূ তারকাদের মুখ দেখিবার দর্পণের মত সেই দীর্ঘিকা জ্যোৎস্নালোকে ঝল্‌মল্ করিতেছে। ষোলকলায় পরিণত পূর্ণচন্দ্র তার বুকের উপর মৃদু হিল্লোলে দোল খাইয়া খেলা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের দোলনমঞ্চের চারিধারের ষোলশত গোপিনীর মতই নক্ষত্র-মেয়েরা সে খেলায় যোগ দিয়া কৌতুকভরে নৃত্য করিতেছিল আর সমস্ত আকাশ পৃথিবী জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া গিয়া যেন একখানা প্রকাণ্ড সোনার পাতের মতই ঝিলিক্ হানিতেছিল।

উর্ম্মিলা উদাস উন্মনা হইয়া এই দীঘির পাড়ে বসিয়া আছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর সে সময়ে আলোকের পুলক স্পর্শ অঙ্গে লইয়া সুখের হাসি হাসিয়া উঠিয়াছে, একান্ত অসহায় ও অন্ধকার হৃদয় মন লইয়া সে তখন একাকিনী এই নির্জ্জন জলের ধারে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়াছিল। কি উদ্দেশ্য মনে লইয়া যে সে এই ভরা সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহিরে জনশূন্য বাগানের মধ্যে অনন্যসহায় হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তার মনের সেই গোপন চিন্তা আমরা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক নহি। তবে আসিবার কালীন একখানা গামছা কাপড় সে হাতে করিয়াই আসিয়াছিল, অর্থাৎ যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, মনে করিবে কাপড় কাচিতে চলিয়াছে।

ঘাটের উপর প্রশস্ত চাতাল, তার দুই ধারে বাবুদের বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্য মার্বেল-পাথরে বাঁধান আসন। দু পাশে আলোকাধার লাঠন মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বিপিন শীলের মৃত্যুর পর আর তাহাতে কেহ আলো জ্বালে নাই। সেইখানে কাপড় রাখিয়া উর্ম্মিলা এক পা এক পা করিয়া নামিয়া জলের একেবারে কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের আলোয় সোনালী জল তাহার পায়ের পাতা ধোয়াইয়া তাহার কালাপানী রংএর শাড়ীর চওড়া লাল পাড়টি স্পর্শ করিল। তখন উর্ম্মিলা একবার উর্দ্ধে সেই অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় তারকামণ্ডিত আকাশে দৃষ্টি তুলিয়া কাহার উদ্দেশ্যে তাহার যুক্তকর ললাটে ঠেকাইল, একবার অ-দূরে নিজেদের বাড়ীর মুক্ত বাতায়ন-পথে যে সন্ধ্য প্রজ্বলিত সন্ধ্যা-দীপটী নবোদিত একটি তারকার মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই দেখিল।

তারপর দীর্ঘিকার পরপারে যেখানে গন্ধরাজ গাছের ঝোঁপে ঝোঁপে হাজার ফুলের নক্ষত্র খচিত হইয়া আছে, সেইদিকে চাহিতেই তাহার গভীর ভারাক্রান্ত চিত্ত মথিত করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়া আসিল। জলে স্থলে গৃহে কাননে সর্ব্বত্রই যে তাহার সেই একমাত্র প্রিয়তম—চিরসখার অবিস্মৃত জ্বলন্ত স্মৃতি এই ভুবনভরা জ্যোৎস্নাজালের মতই ব্যাপ্ত হইয়া আছে! শুধু—নাই বুঝি চাঁদের আলো যেখানে ছায়া হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর কান্না হাসি যেখানে পুরাণো কথার দহন দিয়া অহোরাত্রকে অগ্নিময় করিয়া রাখে না, সেই নির্জ্জন নিরালোক নিঃসঙ্গ জলতলে?

উর্ম্মিলার সহিবার শক্তি সীমাতিক্রম করিতেই সে এই উপায়টাকেই সব চেয়ে সহজ বলিয়া অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু যখন সময় আসিল, তখন দেখা গেল, তাহার দুর্ব্বল বালিকা চিত্ত এত বড় বিপাকে পড়িয়াও আজন্মের সংস্কারকে কোন মতেই ঠেকাইতে পারে নাই। এক দিকে মানুষের স্বভাবজাত প্রাণের মায়া, অপর পক্ষে আত্মঘাতীর বিপরিণামাশঙ্কা তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আকণ্ঠ সলিলমধ্য হইতে কূলে উঠাইয়া দিল। তখন ঘাটের সিঁড়ির উপর লুটাইয়া লুটাইয়া যে কান্না সে পরিজনবর্গের মধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও কাঁদিতে পারে নাই, সেই বুক-ফাটান পাথর-গলান মর্ম্মভেদী প্রাণের কান্না কাঁদিতে লাগিল। এই যে মরণের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইতে আসিয়া সেই অচিন্ দেশের অনিশ্চয়তাকে ভয় করিয়া তাহার শঙ্কিত ভীরুচিত্ত যুদ্ধে বিমুখ যোদ্ধার মতই পলাইয়া আসিল; এরপর এই বিড়ম্বনাময় জীবন লইয়া সে বাঁচিয়া কি করিবে? মরিবার আশায় যে এতক্ষণ সে অনেক অসহনও সহিয়াছে। সে আশা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এই বিড়ম্বনার বিষে জর্জ্জরিত হৃদয়-মনকে সে কি দিয়া আজ ঠেকাইয়া রাখে!

বাড়ীর বিষয়কার্য্য-নির্ব্বাহক হরিচরণ বিশ্বাস বহু পুরাতন কর্ম্মচারী, কিছু ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেলখানায় সে বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সে-ই ফিরিয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রীর পায়ে বিনয়ের শতকোটি প্রণাম নিবেদনপূর্ব্বক, তাঁহার একটুখানি আড়ালে বধূ উর্ম্মিলাকে নিতান্ত দুঃখ এবং কুণ্ঠার সহিত বিনয়ের প্রেরিত বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। অনেকবার কাশিয়া সাহারা মরুর মতই কেশ বিহীন মস্তক ঘন ঘন কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কোনমতে কুসংবাদটাকে সে অনিচ্ছা-শিথিল ব্যথিত-কণ্ঠে জানাইল।—

বলিল,—"বউ-মা! কি জানি মা! এ সব কথার মানে তো জানি নে, ছোট দাদাবাবু বল্‌তে বল্লে, তাই মুখ দিয়ে বার কর্‌তে হচ্চে মা! নইলে এই বুড়-ছেলের সাধ্যি কি ছিল যে, মা'র সাক্ষাতে এত বড় কথা মুখ থেকে বার কর্‌তে পারে? দাদাবাবু তোমায় বল্‌তে বলে দিলেন যে, ছয় বৎসর আগেই তিনি নাকি তোমার প্রকৃত পরিচয় জেনেছিলেন; আজকের এই গোয়েন্দাগিরিতে তিনি তাই কিছুমাত্র বিস্মিত হন্‌নি।—তিনি বল্লেন, উর্ম্মিলাকে বলো, তার সন্দেহটা নিঃশেষেই ভঞ্জন হয়ে যেতে পার্‌বে; কারণ তারই অনুগ্রহের দান মাথায় তুলে নিয়ে এ জন্মের মত পৃথিবী থেকে আমায় সরে যেতেই ত হবে। আর সেইটুকুতেই শুধু আমারও মনে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে যে তার মুখ আমায় আর কখন দেখ্‌তে হবে না।"

উর্ম্মিলার দুই কান জ্বালা করিয়া বধির হইয়া গেল। তারপর আর কোন কথা যদি তাহাদের বিশ্বাস দা'র মুখ হইতে বাহির হইয়াও থাকে, তো, উর্ম্মিলার শ্রবণেন্দ্রিয় তাহাদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। অলক্ষ্য হইতে যে বিষাক্ত শর তাহার নিরন্তর পিষ্ট ক্লিষ্ট অহোরহ অনুতা-

পানলে বিদগ্ধ প্রায় অন্তঃকরণকে উদ্দেশ করিয়া সন্ধান করা হইয়াছিল, তাহার নির্ঘাত আঘাতে রক্ত রঞ্জিত বিদীর্ণ বক্ষে সে সবলে দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং তারপরই অকস্মাৎ মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল।

সেবারের মূর্চ্ছা-ভঙ্গে উর্ম্মিলা মনের মধ্যে কি একটা বল-ভরসা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়া শীঘ্রই অনেকখানি সংযত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন? এইবারই তাহার নিপীড়িত বুকের মধ্যে মুক্ত হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়া প্রাণ যেন আতঙ্কে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তবে এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত জীবন,—পতিঘাতিনীর জীবন,—এই দুর্ব্বিসহ জীবনও তাহাকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে? ঘৃণার ও ভয়ের তাড়নায় উর্ম্মিলার গুরুভারাতুর বক্ষে আর যেন শ্বাস লইবারও শক্তি রহিল না। মনে মনে সে ক্ষণিকের জন্য আশা করিল; যদি দমটা বন্ধ হ'য়ে যায়!—তারপর যেমনি এই বাগানেরই ভিতর—অদূরে কোলাহল শব্দে একদল শৃগাল ডাকিয়া উঠিয়াছে; অভ্যাসবশতঃ চম্‌কাইয়া উঠিয়া পড়িতে গিয়া উর্ম্মিলার ঠোঁটে বিদ্যুতের মত এক লহমার জন্য একটুখানি তীব্র হাসি খেলিয়া গেল। এই না সে মরণ খুঁজিতে আসিয়াছিল!—বিস্মিত হইল। মুখে যতই বলা যাক্, মানুষের প্রাণের মায়াটাই বুঝি তার সকল মায়ার চাইতেই প্রকাণ্ড বড়? নহিলে শৃগালে কুকুরে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইলেও যার পাপের এতটুকু প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় না, সেই মানুষ শৃগালের ডাক শুনিয়াই প্রাণটা লইয়া পলাইতে চাহে? হায় রে, বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি! ধন্য তুই!—নিজের পরে তাহার অশ্রদ্ধার আর অন্ত রহিল না।

বাগানের মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজও যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। গভীর অন্যমনস্ক উর্ম্মিলার কর্ণে সে সমস্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। সহসা সে সর্ব্বশরীরে চমক খাইয়া শুনিতে পাইল, "বৌঠান্! বলি হ্যাগা বৌঠান্! তুমি কি এখানে আছ?"—

কাদি-ঝি হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ঝুলাইয়া হাঁক দিতে দিতে আগে আগে আসিতেছিল, আর তার পিছনে পিছনে আরও দু'জন মানুষের অস্তিত্ব বুঝা গেল। দু'জনের মধ্যে একজন দরোয়ান্ বজীর সিং, কাদির পিছনে লাঠি ঠুকিয়া নাগরা জুতা বাজাইয়া চলিয়াছে।

স্বপ্নময় জগৎ হইতে জাগ্রতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উর্ম্মিলা উত্তর দিল, "হুঁ।"

"যা হোক্, যা হোক্ মেয়ে তুমি বাছা! বলিহারি যাই; তোমার আক্কেলকে!—হাজারটা গড় করি তোমার বুকের পাটাকে! এই সাঁজসজ্যেবেলা, পাখ্‌পাখালি—হাওয়া-বাতাস আছে, অন্ধকারের আনাচে-কানাচে, আদেখা মাটিতে বুক দিয়ে কত কি কোথায় লুকিয়ে আছে, আর এই রাত পহর হ'তে যায়, কেউ কোথায় নেই, এখানে এসে চুপটী-মেরে কিনা বসে থাকা হয়েচে!"

কাদির বক্তৃতায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া কিন্তু উর্ম্মিলা মুখ ফিরাইয়া—"যা, যা, তোকে কেউ লেকচার ঝাড়্‌তে ডেকে পাঠায় নি—" বলিয়াই থম্‌কিয়া থামিয়া গেল। শুধু কাদি নয়, কাদির সঙ্গে আরও কেহ—অপরিচিত কেহ আছে।

সে তাহার এই মানসীক বিপ্লবের মাঝখানে এমন করিয়া অজানা কাহারও উপস্থিতি একটুও পছন্দ করিল না; অথচ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায়ও কিছু চারিদিক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া না পাওয়ায় মৌন হইয়া যেমন তেম্‌নি বসিয়া রহিল। তা দেখিয়া—যে আসিয়াছিল, সে সিঁড়ির

আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া পড়িল ও কহিল, "আপনার নাম তো উর্ম্মিলা শীল ?—বিনয়বাবুর স্ত্রী আপনিই—আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে। ঝি, তুমি ওপারে গিয়ে বসোগে।"

"বিনয়ের নামটা ইহার গলাতেই কাঁপিল, কি সে কম্পনটা উর্ম্মিলারই বুকের, তাহা ধরিবার তেমন উপায় ছিল না। উর্ম্মিলা সেইরূপ কম্পমান-বক্ষে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল "আমি উর্ম্মিলা।—"

কি কথা' সে প্রশ্নই সে তুলিল না। কারণ তাহা জানার কোনই কৌতূহল তাহার এই শোকাচ্ছন্ন হতাশান্ধকার ও যন্ত্রণা-বিক্ষত চিত্তের কোণেও উদিত হয় নাই। কোন কিছুর রস নিংড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া দিলে সেটা যেমন নিঃসত্ত্ব হইয়া যায়, ইহার মনটারও আজ সেই দশা।

উর্ম্মিলার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই অপরিচিতা নিজ হইতে বলিল,—"বিনয়বাবুর যে চিঠিখানা আপনি আপনার ভগ্নিপতি তরুণচন্দ্র লাহাকে দিয়েছিলেন, সেখানায় যা লেখা ছিল, আপনার কিছু মনে পড়ে কি ?

উর্ম্মিলা এবার একটু বিস্মিতা হইল, তারপর ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, "না,—কিন্তু আপনি সে চিঠির কথা জান্‌লেন কেমন করে ?"

"জানা আর আশ্চর্য্য কি ? আপনাকে লেখা পত্রই বিনয়বাবুর বিপক্ষের সব চাইতে বড় প্রমাণ, এ ত দেশশুদ্ধ লোকেই জানে। তবে সেটা যে আপনি মিঃ লাহাকে দিয়েছেন, সেটা অবশ্য আন্দাজ করে নেওয়া গেল। যেহেতু তিনি যে আপনার ভগ্নিপতি, সে কথা আমি জানতুম। মনে কর্‌বার চেষ্টা করুন দেখি,—কি কি কথা ছিল তাতে ?"

উর্ম্মিলা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। চেষ্টা সে সাধ্যমত করিয়া দেখিল, তারপর হতাশভাবে কহিল, "মনে পড়্‌লো না, কিন্তু—কেন ?"

"বড্ড দরকার ছিল।—তাতে আপনার স্বামীরই ভাল হতো, দেখুন, যদি মনে কর্‌তে পারেন ? সবটা না হোক্, তবু"—

এবার উর্ম্মিলা চমক-ভাঙ্গা হইয়া হঠাৎ সেই প্রস্ফুট চন্দ্রালোকের মধ্যে উন্নমিতাননে আগন্তুকার মুখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। চাহিয়াই কিন্তু যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা তাহার অন্তরের আকস্মিকোদিত ঘোরতর বিস্ময়াভিহত হইয়া গিয়া অকস্মাৎ জিহ্বামূলেই সংহত হইয়া রহিল। যা দেখিল, সেটা সত্য কিনা! সেইটেই তাহার সংশয় বোধ হইল। এত কাছে এমন জিনিষ সে যেন এর আগে আর কখন দেখে নাই!

আকাশে চাঁদ তখন ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী হইতেছেন। জ্যোৎস্নাধারা স্ফটিক স্বচ্ছ ঝরণা-ধারার মতই ধরণী-অঙ্ক শীতল সুমিষ্ট রজতালোকে শুভ্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। জলের মধ্যেও শশাঙ্কের সেই সুবর্ণ মূর্ত্তি দীর্ঘ দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া নিজের রূপের গৌরবে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। উর্ম্মিলার মনে হইল, এ মুখ দেখিয়া উহারও একটু লজ্জা বোধ করিলে ভাল দেখাইত! সে বিমুগ্ধ এবং সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে কহিয়া উঠিল—"তুমি—আপনি কে ?"

তাহার কণ্ঠের বিস্ময়ধ্বনি ও মোহের ভাব লক্ষ্য করিয়া অপরিচিতা মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। প্রকাশ্যে সে যেমন তেম্‌নি শান্তস্বরেই উত্তর দিল,—"আমার নাম যে আপনি

শুনেছেন, তাতে আমার সংশয় নেই; কারণ তা' না হলে আপনার সে চিঠি আজ মিঃ লাহার কাছে পৌঁছত না।—আমার নাম কৃষ্ণা মল্লিক।"

এই নামই যে উর্ম্মিলা আর কখন শুনিয়াছিল, তা নয়; তবে ইহার রূপের খ্যাতিটা যে রকম তাহার বুকের বেদনায় মোচড় দিয়া গিয়াছে, তাহাতে এই রূপসীকে তাহার মন চিনি চিনি করিয়াই উঠিয়াছিল। এখন যেন সম্পূর্ণরূপে ইহাকে চিনিয়া লইয়াই তাহার জ্বালা-ভরা চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে একেবারেই ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল।

এ কথা মনে পড়িতেই তাহার সকল অবসন্নতা এক মুহূর্ত্তে কোথায় যেন চলিয়া গেল; শরীর মন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া কিসের যেন একটা প্রবল অস্থিরতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন টান মারিয়া সেখান হইতে উপ্‌ড়াইয়া তুলিয়া লইল। উত্তেজিত আরক্ত মুখে সে বেগের সহিত বলিয়া উঠিল "ওঃ! আজকে তাই বুঝি তুমি আমার দুর্দ্দশা দেখে আনন্দ করতে এসেছ? তোমার পথ সাফ হচ্ছে কি না জানতে এসেছ?" তাহার সমস্ত দেহ জলস্রোতোহত শৈবালদামের মতই ভিতরে বাহিরে কাঁপিতে লাগিল।

কৃষ্ণা ইহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইল, কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, "রাগ-অভিমানের দিন এখন আপনারও নেই, আমারও নেই। শান্ত হ'য়ে এখন আমার কথা ক'টা শুনে নিন্, আমায় আবার এখনি ফিরে যেতে হবে। বিনয়বাবুর ও আমার সম্বন্ধে কত দূর কি আপনি শুনে থাকতে পারেন, সে আমার জানা নাই থাক্, আন্দাজ একটা আছে। ধরেই নিন্, আপনার স্বামী অন্যাসক্ত। কিন্তু তাই বলে আপনি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী, স্বামীকে ফাঁসী-কাঠে ঠেলে দেবার মত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি কিছু আর আপনার মধ্যে নেই? যা হয়ে গেছে—তার জন্য বৃথা পরিতাপ অথবা মনের গ্লানিতে নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু একটা বিপাক ঘটিয়ে তুল্লেও কিছু আর তার প্রতিবিধান হবে না। তার চাইতে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, যদি কোন মতে অন্ততঃ তাঁর দণ্ডটাও কিছু লাঘব করতে পারা যায়। কি বলেন?"

উর্ম্মিলার কথা কহিতে বিলম্ব ঘটিল, পরে বলিল,—"তা হলে তুমি ত ওকে ভালবাস?"

কৃষ্ণার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ এক রকম হাসির আভায় চক্‌চকে হইয়া উঠিল,—"ধরুন্ যদিই বাসি! তা সে বিচারটা তিনি মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এলে করলেই ভাল হয় না? কেউ কারুকে ভালবাসলেই কি তাকেও কুইন এলিজাবেথের মতন চরম দণ্ড দিয়ে দেবেন?—আবার একটু হাসিয়া বলিল, "তা হলে আমাকেও এই দীঘির জলে কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরতে হুকুম দেবেন নাকি?"

ইহার এই মর্ম্মঘাতী নিষ্ঠুর পরিহাস ঘাতকের ফাঁসের দড়ির টানের মতই উর্ম্মিলার শ্বাস রোধ করিয়া আনিল। ক্ষণকাল সে সেইভাবে নীরব থাকিয়া তারপর উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাকে কি করতে হবে?"

"সেই চিঠিখানায় কি লেখা ছিল,—যতটা পারেন মনে করে বলুন।—"

"তাতে লাভ?"

কৃষ্ণা কহিল, "আছে বলেই বলছি।—কি আছে তা আপনি এখন বুঝতে পারবেন না, কিন্তু ফল পেলেই জানতে পারবেন।"

ঊর্মিলা কি ভাবিল, পরে চিন্তিতভাবে কহিল, "কিন্তু কেমন ক'রে জান্‌বো যে আমার তুমি ঠকাচ্ছো না? জামাইবাবুকেও তো আমি খুবই বিশ্বাস করেছিলুম। বিশেষ তিনি আপনার লোক।"

কৃষ্ণা কহিল, "তিনি আপনার আত্মীয় হ'লেও তাঁর স্বার্থ আপনার সঙ্গে এক নয়, তাই তাঁর হাতে আপনার বিশ্বাসের মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ছেলেমানুষ, সংসারানভিজ্ঞ,—কাজেই তাঁর দুরভিসন্ধির মধ্যে ঢুক্‌তে পারেন নি, আমায় কেন সংশয় কর্‌চেন?"

ঊর্মিলা একবার ভাল করিয়া সকল কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। মিঃ লাহার সমবেদনা, সহানুভূতি, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ, বিনয়ের সেই হেঁয়ালীর জাল-বোনা চিঠি, এবং তাঁর সঙ্গীন প্রত্যুত্তর! তার পরের সকল কথা—বিনয়কুমারের গ্রেপ্তারের খবর এবং হরিচরণ বিশ্বাসের দৌত্য!—ঊর্মিলার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, সচন্দ্র তারকা সমস্ত আকাশ, পৃথিবী, দ্যুলোক এবং ভূলোক সমস্তই ঝাপ্‌সা টল্‌টলে ও এলোমেলো হইয়া তাহার চারি পাশে যেন হাজারটা প্রেতযোনীর মত বিকটচ্ছন্দে ও বিভৎস তালে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের বিকৃত ভঙ্গী ও বিকট স্বর তাহার ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে প্রবল কম্পন বেগে জাগিয়া উঠিয়া তাড়না করিয়া বলিল, "খবরদার!"—সেও যেন সন্দেহের তাড়নাকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া নিরাশ্বাসের মর্ম্মচ্ছেদী বিলাপ-ধ্বনির মত উচ্চারণ করিয়া গেল, "আমি বল্‌বো না,—আর আমায় কেটে ফেল্লেও আমি তার সম্বন্ধে একটি কথাও কারু কাছে বল্‌বো না। আমায় যা কর্‌তে হয় তোমরা কর।"

কৃষ্ণার মুখে ঘোর হতাশার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। স্বল্পক্ষণ কর্ত্তব্য-বিমূঢ়াবৎ থাকিয়া পরিশেষে শেষ-চেষ্টার মতই সে নিজেকে সবল করিয়া লইয়া ঊর্ম্মিলার কাছে আরও সরিয়া আসিল,—তারপর তাহার হাত আদর করিয়া ধরিয়া স্নেহ-কোমল-সিক্ত-কণ্ঠে কহিল —"ভেবে দেখ বোন্! আচ্ছা, তোমারই বিশ্বাসমতেই না হয় একবার মনে করে দেখ, তাঁকে যদি আমি ভালই বেসে থাকি, তা' হলে যাতে তাঁর ভাল হয়, তাই তো একান্তভাবে আমার চেষ্টা হবে? আমি কিছু তাঁর অনিষ্টে যোগ দিতে পার্‌বো না? তবে কেন আমায় তুমি অনর্থক অবিশ্বাস কর্‌চো?"

ঊর্ম্মিলা কোনই দ্বিধা করিল না,—নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—"তাঁর ভাল করা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যেমন করে হয় কর্‌বেই। কিন্তু আমার যে তুমি মন্দ কর্‌বে না, তার আমি কি জানি? একেই তিনি আমার উপর রাগ কর্‌চেন, এই অবসরে আমায় জন্মের মত তাঁর বিষ করে দিয়ে নিজের পথ—নিজের পথ খালি করে নেবে না যে তার ঠিক কি?—আমি কিছু বল্‌বো না, তাতে আমার ভাগ্যে যা হয় হোক্।"

এই বলিয়া আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গমনোদ্যতা হইল।

তখন একটা ক্ষুদ্র অথচ ক্ষুণ্ণ শ্বাস ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কৃষ্ণাও উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাই হোক, আর যে আপনি আপনার স্বামী-সম্বন্ধীয় কোন কথা কারুর কাছে বল্‌বেন না বলে স্থির করেছেন, তাতেও আমি অনেকটা ভরসা পেয়ে গেলুম। আমার এখন অন্য দিক থেকে চেষ্টা কর্‌তে হবে।—তা' হলে আসি।"

এই বলিয়া সে ত্বরিৎপদে সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক পাথর-বাঁধন চাতালের উপর যেমন পা

দিয়াছে, পিছন হইতে শুনিল,—দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—", এবং উর্ম্মিলা রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াই তাহার হাত 'জোর' করিয়া চাপিয়া ধরিল।—"তুমি সাহসী, বুদ্ধিমতি, শুনেছি খুব বিদ্যাবতী,—তুমি ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে বলো? আমি বোকা মুখ্যু—কি বল্‌তে কি বলেছি—তা বলে আমার উপর রাগ করে তুমি তার ক্ষতি হতে দেবে না আমায় বলে যাও?"

কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া উর্ম্মিলার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "পাগল!"

"বলো, তার ফাঁসি—উঃ বাবা রে!—দ্বীপান্তর—জেল কিছু হবে না? বল তুমি বাঁচাবে? বলো তুমি ওকে বাঁচাবে? কি করে, সে আমি জানি নে, শুধু বলো পারবেই,—

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া শুধু জবাব দিল, "হুঁ"।

"চিঠির কথা সত্যি আমার মনে নাই—থাক্‌লে তোমায় বল্‌তুম—এই বলিয়া উর্ম্মিলা নত হইয়া কৃষ্ণার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার দুই পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।—"দিদি! দিদি।"

"বোন্!"—

"যদি বাঁচাতে পারো, আমার স্বামীকে তুমি আর ভালবাস্‌বে না আমায় বলে যাও?"

কৃষ্ণা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তারপর তাহার কনকাঞ্জলীবৎ দু'খানি সুঠাম সুন্দর করতল উর্ম্মিলার নত মস্তকের উপর স্নেহপূর্ণ আদরে স্থাপনপূর্ব্বক সেইরূপই গাম্ভীর্য্যময় অথচ ঈষৎ ক্ষীণ হাস্য মণ্ডিত-মুখে কহিয়া উঠিল, "পাগ্‌লি কোথাকার! আয় উঠে আয়।"—

উর্ম্মিলা কৃষ্ণার দুই পা দু'হাতে জোর করিয়া আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া নিজের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তাহারই মধ্যে গুঁজিল।—"বলো, আমার স্বামীকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে না—বলো? আমি যে সে সইতে পার্‌বো না—কিছুতেই যে সে আমার বুকে সইবে না। মরে যে নিশ্চিন্ত হবো, তারও যে আমার উপায় নেই। মর্‌তেই তো আজ এসেছিলুম—পার্‌লুম কই? সাহস হ'লো না যে! তা' হলে আমার কি গতি হবে?" উর্ম্মিলার চোখের জলেতাহার প্রতিপক্ষের পা ভিজিয়া গেল।

"উর্ম্মিলা!"—কৃষ্ণা জোর করিয়া উহাকে টানিয়া তুলিয়া কিছুক্ষণ কথা খুঁজিয়া পাইল না। পরে নিজেকেও সাম্‌লাইয়া লইয়া এবং রোদনকম্পিতা বিবশা বিহ্বলা উর্ম্মিলাকেও কথঞ্চিৎ শান্ত হইবার অবসর দিয়া নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া বলিল, "উর্ম্মিলা! মানুষকে অত ছোট ক'রে দেখো না।—তোমার স্বামী তোমারই আছেন, এক দিনের জন্যও তিনি আর কারু হন্‌ওনি, আর হবেনও না। মন্দ লোকে তোমার কাছে মিথ্যা রটনা করে গেছে মাত্র। এ সব ভুলে যেও। এ নিয়ে ভবিষ্যতে দুজনে আর নূতন দুঃখের সৃষ্টি করো না।"

"তিনি কি আর কখন আমায় ক্ষমা করবেন? না না, কিছুতেই তা বোধ হয় পার্‌বেন না।"—বলিয়া উর্ম্মিলা আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। "আমি যে কত বড় অপরাধ করেছি, সে ত তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছো, এর পর কি কেউ আর ক্ষমা পেতে আশা করে?—করে কি?"

"আমায় বিশ্বাস করো, তোমায় ক্ষমা তিনি করবেন।"

উর্ম্মিলার বুকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের তড়িৎ মুহুর্ম্মুহু চকিত হইয়া গেল,—"কি করে তুমি

জান্‌লে? সত্যি পার্‌বেন? সত্যি তিনি খালাস পেয়ে ফিরে আস্‌বেন? আমায় ক্ষমা কর্‌বেন? আমায় ফিরে চাইবেন? সত্যি, এ কি সত্যি? তুমি—তুমি তাঁকে আমারই থাকতে—”

সঙ্কোচে বাধা-পড়া কথাটাকে শেষ হইবার অবকাশ না দিয়াই কৃষ্ণা তাহার সকল প্রশ্নকেই সমষ্টিগত করিয়া লইয়া উত্তর দিল—“নিশ্চয়।”—তারপর উর্ম্মিলা আবার মাটিতে পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা লইবামাত্রে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ দুই হাতে ধরিয়া তাহার ললাটে নিবিড় স্নেহে চুম্বন করিয়া গাঢ় অথচ শান্তস্বরে সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, “সাবিত্রী সমানা হও।”—তারপর আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যশোরের সেই গোলাপ-বাগানে যেমন বসন্তে তেম্‌নি শরৎকালেও আজ ফুলের মেলায় কিছু কম পড়ে নাই। প্রাচীরের ধার ঘেঁসিয়া যে সকল দেশী ফুলের গাছ বসন্তের উতল হাওয়াকেও জয় করিয়া উর্দ্ধমুখীন্ স্তব্ধ সমাহিত চিত্ত সাধুর মতই অটল ছিল; আজ শরৎ-লক্ষ্মীর পূজা উৎসবে সানন্দ-উল্লাসে যোগদান করিতে তারাও নিজ নিজ যোগৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়া দিয়াছে। লাল, সাদা ও পদ্ম করবী, গন্ধে-ভরা গন্ধরাজ, রূপরাণী স্থলপদ্ম, অপরাজেয়া অপরাজিতা ও অতসী, অশ্রু-সজলা, সু-ফলা সেফালিকা এবং তদ্ভিন্ন কামিনীফুলে হাজার বাতি নিশীথ রাত্রির আঁধার বুককেও আলো করিয়া থাকে। ফটকের মাথায় যে বিগ্নোনিয়া লতাটি ছিল, তার বড় বড় উজ্জ্বল কমলা-বর্ণের কুঁড়িগুলা ও সবুজ জমির ধারে ধারে বর্ণ-বৈচিত্রশালী গন্ধ-বিহীন জিনিয়া-ফুলের বাহার, পাশ্চাত্য সভ্যতার মতই অনেক দূরের লোককেও আকৃষ্ট করিয়া কাছে আনে। কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিতেই আরদালীটা ছুটিয়া আসিয়া আভূমি-নত সেলাম দিয়া আন্তরিক আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিল। খবর পাইলে ষ্টেশনে গাড়ী যাইত, অনর্থক এত কষ্ট করিয়া—ইত্যাদি নানা আপ্যায়ন আরম্ভ করিতেই সে দুইটা মিষ্টবাক্যে সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব বাড়ি আছেন. কি না?—”আরদালী জানাইল, তিনি খাসকামরাতেই আছেন। তবে এখনি বাহির হইবার কথা। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে মোটর-বাইকটাও নামান রহিয়াছে দেখা গেল। কৃষ্ণা উঠিয়া আসিয়া হলের সাম্‌নের বারান্দায় সাধারণ আগন্তুকদের বসিবার স্থানে একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া খবর দিতে বলিল। ‘কার্ড’ পর্য্যন্ত দিল না। আরদালীটা বিস্তর আপত্তি অনুযোগ করিয়া তাহাকে ভিতরে বসাইতে না পারিয়া, হার মানিয়া শেষে ভয়ে ভয়েই সংবাদ দিতে গেল। ইহাকে বাহিরে এমন দুরবস্থায় রাখিয়া গেলে, সাহেবের কাছে অন্ততঃ দুইটা গালিও যে খাওয়া নিশ্চিত, তাহাতে তার সংশয় ছিল না।

কিন্তু পূর্ব্ব-কর্ম্মের কিছু সুকৃতি থাকাই সম্ভব। সাহেবের মেজাজ আশ্চর্য্য বদল হইয়া গেল। যেমন সে গিয়া বলিয়াছে, “খোদাবন্দ! মিস্ সাব আয়া। লেকেন বাহারমে বৈঠা হ্যায়, ভিতর নেহি লে আনেসাকা গরীব পরবর!—গুলাম বহোত—”

সাহেব একটা কাগজ পড়িতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে পাইপের টানে অন্তরের উষ্মার মতই বাহিরেও রাশি রাশি ধূমধারা নির্গত হইয়া পড়িতেছিল। অনাগ্রহভাবে যথাকার্য্যে রত রহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কোন্ মিস্‌সাব?”

বেহারা বলিল, "হুজুর! আপনা মিস্ সাব—মিস্ মল্লিক সাহাব ক'ল্‌কাত্তা-সে আয়া—"

"হোয়াট্! মাই গড্! ইজ ইট্ পসিবল্?"—মিঃ লাহা লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।—তাঁহার হাত হইতে অগ্নিগর্ভ পাইপটা কার্পেটের উপর পড়িয়া ঘরময় আগুনের ছড়াছড়ি হইয়া গেল, খবরের কাগজখানা পায়ের তলায় পড়িল। বেহারা ছুটিয়া আসিয়া আগুন নিবাইতে লাগিল। তিনি তার মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণা একাকিনী বসিয়া সেই 'চায়নারোজ' ও 'মার্শেলনীল' জাতীয় গোলাপ-কুঞ্জের পানে চাহিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতেছিল। বারেক তাহার মুখ অদূরস্থ হরিদ্র গোলাপের মতই বেদনা-পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, আবার তাহা উহাদের মতই শুভ্র হইয়া পরিশেষে নিজের স্বাভাবিক বর্ণ বসোরা-গোলাপের উজ্জ্বলরূপ ফিরিয়া পাইল। মনে মনে নিজেকে সে এই আসন্ন সাক্ষাতের জন্যই তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিল।—অতীত বা ভবিষ্যৎকে ইহার মধ্যে এতটুকু প্রশয় দেওয়া চলিবে না।

"ভাল আছ তো বেবি?" বলিয়া মিষ্টার লাহা যখন বাহির হইয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বাহ্য-সংযমের ভিতর দিয়া কোনরূপ অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না—"পথে কোন কষ্ট হয়নি? ষ্টেশনে নেমেই গাড়ী পেয়েছিলে ত? সব সময়ে আমার গাড়ী থাকেও না।"

"হ্যাঁ, পেয়েছিলুম।—আপনি কি এখনি বেরুবেন?"

"বেরুতে একবার হবে। তবে এখনি না হ'লেও চলে। এসো, ভিতরে গিয়ে বসিগে।—"

কৃষ্ণা কহিল, "আমার জন্য আপনার কাজের ক্ষতি ক'র্‌বেন না; আমার শুধু গোটাকত কথামাত্র ব'ল্‌বার আছে। সেটা এখানে বসেই শেষ করে নিয়ে আমি এখনি আবার ফিরে যাব।"

"এখানে অন্য লোকও হঠাৎ এসে পড়্‌তে পারে, ঘরের মধ্যে গিয়ে ব'ললেও আমাদের সময়ের বেশী লোকসান হবে না।"

ঝড়ের আকাশকে বাহিরে যেমন প্রশান্ত দেখায়, মিষ্টার লাহার ধরণ-ধারণে সেই ভাবটাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

কৃষ্ণার ইঁহার আজ্ঞা পালনের রুচি বড় ছিল না, কিন্তু তা লইয়া তর্ক করিতে প্রবৃত্তি আরই কম ছিল বলিয়া অগত্যাই ইঁহার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতে হইল। হলের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মিষ্টার লাহা বেহারাকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের আরও কি, কির জন্য অনুচ্চস্বরে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার সেই ঘরটর সব ঠিকই আছে। সমস্ত তৈরি পাবে। যাও ঠাণ্ডা হ'য়ে এসো, তারপর তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। কেমন?"

কৃষ্ণা খুঁটির মত শক্ত হইয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িল। "চা আমার খাবার দরকার নেই, আমি আমার কাজটা, এখনই শেষ করে নিতে চাই।"—

মিষ্টার লাহা একখানা চৌকি তাহার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তা' হ'লে বসো।"—নিজে আর একখানা লইয়া অদূরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ যথেষ্ট শান্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও চোখের কোণ দুইটা চক্‌চকে হইয়া উঠিল।

"আপনি বিনয়বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর স্বামীর লেখা যে চিঠিখানা ভুলিয়ে এনেছেন, সেখানা একবার আমায় দেখাবেন?"

মিষ্টার লাহা বলিলেন, "যেখানায় বিনয় তোমাকে ভোল্‌বার জন্য প্রতিজ্ঞা করে তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত কর্‌তে চেয়েচে, সেই খানা? সে ত' এখন আর আমার হাতে নেই।"

এ আঘাত-চেষ্টাটা ব্যর্থ হইল কি কোথাও গিয়া নির্ঘাত বাজিল, তাহা জানিতে না দিয়াই কৃষ্ণা শান্ত ঔদাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সেটা এখন আর কোনমতেই কি প্রত্যাহার করাতে পারেন না?"

এ প্রশ্নও যে সম্ভব ছিল, এ সন্দেহ বোধ করি মিষ্টার লাহার মনে ক্ষণিকের জন্যও উদিত হয় নাই। তাই বিস্মিত এবং কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া কহিলেন, "সেটা প্রত্যাহার করাতে পারি কি না, জিজ্ঞেস্ কর্‌চো? আমাকে?"

কৃষ্ণা কহিল, "হ্যাঁ।"

মিষ্টার লাহা দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ভিতরের প্রবল ক্রোধোত্তেজনা সবলে দমন করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন, "না।"

"কিছুতেই না?"

"কিছুতেই না। আর কেনই বা তা করাতে যাব? বিনয় যদিও আমার নিকটতম আত্মীয়; এবং তার স্ত্রী আমার বিশেষ স্নেহপাত্রী, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাদের ভাই, ছেলেকেও মাপ করে চলা চলে না, সে ত' তুমি জানই! আমি গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বারমাস মোটা মাইনে খাচ্চি, তার নেমকহারামী কর্‌বো কেমন করে?"

কৃষ্ণার ললাট হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ভিতরে একটা রক্ত-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কষ্টে সেটাকে যথাসাধ্য দমনে রাখিয়া সে কহিল, "ইংলণ্ডের রুটীরই ঋণশোধ করুন; দেশের অন্ন জলের ধার শোধ না করে গেলেও সে আপনাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে না।—কিন্তু সে যা' হোক্; যেটাকে এখন কর্ত্তব্য-পালন বলে উল্লেখ কর্‌লেন, সে কাজটা তো চিরদিনই ও পর্য্যায়ে ভুক্ত ছিল না। এক সময় ওটা প্রতিশোধ নেওয়ার হিসাবেই তো আরম্ভ হয়েছিল, তখন নেমক-হারামীর ভয়টা এ ক্ষেত্রে ছেড়ে দিলেও দেওয়া যায় না তা' নয়। আর আমি বলি কি, তাই না হয় দিয়ে ফেলুন।"

মিষ্টার লাহা একবার স্থির তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি উহার মুখে প্রখরভাবে স্থাপন করিয়া লইয়া পরে অন্যদিকে চাহিয়া জবাব দিলেন, "তোমার ও আমার সম্বন্ধে বিনয় যে অপমান-সূচক কথাগুলো প্রচার করেছিল, তারই জন্য রাগ করে তুমি তার উপর শোধ নিতে চেয়েছিলে। সে তো তুমি পারো নি। তা' হ'লে আর প্রতিশোধের কথা তুল্‌চো কেন? প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা তোমারই তো তখন বেশী ছিল, না?"

কৃষ্ণা কহিল, "না, পারিনি। তাই আমায় অক্ষম দেখে আপনার সক্ষম হস্তে আপনিই সে ভারটা গ্রহণ করেচেন। তাই বল্‌চি, এখনও ওটা ফিরিয়ে নিন্।"

"বেবি!"

"রাগ কর্‌লেও একি মিথ্যা কথা মিষ্টার লাহা? বিনয় শীলকে আপনি আপনার সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়েই কি ঈর্ষা করেন না? এবং সেই আগুনেই কি সে আজ দগ্ধ হতে বসে নি?"

মিঃ লাহা ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে বিচলিত-স্বরে কহিলেন,

"মনের খবরের উপর কারু কোন দাবী দাওয়া রাখা চলে না বেবি! তা' হ'লে আমিও হয়ত' আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে এই প্রশ্ন করে বসতুম যে, এত লোকের মধ্যে আমার শালীপতি-বিনয় শীলের জন্যই বা আমার বেবির এতটা মাথা-ব্যথা কিসের?"

অবিচলিত ও সুস্পষ্ট-স্বরেই কৃষ্ণা কহিল, "সে ত আপনি জানেনই?"—এই বলিয়া সে অস্বাভাবিক স্থির-দৃষ্টিতে মিষ্টার লাহার যন্ত্রণাহত অন্তরের অকস্মাৎ উথলিত ক্রোধ-পাংশুল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। বেশ বুঝিতে পারা গেল, যেন ইচ্ছা করিয়াই সে এই শূলের ফলাটা তাঁহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন কণ্ঠস্বরের সামান্য কাঁপন ছাড়া মানসিক বিপ্লবের অপর কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। বলিলেন, "বিনয়ের স্ত্রী যখন আমার আপনার লোক, তখন তার ভাল মন্দও তো আমার দেখা উচিত। তার এই ষড়যন্ত্র-মামলায় যা'তে ফাঁসিটা অন্ততঃ না হয়, তার জন্য আমাকেও বিশেষ চেষ্টা ক'রতে হ'চ্চে। আরও ক'জন ছেলেকেও আরা, বাঁকিপুর থেকে ধরে আনা হ'য়েছে, তাদের নাম বোধ করি তুমি জানোও না—তারা আবার কেসটাকে জটিল না করে ফেলে! যে রকম সব এভিডেন্স্ পাওয়া যা'চ্চে; তা'তে ট্রানস্পোরটেসন্ ফর্ লাইফ না হ'লেই বাঁচি।"

কৃষ্ণা ভিতরে ভিতরে আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল, "তা' হ'লে এ মোকদ্দমা এখন চালাতেই হবে? কোনমতেই আর তুলে নিতে পারেন না? চিঠিখানায় ঠিক কি ছিল জান্‌তে পার্‌লেম না; তবে বোমার কথা বা লাট-বে-লাটকে খুন কর্‌বার মন্ত্রণা যে ছিল না, তা' আপনিও বেশ জানেন। বিনয়বাবুর মত সামান্য লোকে অমন একটা অসামান্য ব্যাপার ঘটিয়ে তুল্‌তে যে পারে না, সেটুকু মোটা-বুদ্ধি তাঁর ঘটে আছে। সে যাক্, এখন একটা শেষ মীমাংসা। কোন মূল্যেই বিনয়বাবুর ও তার খাতিরে আর যে ক'জন নির্ব্বিরোধী ভদ্র-সন্তানকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের মুক্তি ঘটা সম্ভব কি না?"

মিষ্টার লাহা সক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্র-কণ্ঠে কহিলেন, "বেবি! তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করচো, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গেই তা' করা চলে না। শুধু তুমি ব'লেই আমি সমস্ত স'য়ে যাচ্চি!—বিনয়কে পুলিস কি প্রমাণে ধ'রেছে, তার জিনিষপত্র সার্চ্চ কর্‌তে গিয়ে রিভল্‌বার, কার্টিজ বার হয়েছে, তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর লেখাপত্রে তাদের গুপ্ত-সমিতির কথা জানা গেছে, এ সব কি খবরের কাগজে পড়োনি? আমি তার কি কর্‌তে পারি? বিনয়ের লেখা সেই চিঠিখানা ঊর্ম্মিলা আমায় অর্থবোধ কর্‌তে না পেরে পড়্‌তে দেয়, অন্যমনস্কে পকেটে ফেলে রেখে-ছিলুম। সেদিন হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে তখন তার অর্থ আমিও কতকটা বোধ কর্‌তে পারায়, এখানে সেই সময়ে উপস্থিত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌কে দিয়ে দিই।—অবশ্য না দিলেও চল্‌তো। তবে ওটা আমার কর্ত্তব্য বলেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু আমি সামান্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার সাধ্য কতটুকু সে কি তুমি জানোনা যে, পুনঃ পুনঃ আমায় ওই প্রশ্নই কর্‌চো? গবর্ণর বা ভাইস্‌রয় ব্যতীত ও-সব মামলা কি যার তার হুকুমে রদ হয়?"

কৃষ্ণা নতমুখে বসিয়া থাকিলে, তারপর হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে গোপনে বুকের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—

"আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম; একটা পনেরোর ট্রেন্‌টা আবার ধর্‌তে হবে।"

মিষ্টার লাহা প্রথমতঃ নিজের সগর্ব্ব সম্রত ভঙ্গি বজায় রাখিয়া গম্ভীর ও ঔদাস্যপূর্ণ ভাবে নিজের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তারপর সে হাত স্পর্শমাত্র না করিয়া ঈষৎ মলিন হাস্যের সহিত কৃষ্ণা শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া সংক্ষিপ্ত নমস্কার-ক্রিয়া সমাধা করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার সেই সযত্নে-বদ্ধ স্নেহের বাঁধ একেবারেই ধ্বসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সাম্‌নে অসিয়া দুই হাতে দ্বার রোধ করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "বেবি! বেবি! পরও তো পরের বাড়ী থেকে এমন করে অভুক্ত চলে যায় না। এই দীর্ঘ পথ এসে, একটা বেলারও বিশ্রাম না নিয়ে, মুখে একটু জল পর্য্যন্ত না দিয়ে তুমি চলে যেতে চাইচো! তুমি কি আমার সেই বেবি? এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে? উঃ! কে তোমায় এমন করে বদ্‌লে দিলে?"

কৃষ্ণার শুষ্ক জ্বালাপূর্ণ নেত্রে ভেদ করিয়া সহসা যেন একটা প্রবল অশ্রু-উৎস সবেগে উথলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। এই লোক—এই স্বার্থ সর্ব্বস্ব দারুণ আত্মাভিমানী আত্মোন্নতির খাতিরে পরের সর্ব্ব-প্রকার ক্ষতি করিতেও যাহার মনে কিছুমাত্রও অনুতাপ জাগে না, সেই স্বার্থপর লোকই যে তাহাকে কত দূর নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছে, সে কথা যে তাহারও অজ্ঞাত নয়—তাহা নিঃস্বার্থ প্রেম নাই হোক্, কিন্তু অতি প্রবল ও প্রগাঢ় যে সে প্রেম তাহাতে আজ যদি সে সন্দেহ দেখায় তো তাহা তাহার কৃতঘ্নতা! সে বেগবান ও তরঙ্গসঙ্কুল প্রেমের বন্যা-ধারায় হয়ত জগতে শত অমঙ্গলের উদ্ভব করিতে পারে; কৃষ্ণা তাহার বেগ সহ্য না করিতে পারিয়া ইহার সান্নিধ্য হইতে আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া যাইতেও হয়ত সমর্থ, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করিবে সে কোন্ মুখে?—তাহার স্মৃতির মন্দির উলটিয়া কত কালের কত সঞ্চয়ই যে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া সে দিক্‌টায় একটা কটাক্ষক্ষেপ করিতেই এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল! কৃষ্ণা যখন সবেমাত্র বালিকাবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া কৈশোর-জীবনে সদ্য পদার্পণ করিতেছে। ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষার আবর্ত্তে এবং ট্যাব্লো, অ্যাক্‌টিং—মিউজিক্ প্রভৃতি লইয়া বিব্রত ছাত্রীদলই যখন তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজ, সেই সময় তাহাদের বাড়ী এই তরুণ পুরুষ তরুণের প্রথম অভ্যুদয় ঘটে।—সে যুগে জন্মদিনের উপহারে ছুটীর আমোদ-প্রমোদেও তাহাকে হাত খুলিয়া বিবিধ বৈচিত্রময় নব নব উপহার-বস্তু যোগাইয়াছে, সকল কাজের সাহায্য করিয়াছে সেই। তারপর তাহার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রথম স্বপ্নে সে উহাকেই তাহার সর্ব্বোত্তম ও নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয় বোধে জীবনখাতার লেনা দেনা ইহার সহিতই তো আরম্ভ করিয়াছিল! আজ তাহার কাছে সংসারের মূর্ত্তি বদল হইয়া গিয়াছে, উপরের সোনার পাত ক্ষয় হইয়া ভিতরকার ঘুণধরা কাঠের চেহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তা যখন হয় নাই; তখনকার—সেই সোনালি আলোর রঙ্গীন নেশায় এই বদান্য বন্ধুটীকে সেও কি বড় কম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে ছাড়িয়াছিল?—আর আজ ইহার এই বিদ্ধ বেদনার করুণ মিনতি এম্‌নি করিয়া পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেও সে কি এক বিন্দু দ্বিধা করিবে না?—মানুষের মন বলিয়া তবে জগতে কি কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই?—আছে শুধু মত, বিশ্বাস ও তাই লইয়া স্বার্থ-সংঘর্ষ! কৃষ্ণার সমস্ত অন্তর যেন তাহারই বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া তাহাকে ফিরাইতে গেল,—পা চাপিয়া ধরিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কানের কাছে বলিয়া উঠিল—অন্ততঃ ওইটুকু!—এতটুকু যদি তৃপ্তি একবারের জন্যও দিতে পার! এঁর কাছে তুমিও তো কম ধার

নি।—কিন্তু সেইটুকু ঋণ শোধের বাসনাকেও তাহার জোর করিয়া আজ জয় করিতে হইল।—না, সে পারে না।—কোন মতেই পারে না। মনের মধ্যে তাহার যে উদ্দেশ্য আজ ক্রমেই দৃঢ় সঙ্কল্পের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাকে চিত্তে রাখিয়া এখানের সস্নেহ আতিথেয়তাকে সে কোন মতেই কলঙ্কিত করিতে পারে না। নিরুপায় ভাবে মুখ তুলিয়া ক্ষুন্নস্বরে কহিল—"আমায় আপনি মাপ কর্বেন। - আমি পার্বো না।"

মিষ্টার লাহা দণ্ডাহতবৎ রোষে ক্ষোভে ব্যথায় আহত-চিত্তে নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নত করিলেন। পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এম্‌নি করেই কি আমরা দুজনে দূরে চলে গেলুম? আর কি আমাদের কাছাকাছি হবার কোন উপায়ই নেই? তুমি তখন আমায় জিজ্ঞেস্ করেছিলে, বিনয়ের মুক্তি পাবার কোন মূল্য আছে কি না?—আমিও তোমায় মিনতি করে জিজ্ঞেস কর্‌ছি বেবি, তোমাকে আমার পাশে ফিরিয়ে পাবার কোন দাম—কোন বিনিময় হ'তে পারে কিনা?"

কৃষ্ণার মন দারুণ লোভে চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার অদম্য উত্তেজনার মধ্যে মনে হইয়া গেল যে, ইহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া সে তাহারই জন্য বিপন্ন নিরপরাধীকে রক্ষা করে। আত্মত্যাগ এর চেয়ে আজ আর কোন কিছুতেই তাহার পক্ষে বেশী করা হইবে না। 'কিন্তু মানুষ যতই কেন যা' বলুক না, নিজেকে সে কাহারও চেয়ে কম ভালবাসে না। অন্যের জন্য প্রাণ দেওয়াটা বরং অনেকটা সোজা, কিন্তু নিজের মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করা বড় সহজ নয়। তারপর অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের দাম্পত্য যে কত বড় অভিশাপের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারই একটা কদর্য্য ছায়া সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার মনটাকে শিহরিত করিল। সে কহিল "তা হয় না।"

মিষ্টার লাহার মুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কম্পিতস্বরে কহিলেন—"বেবি! এ পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র সুখশান্তি! আমার তুমি প্রাণাধিক প্রিয়তমা—আমার চেয়ে অল্পবয়সী ও দেখ্‌তে একটু ভাল বলে আমার প্রাণঢালা ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে বিনয়শীলকে তুমি আজ আমার—একমাত্র আমারই অধিকৃত আসনে এনে বসালে! কিন্তু সেখানে তাকে রাখ্‌তে তুমি পার্‌বে না। তাকে পাবে না।—কখনই পাবে না। বাইরে তাকে পাওয়া তোমার পক্ষে অনুচিত ছিলই, এখন তো অসম্ভবই হবে। তবে অনর্থক নির্ব্বাসিতের দুঃখময় স্মৃতির পিছনে প্রাণোৎসর্গ না করে, যেখানে আমাদের দুজনকারই জীবন সফল ও সার্থক হয়ে উঠ্‌তে সমর্থ, সেইখানেই কেন ফিরে এসো না?—দেখ, মানুষের জন্মটা এতটা দীর্ঘ নয় যে, একটা স্থায়ীত্বের ভরসাশূন্য খেয়ালেরই পিছনে তার খানিকটা অপব্যয় ক'রে ফেলা চলে। জগতে কাজ করতে চাও, দেশের উপকার কর্‌তে চাও, কত আছে কর্‌তে বারণ কা'র? মেয়েদের জন্য স্কুল করো, ক্লাব করো, শিল্প-বিদ্যালয় করো সকলেরই যে ঐ একটা হুজুকেই মাত্‌তে হবে তারও তো কোন বিধান দেশভক্তির শাস্ত্রে নেই! এসো বেবি! আমার কাছে ফিরে এসো তুমি আর আমি পার্‌চি নে। আর দুঃখ আমায় দিও না, কিমু! আমারও জীবন যেন ভার হয়ে আস্‌চে। তোমার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথে অনেক চেষ্টাই ত কর্‌লুম, কিন্তু কি ভয়ানক নিষ্ঠুর যে তুমি—, কিছুতেই তোমার আসন টলাতে পার্‌লুম না!"

কৃষ্ণা সমস্তক্ষণ চুপ করিয়া সব কথাই শুনিল, তারপর তিনি থামিবা-মাত্র আর একটা নমস্কার

(library stamp)

করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। খানিক পরেই একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীর চাকার শব্দে তরুণচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, সে চলিয়া গেল।

—মিঃ লাহা যখন সরকারী কাজে বাহির হইয়া গেলেন, মনে মনে এই কথা দৃঢ় করিয়াই ভাবিয়া গেলেন—বিনয় চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেই কৃষ্ণার মোহ বিকার কাটিয়া যাইবে। একদিন সে তাঁহার হইবেই!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সিয়ালদা ষ্টেশনে মিষ্টার এবং মিসেস্ করের সহিত কৃষ্ণার অতর্কিতে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। পর্য্যটনের উপযুক্ত বেশভূষার উপর গলায় বুকে পাখীর পালকের মালা ঝুলাইয়া উঁচু গোড়ালীর সৌখীন জুতায় খুটখুট্ শব্দ তুলিয়া এলা তখন একখানা রিজার্ভকরা ফাষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠিতে যাইতেছিল; পিছনে পিছনে স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিষ্টার কর, স্ত্রীর সহিত চলনের পাল্লা দিতে গিয়া রীতিমত হাঁফ ধরাইয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহার রংটা বাদ আর সবটুকুই সাহেবী, কিন্তু মনটার ভিতর কোন্ খানটায় একটুখানি যেন দেশের মাটী লাগিয়া রহিয়াছিল। তবে তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সৌখীনত্বের এতটুকু ত্রুটী সৌখীন স্ত্রীটীর মাথা ধরাইয়া ফেলে। নিম্ন-শ্রেণীর মাদ্রাজী খৃষ্টান আয়াগুলার চেহারা প্রায়শঃই তাহাদের তাড়কা রাক্ষসীর মত, প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পত্তি এক একটী ছোট ছেলে বা মেয়েকে কোলে বা হাতে ধরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সেই সমস্ত দলটীর সহিত মিস্-মল্লিকের সাম্‌না সাম্‌নি দেখা হইয়া গেল।—

"বেবি যে! কোথা থেকে? কি বিশ্রী হ'য়ে গেছ! কিছু যেন চেন্‌বারই উপায় নেই! মাগো মা! আর তেম্‌নি কি পোষাকের শ্রী!"

কৃষ্ণার এই আকস্মিক মিত্র লাভে মন বড় একটা আপ্যায়িত হইয়া উঠিল না, বরং নানা রকম অন্বেষণ বিশ্লেষণের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে মনে করিয়াই মনটা তাহার তেতো হইয়া গেল। মনে হইল, এর চেয়ে বরং মিষ্টার লাহার অনুরোধ রাখিয়া সেখানে স্নানাহার সারিতে এই ট্রেনখানাকে ফে'ল করিলেই ভাল ছিল। ভদ্রতার খাতিরে অগত্যাই জিজ্ঞাসা করিলে হইল, "দার্‌জ্জিলীং যাচ্চো বুঝি?"

"হ্যাঁ ভাই! ওঁনার ইচ্ছে ছিল না যে যান। তা' দেখনা আমার শরীরের অবস্থাটা! এবার এই ছোট বেবি হয়ে অবধি আর তো সারতো পারি নে; গ্রীষ্মকালে গিয়ে মোটে দু'টি মাস থেকে ডালির অসুখের খবরে তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে হলো না? সারতে আর তেমন পারলুম কই? এবার তো ইচ্ছা আছে শীতের প্রথমটা অবধি থেকে আস্‌বো, দেখি কি হয়! তুমি এখন আছ কোথায়? ঠিকানা জানি নে যে একদিন যাব কিম্বা একটা লোক পাঠাব। সেদিন 'শীলা'র জন্মদিন গেল, বল্‌তে পার্‌লুম না।"

কৃষ্ণা কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। ঠিকানা জানার ১৪।১··· ······লেন।"

"ডিয়ার মি! এ সব কি তোমার পাগ্‌লামো নয় বেবি? ওই সব জায়গায় তুমি কোন্ ভরসায় রয়েছ শুনি? নোংরা গলি, পচা ড্রেন, হাওয়া চলে না মোটে, গায়ে গায়ে বাড়ী, একেবারে

এপিডেমিকে ভরা! কেন তোমার বাবার বাড়ী তো শুন্‌লুম মিঃ লাহা তোমারই নামে কিনে আবার যেমন ছিল, তেম্‌নি করেই সাজিয়ে দিয়েছেন! সেখানে থাক্‌লেই তো হয়? তোমার যেমন বেয়ারা খেয়াল।"

কৃষ্ণা দেখিল, তাহাদের সকল সংবাদই তাহার পুরাতন সমাজ রাখিয়া থাকে, শুধু রাখে না পরের অনুগ্রহজীবী না হইলেও তাহার কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা চলে সেইটুকুই। সে সেজন্য সে কাহারও নিন্দা করিল না সমাজ তাহাদের পুরা মাত্রায় অন্ততঃ নব্য শিক্ষায়ও শিক্ষিতা হইবার অবকাশ ও অধিকার দিয়াছে, তারপর সে যদি তাহাকে পোষণ করিবার ভার না লয়, তাহাতে দোষ দেওয়া চলে না।

এলার কথার জবাবে তাই শুধুই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "সারা দেশই যখন ওই নোংরা গলি, পচা ড্রেন ও এপিডেমিকের মধ্যে পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর কোন প্রতিবিধান চেষ্টা রাজা-প্রজার সমান তাচ্ছিল্যে পড়ে যখন অসম্ভব হয়েই রৈলো, তখন একা একা আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য উঠি-পড়ি লেগে থেকে হবে কি? ও হাল ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

এলা মুখ ভার করিয়া বলিল—"তুমি আবার অতি মাত্রায় সোসিয়ালিষ্ট হয়ে পড়েছ! বোলসেভিক গভর্ণমেণ্ট না হ'লে আর অত কেউ করে না তা বলে!—যা হোক্ তোমাদের বিয়েটা হচ্চে কবে? হ্যাঁ, ভাল কথা, সেদিন আর এক অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হলো।—নাম অজয় শীল, অনেক বচ্ছর বিলাতে ছিল। সেখানেই এক মেম বিয়ে করে। ছেলেপিলেও কি দু' চারটে হয়। তারপর ও-ক্ষেত্রে অনেক সময় যা ঘটে থাকে; অর্থাৎ 'জুডিসিয়াল সেপারেসন্!' তবে এঁর কিছু গ্রহের জোর আছে বোধ করি; মেমঠাকরুণ মারা গেছেন। ছেলে-মেয়েদের কোথায় বোর্ডিং না কন্‌ভেণ্টে রেখে দিয়ে অজয় বহুকাল পরে এই ক'দিন হলো দেশে ফিরে এসেছে। এঁদের সঙ্গে নাকি এক সঙ্গে বিলাত যায়, এক সঙ্গেই পড়্‌তো। সেদিন পথে দেখে ইনি চিন্‌তে পারেন নি, সে কিন্তু পেরেছিল। ইনি কেমন করে পারবেন্? এখানে এসে নাকি মাথায় বড় বড় চুল রেখে গেরুয়া পরে রামকৃষ্ণ মিশনে না কোথায় সাধু হয়ে বেড়াচ্চে। ইনি বল্‌ছিলেন, বিলাতে নাকি বেশ ভাল প্র্যাক্‌টিস্ ছিল, বড্ড মাতাল ছিল বলে যদিও তেমন সুবিধা কর্‌তে পারে নি, তবু এখানের একজন বড় ব্যারিষ্টারের চাইতেও কম পেতো না! সে সব ছেড়ে এখন এই টো টো কোম্পানিতে নাম লেখালেন! এখন ওই ফ্যাসান্ উঠেছে যে—"

অজয় শীল! অজয় শীল!—কে' সে? নামটা কৃষ্ণার কানে পরিচিত ঠেকিল।

তারপর তাহার মনে পড়িয়া গেল, এর পূর্ব্বার্দ্ধ কাহিনী তাহার অশ্রুত নয়!—এই অজয়শীল, বিনয়কুমার শীলের বড় ভাই। ব্যগ্র হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"তিনি কোথায় থাকেন?"

হাস্য করিয়া মিসেস্ কর কহিয়া উঠিল "তবেই হয়েছে! পাগ্‌লার সাঁকো নেড়ে দিলাম নাকি?—কি জানি ভাই! তখন তো বেলুড়-মঠে যাচ্ছিল বল্লে। নির্দ্দিষ্ট স্থান বোধ করি কিছুই নেই। আর এসেছেই তো মোটে এই ক'দিন। বট্, টেক্ কেয়ার মাই ফ্রেণ্ড্! মিষ্টার লাহাকে বঞ্চিত করে শেষে যেন তোমার এই খদ্দরকে গেরুয়ায় রঙ্গিয়ে বসো না, দেখ!"

দার্জ্জিলিং মেল ছাড়িবার বাঁশী তারস্বরে বাজাইয়া দিল। যাত্রীদল সচকিতে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইল। কৃষ্ণা বাহিরের দিকে চলিল।

হরিণবাড়ীর জেলখানার যে গর্ত্তে বিনয় বাস করিতেছিল, বেলা এক প্রহর থাকিতেই তাহার মধ্যে অন্ধকারের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও আঁধারের প্রজা মশককুল তাহাদের বিজয়োৎসবের বাদ্য বাজাইতেছে। বিনয় নিজের একমাত্র কম্বলখানি মাটিতে বিছাইয়া চিৎপাত হইয়া শুইয়া শুইয়া এক পায়ের হাঁটুর উপর আর একটা পা লম্বা করিয়া তুলিয়া দিয়া নিমীলিত-নেত্রে গান গাহিতেছিল। হাত দুখানা পরস্পরে বদ্ধ এবং তাহা কপালের উপর রক্ষিত। গান সে গাহিতেছিল, কিন্তু সে দিনের মতন আজিকার গানে তাহার প্রাণের রসধারা সঞ্চিত হইয়া সিঞ্চিত হইতেছিল না। গান, সে আজ যেন শুধু কথার সমষ্টি, যেন সুরের ইন্দ্রজাল, বুকের সে অমৃত উৎস নয়। এটা ওটা সেটা লইয়া টানাটানি করিয়া শেষে তিক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়া সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "না বাপু! গানকে আজ আর বাগাতেই পারা গেল না। থাক্ গে যাক্—" বলিয়া আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়াই রহিল। কিন্তু সেই অতি চপল, সৃজন-তৎপর তরুণ বক্ষের অন্তর্গত চাঞ্চল্যে-ভরা মনের মধ্যটা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সাধকের মত, অথবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ন্যায় আনন্দঘণের অথবা সর্ব্বশূন্যের ধ্যান তন্ময় হইয়া থাকিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে তখন নিজের মধ্যেই আপোষে একটা আলাপ তর্ক সুরু করিয়া দিল। তবে কথা কহিতে গেলেই এখন আর কিসের কথা সে কহিবে? মনের ভিতর যে উত্তাপটা জমিয়া রহিয়াছে, বাতাস বহিলে তাহারই তাপটাকে সে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ছাড়ে না। বিনয়ের মনও কথা কহিতে গিয়া উর্ম্মিলার কথাই কহিতে বসিল। এতদিন বরং নানা ঘটনার সঙ্ঘাতে উর্ম্মিলাকে সে অনেকখানি দূরে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার তাহাকে তাহার বড় কাছাকাছি, বুকের মাঝখান চিরিয়া যেন তাহারই অন্তর্ভাগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর এখন সে উর্ম্মিলা নয়, এ সেই উর্ম্মিলারই শবদেহের অগ্নিময়ী স্মৃতি। তার সে আনন্দ-প্রতিমা, শৈশব-সঙ্গিনী উর্ম্মিলা আজ কোথায়?

বিনয়ের বুক আজ এ কথা ভাবিতে ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। উর্ম্মিলা নাই!—উর্ম্মিলা মরিয়াছে!—বিনয়ের স্মৃতির কাছে চিরদিনের জন্যই যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, এ কথার মধ্যে বিনয়ের সমস্তই যেন মস্তবড় একটা শ্মশানে পরিণত হইয়া দেখা দিল। উর্ম্মিলা যে তাহার এতখানিই ছিল, তাহাকে এমন করিয়া হারাইয়া না ফেলিলে বুঝি এ খবরটা সে কোন দিনই জানিতে পারিত না! বুঝি এই জন্যই ভগবানের ভক্ত হওয়ার চাইতে তাঁর শত্রুতার মূল্য বেশী? সত্যই আজ বিনয় দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, যে উর্ম্মিলার প্রতি তাহার অন্তরে সঞ্চিত ভালবাসার অন্ত ছিল না। সে তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিল; তবে যে ইদানীং আর একরকম সন্দেহ হইতেছিল, সেটা কি শুধুই মনের কল্পনা? ক্ষণকাল আকাশ পাতাল ছাইপাঁশ ভাবিয়া আবার নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল, না তা' নয়, কৃষ্ণাকেও আমি ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা তার রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি ত্যাগ ও চারিত্র-মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা। কিন্তু এ যে আমার চিরদিনের গলার হার, আমার ভালয় মন্দয় মেশান, আমার বুকের শোণিত-বিন্দুর সঙ্গে মিশ্রিত আমার উর্ম্মিলা! তা'কে হারিয়ে যদি আমায় চির-জীবন আন্দামানেই বাস করে বেঁচে থাক্‌তে হয়, তা' হ'লে কি নিয়ে আমি বেঁচে থাক্‌বো? তার চেয়ে ফাঁসি যদি হয়, ত সেই ভাল।

প্রথম-প্রেমের মত বেগবান্ ও বিশুদ্ধ যে আর কিছুই নয়, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিল।

ঝনাৎ করিয়া শিকল খুলিয়া রক্ষীর পিছনে কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল।—

"এসো, এসো, বসো।—অত শুখ্‌নো দেখাচ্চে কেন? ভাল আছ?"

"হ্যাঁ," বলিয়া কৃষ্ণা বিনয়ের আমন্ত্রণানুসারে তাহার কম্বলখানার এক প্রান্তে উপবেশন করিল।—

"আপনিও একটু শুখিয়েছেন! তা অপরাধই বা কি?"

বিনয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, "কৃষ্ণা!"

"বলুন?"

"আমার স্ত্রী নাকি আমায় ধরিয়ে দিয়েছে? একি সত্যি?"

বিশুদ্ধ নীলকান্ত মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল দুইটী নেত্র সুধীরে বিনয়ের মুখে স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণা কহিল, "বিশ্বাস হয়?"

বিনয় মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল,—"কি, কৃষ্ণা?"

"আমার কথা?"

"হয় বই কি।"

"আপনার স্ত্রী নির্দ্দোষী! মন্দ লোকে ঘোর চক্রান্ত করে তা'কে ভুল বুঝিয়ে তার কাছ থেকে আপনার চিঠি চুরি করে এনে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেচে। সে এর কিছুই জানে না।"

বিনয়ের বুক যেন সুগভীর আনন্দের আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। সে গভীর একটা নিশ্বাস লইয়া বলিল, "কই তোমার হাত?"

নিজের সবল হস্তের মধ্যে কৃষ্ণার ছোট্ট হাতখানি লইয়া সে তখনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় মিথ্যে সান্ত্বনা করুচো না?"

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—"না।"

"তবে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করলুম। কিন্তু কেমন করে তুমি জান্‌লে?"

কৃষ্ণা কহিল, "আমি জানি।"

আবার একবার উল্লাসের একটা চলন্ত স্রোত বিনয়ের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া বহিয়া গেল। সে পরমসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া কৃষ্ণার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তুমি কি ওদের কাছে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ!"

"গিয়েছিলে? মা'র সঙ্গে দেখা হ'লো?"

"তিনি তখন পূজার ঘরে ছিলেন। দেখা হয় নি।"

"আর উর্ম্মিলা?"

"তাকে দেখেছি। তিনি আপনাদের দীঘির ধারে একা বসেছিলেন, রাত তখন সাড়ে আটটা।"

"অত রাত্রে একলা সেখানে? তার যে নানা রকমের ভয় ছিল, সে কোথা গেল?"

কৃষ্ণার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ একটী হাসির রেখা দেখা দিল, "মরণকে যার ভয় ভেঙ্গে গ্যাছে, তার কি আর কোন কিছুকেই ভয় কর্‌বার বাকি আছে, বিনয়বাবু?"

বিনয় এ কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণা বলিল, "আপনার স্ত্রী সেদিন ডুবে মর্‌বার সঙ্কল্প নিয়েই তেমন সময় সেখানে পৌছে ছিলেন।"

বিনয় শিহরিয়া চোক্ বুজিল। "কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! তুমিই ওকে—আমার উর্মিকে বাঁচিয়ে এলে!"

প্রহরী তাগিদ জানাইল। কৃষ্ণা-দত্ত দশটা টাকায় সে মিনিট্ কয়েক সময় বেশীও খরচ করে এবং দরজার একটু পাশ করিয়া বসিয়াও থাকে, আর কি করিবে? কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বিনয়বাবু!"

"কি?"

"আপনার স্ত্রী তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে যে অখ্যাতির মধ্যে এসে পড়েছেন, যখন আরও স্পষ্ট করে জান্‌তে পার্‌বেন যে, কতবড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েই তাঁকে এই কলঙ্ক ও ক্ষতি সহ্য কর্‌তে হ'য়েছে, তখন আন্তরিকভাবেই তাঁকে ক্ষমা করে শুধু স্ত্রী বলে নয়; সহধর্ম্মিণী বলেও এবার নূতন করে গ্রহণ কর্‌বেন? বলুন? আপনার কাছে এই আমার প্রথম আর শেষ-ভিক্ষা!"

"ও-কথা কেন কৃষ্ণা? তুমি যা' বল্‌লে, তা' আমি স্বীকার করে নিলুম। যদি মরি তা'কে ক্ষমা করেই মর্‌বো, আর যে ভাবেই বাঁচি, এখন ক্ষমা তা'কে মন থেকেই কর্‌তে পার্‌বো। তুমি যে তা'কে নির্দ্দোষী বলেছ কৃষ্ণা! তোমার কোন কথাই ত আমি অবহেলা বা অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো না! সে আমার স্ত্রী, কিন্তু তুমি আমার কি জানো?" মৃদু-কণ্ঠে হাসিমুখে বলিল,—"ধ্রুবতারা।"

কৃষ্ণা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় গান গাহিতে লাগিল,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবোনাক পথহারা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সাক্ষীদের এজাহার হইতেছিল। উভয়-পক্ষীয় উকিলে জেরায় জেরায় অনেক পাকা মাথা, কাঁচাইয়া দিতেছিলেন।

আজ প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহেও তৃতীয় দিন আসিয়া পৌছিল। দলে দলে সরকার-পক্ষীয় সাক্ষীগণ নানা দিগ্‌দেশ হইতে লালবাজার পুলিস-কোর্টে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। নব নব অধ্যায় রচনা করিয়া দিয়া চব্য-চষ্য আহারান্তে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক একখানা সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হইতে থাকিয়া 'নথির' আকার পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

"পরেশনাথ পাহাড়ের মাড়োয়ারীদের মধ্যে দু'জন বিনয়কে 'রাজদ্রোহ' প্রচার করিতে শুনিয়াছিল, তা' লইয়া তর্ক করিয়াছিল। বিনয় নাকি তাদের বলে, বিলাতী বস্ত্র আমদানী না করিয়া জাপান ও জর্ম্মানী হইতে বন্দুক, পিস্তল আনাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করা হয়। নিরুপদ্রব অসহযোগীতায় কিছু হইবে না ; অস্ত্র চাই।"

ইহাঁরা নাকি বলে, "দু'চারটে বন্দুকে কি সাম্রাজ্য লাভ হইবে ?" তাহাতে বিনয় তাহাদের কটুবাক্য প্রয়োগ করে এবং বলে, "সকলেই যদি দু'চারিটার জোগাড় করে, তবে তো আর দু'চারিটা থাকে না, তা ভিন্ন বিনয়ের দল ইতিমধ্যেই কয়েক শত সংগ্রহ করিয়াছে। ইত্যাদি।"

বাঁকিপুরে, আরায়, বক্সারে, বেনারসে অমন একশত লোকের কাছেই বিনয় শীলের রাজদ্রোহ প্রচার, পিস্তল পকেটে লইয়া সন্ধ্যায়, রাত্রে নির্জ্জন রাজপথে অপর কয়েকজন সন্দেহে-ধৃত যুবকের গৃহে গমন, তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন পড়ো-বাড়ীর চৌকাঠে বসিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য লুটিয়া লওয়ার গূঢ় পরামর্শ আঁটা এ সবেরই ঝুড়ি ঝুড়ি সাক্ষী হাজির হইয়া পাতার পর পাতা ভর্ত্তি করিয়া সাক্ষ্য দিয়া গেল। দারোগার দপ্তর আর একবার নূতন সংস্করণে বাহির হইল। বিনয়ের পক্ষের দু'জন ব্যারিষ্টার, তার মধ্যে একজন বিনিয়ের সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত; তাঁর জেরায় কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষীই কাঁচিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া সাক্ষীর বহর কিছু কমিয়া আসিল। অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার এদিকে ধমকের পর ধমক দিয়াও এই তীক্ষ্ণ-ধী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যারিষ্টারটীকে দমাইয়া দিতে সমর্থ না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার যোগাড় করিলেন।

তথাপি বিনয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ রহিয়াছিল, তাহাতে তাহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বুঝিতে পারা গেল। অপর কয়টী ছেলের মধ্যে বাঁকি-পুরের নীললোহিত সেন, আরার স্বর্ণকান্তি মহলানবীসকে কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। তবে একা একা নাকি ষড়যন্ত্র করা যায় না, কাজেই শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ চন্দ, রুদ্রপ্রসাদ ধর প্রভৃতি কয়েকজনকে কোনমতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইল। মোকদ্দমা দিনে দিনে মন্দর দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবশেষে শেষে শুনানির দিনে উর্ম্মিলাকে লিখিত ও উর্ম্মিলার লেখা পত্রদ্বয় লইয়া সরকার-পক্ষের ব্যারিষ্টার ইহাতে নানারূপ টীকা-টিপ্পনি প্রভৃতি লাগাইয়া ইহার অশ্লেষণ-বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দীর্ঘতর ছন্দে প্রকাণ্ড এক বক্তৃতা করিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, যে বিনয়কুমার শীল, চিরকালের দুর্দ্দান্ত ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী লোক, তাহার এনার্কীজম্ সর্ব্বজন-বিদিত।—এমন কি, উহার নিজের স্ত্রীই,—আবার সে স্ত্রী সেই সুদূর অতীতকালে বিবাহিতা দীর্ঘ দিনের সহচরী—সেই স্ত্রী নিজেই তাহাকে 'এনার্জীকম্' হইতে বিরত হইবার জন্য অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক পত্র দিয়াছে। ইত্যাদি—ইত্যাদি। বিনয়কুমার যে বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই করিতেছিল এবং উহার দ্বারা সত্বরই একটা ভয়াবহ কোন কিছু যাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-পর্য্যন্ত টলমল করিয়া উঠে, এমন কিছু ঘটিয়া উঠিতে পারিত, এই কথাটা বিচক্ষণ সুচতুর এবং বাগ্মী ব্যারিষ্টার মহাশয় প্রায় পূরাপূরি প্রমাণ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষ হইতে একজন নূতন সাক্ষীর জোবানবন্দী জন্য কোর্টে প্রার্থনা করিলেন।

সরকার-পক্ষের কৌন্সুলী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া জানাইলেন যে, তাহা আর

সম্ভব নহে। এই মোকদ্দমায় ইতোমধ্যেই সরকার-পক্ষের ও তাঁহার অমূল্য সময় যথেষ্টই অপব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর অনর্থক নষ্ট করা যায় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াই গিয়াছে।

বিপক্ষ-ব্যারিষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোর্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুজুর! আমার সাক্ষী পুলিস-প্রেরিত, বাজে সাক্ষী নয় যে তাঁহার সাক্ষ্য অসার-বাক্যবহুল ও ক্লান্তিকর এবং অপর পক্ষের জেরায় ভূয়া হইয়া যাইবে। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত মহদ্বংশোদ্ভব ও বঙ্গ-সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোক। আমার এই সাক্ষীর জোবানবন্দীর জন্ত কোর্টকে মাত্র একটি ঘণ্টার অধিক সময় খরচ করিতে হইবে না। অথচ তাঁহার এজাহারে এই কেসের অবস্থা একেবারেই উল্টাইয়া যাইবে। ধর্ম্মাবতার! আমি অনেক বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমার চিত্ত আজও "ব্রিটিশ ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে পারে নাই। আমি কয়েক বর্ষ সেখানে ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে অনেকানেক উচ্চমনা উদার-চরিত্র ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জজের সম্মুখীন হইয়াছি। আমার ধারণা তাই আজও অকুলুষিত রহিয়াছে এবং আশা আছে যে, দেশভেদেও আমার এই উচ্চ ধারণার কোন দিনই ব্যতিক্রম ঘটিতে পাইবে না। আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের নিরপেক্ষ ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হৌক।"

বিচারক নূতন সাক্ষী আনিতে অনুমতি দান করিলেন।

বিনয় একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এই ক্লান্তি-জনক দীর্ঘ মিথ্যাসাক্ষ্য শুনিতে শুনিতে পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সে যেন ফুলিতে থাকিত। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক-গুলা দিব্য নির্লজ্জভাবে আসিতেছে, যা' খুসী তাই বলিতেছে, তাহার অচেনা মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে, কটাক্ষপাত না করিয়াও চিনিয়া ফেলিতেছে, কত কিই অভিনবত্ব ঘটিতেছে, দেখিয়া শুনিয়া তাহার হাড় অবধি জ্বালা করিতে থাকে। মনে মনে আপশোষ হয়, যে রিভলবারগুলা না রখিয়াও তার আজ এই দুরবস্থা, তাহারই একটা যদি সত্যই এখন তার হাতে আসিয়া পড়া সম্ভব হইত! তারপর যখন বেশ স্পষ্ট করিয়াই দেখা গেল যে, তাহাকে ষড়যন্ত্রকারী, নর-হত্যার চেষ্টা-কর্ত্তা, প্রভৃতি খুব বড় বড় অপরাধে মণ্ডিত করিয়া একটা জাঁকালো রকম শাস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় পাকা হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ সম্বন্ধে তাহারও মনের সকল চাঞ্চল্য রোধ হইয়া মনটা বেশ প্রশান্ত হইয়া গেল। মনে মনে সে তখন নিজেই নিজের বিচার ওই বিচার-মঞ্চের ম্যাজিষ্ট্রেটের চোক্ দিয়া করিয়া লইয়া একটা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বাঁচিল। সে মনকে বলিল, ফাঁসি আমার হইবে না, হ'লেই চুকিয়া যাইত, তা আর অদৃষ্টে নাই। যাবজ্জীবনেরই চেষ্টা চলিতেছে। তাতেই বা এত ক্ষতি কি? জীবন যে আমার আরও সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে, তাই বা কে আমায় বলিল? হয়ত পাঁচ সাত বৎসরে শেষ হইয়াও যাইতে পারে! আর যদি বিশ বৎসরের পরেও উঁহাদের হাতে টেঁকিয়া থাকি, না জানি তখন দেশে ফিরিয়া কতই সুখ লাভ হইবে! আবার নূতন করিয়া জননী-ধরিত্রীর অঙ্কে তখন যেন আর একটা জন্ম লাভই করিব! যখন তার প্রাণটাকে লইয়া পাশার দান চালাচালি চলিতেছে, তেমন সময় হয়ত সে তাহার ভবিষ্যৎ আন্দামানী-জীবনের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ফেলিল!—সেখানে তাহাকে কি কি খাটুনিতে জুড়িয়া দিবে?—নারিকেল ছোব্ড়া ছাড়ান, ঘানি টানা, পাথর ভাঙ্গা...সবই

বোধ করি পালাক্রমে করিতে হইবে? 'প্যাসিভ্ রিজিস্‌টান্সটা' সেখানে থাকিতে বোধ করি অভ্যাস হয় ভাল করিয়া, না? চাবুক খাইলে ফিরিয়া মারার পথ ত নাই! কোন সময় জেল-খানার সেঁৎসেঁতে মেজেয় শীত ও মশকের দৌরাত্ম্যে যে নিদ্রা উপভোগ করিবার উপায় কম; এখানের কাঠগড়ার ভিতর হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া তাহারই বরং কতকটা শোধ মিটাইয়া লয়। মধ্যে মধ্যে ঘুমন্ত তাহার নাক ডাকিয়া উঠে। কেহ বিস্মিত, কেহ বিরক্ত হয়। এইরূপেই বন্দীদশার দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর দিনগুলা সেই চঞ্চল ও উদ্যমে পূর্ণ তরুণ-বয়সী ছেলেটী কোন মতে যাপন করিতেছিল। এক একদিন তাহার সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত, কদাচিৎ অর্দ্ধ-পরিচিত অপর তিনটি ছেলের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে বসে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাড়ার চোটে সেটা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পায় না। নিজের সম্বন্ধে তাহার আর কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না, বরং একটু একটু কৌতুক বোধ হইতেছিল। এই যে বিনয়কুমার শীল, ডাক্তারীর এম্ বি পরীক্ষাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলিকাতার অলি-গলিতে বিনা ভিজিটে ডাক্তারী করিয়া খদ্দর বেচিয়া বড় জোর এই সম্বন্ধেই এক আধটা উপদেশ দিয়া বেড়ায়, এই পর্য্যন্তই ত তাহার দৌড়। একদিন যদি এ দেশ স্বরাজ লাভ করে, যদি স্বরাজ-লাভের ইতিহাস লিখিত হয়, তার মধ্যে এই অসীম সাহসী, অকুতোভয়, অনন্ত-সাধারণ অধ্যবসায়শীল, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য উচ্ছেদ-চেষ্টাকারী বিনয়শীলের অমর নাম কি অক্ষয় অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত হইবে না? তাহার ভারি হাসি পাইল। কিন্তু কাঠগড়ায় বসিয়া তত হাসি হাসিতে গেলে না কি এখনই কান্নার ব্যবস্থা ঘটিয়া যাইবে, তাই সেটাকে হজম করিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গা হইয়া বুঝিল, আদালত-গৃহে কিসের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

বিনয়ের পক্ষের এই নূতন সাক্ষী প্রবেশ করিতেই শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষেরই উপর দিয়া বাস্তবিকই একটা যেন ঘোরতর পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিয়া গেল। এমন কি, উভয় পক্ষীয়ের বহির্গত বিচারক শুদ্ধ যেন মন্ত্র সম্মোহিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে সম্মান জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আসামীর ব্যারিষ্টার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। সাক্ষীকে চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ না করিয়াই সরাসর সাক্ষীর কাঠ্‌রায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বিনয়ের বিস্মিত, সন্দিগ্ধ কম্পিত দৃষ্টি সাম্‌নাসাম্‌নি তাহার মুখের উপর ব্যগ্র-ক্ষুধায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই স্তম্ভিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল। তাহার প্রবল হৃদ্‌কম্পের মধ্য দিয়া রুদ্ধপ্রায় অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠ প্রায় অশ্রাব্য আর্ত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "কৃষ্ণা!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের সমস্ত শরীর মনের ভিতর দিয়া যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল; তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল তাহারই তড়িৎ-স্পর্শে যেন আচ্ছন্নবৎ হইয়া গেল। এই অসময়োপযোগী ভাবে অকস্মাৎ ও একান্তই অপ্রত্যাশিতরূপে উহার দেখা পাইয়া, বিশেষতঃ ওই স্থানে উহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি যেন একটা অঘটন, কি যেন একটা অমঙ্গল যেন কোন্ মুহূর্ত্তেই ঘটিয়া যাইবে, যেন ইতঃমধ্যে ঘটিতেই আরম্ভ

করিয়াছে, এম্‌নি দুঃসহ-ভয়ে সে কৃষ্ণাকে সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে নিজের ব্যাকুল অনুনয়ে-ভরা দুটি চোখের তারা তুলিয়া ধরিতেই সে চেষ্টা-অসাধ্য বুঝিয়াই আপনা হইতে তাহার উন্নত দৃষ্টি নমিত হইয়া আসিল। কৃষ্ণাই সে বটে, তবু সে যেন সেই তাহার পরিচিতা কৃষ্ণা মল্লিক নয়। তাহার মুখে এমন অনৈসর্গিক কিছু আছে, যার কাছে এ পৃথিবীর ভাষা বা ভাব লইয়া কোনমতেই পৌছাইতে ভরসা করা যায় না। সে যেন একটা ছায়ামূর্ত্তি, সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকের মানুষ; তাহাকে সবাই দেখিতেছে, সে কিন্তু যেন কোন কিছুতেই দেখিতেছে না।

যথারীতি শপথ লইয়া এই নূতন সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। কৃষ্ণা বলিল, "বিগত ডিসেম্বর মাসে কোন রাজপরিজনের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় যে উৎসব হয়, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে? সে দিন... রোডের একটা বড় বাড়ীতে আমরা তাঁর শোভা-যাত্রা দেখ্‌বার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়াছিলাম।—"এই বলিয়া সে বিনয়কুমারের সেদিনকার বক্তৃতা মুখে মুখেই সবটা বলিয়া গেল, এবং ইহা পরদিনের যে যে সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহা তাহাদের ব্যারিষ্টার দাখিল করিয়া দিলেন।—সে বলিতে লাগিল, "আমার সঙ্গে যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার তরুণচন্দ্র লাহার বিবাহের সম্ভাবনা সকলেই জানিতেন; কিন্তু মিঃ লাহার এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহে বিলম্বে ঘটিতে থাকায় ইহা কিছু বিদ্রূপাত্মক হইয়া উঠে। বিনয়বাবু কারু কাছে, আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন এবং সদ্য সদ্য মোটর-চাপা দিয়ে পালিয়ে আসার ব্যাপারটায় চটে উঠে আমার ও মিঃ লাহার নাম একত্র মিলিত করে ওই প্রকার শ্লেষোক্তি করেছিলেন। আর বাস্তবিকই সে সময় মিঃ লাহা আমায় একগাছা বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন এবং দরবারে যাবার জন্য তাঁর কাছে আমার বাবা কয়েক হাজার টাকা ধারও নেন। আমাদের দুজনকার মনই সেই মুহূর্ত্তে এই কুৎসাকারী নিন্দুকের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল হয়ে উঠ্‌লো।"

এই বলিয়া কৃষ্ণা ইহার পরের ঘটনা যথাযথই বিবৃত করিতে লাগিল। তারপর বলিল, "ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঁকে 'কুকুর দিয়ে খাওয়াতে' ও চেয়েছিলেম। পরিশেষে আমাদের দু'জনের মধ্যে স্থির হয় যে, এখন উঁহাকে গ্রেপ্তার করাইলে সংবাদপত্রে আমার নামে অধিকতর কুৎসা রটিবে, দণ্ডও উহাঁর বেশী হইবে না,—তার চেয়ে সময়ের প্রতীক্ষা করাই ভাল। মিঃ লাহা আমায় বলেন, "জাল পাতা থাকিলে একদিন না একদিন তা'তে এসে পড়্‌তেই হবে।"

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করিলেন, "এই বিনয়কুমারের সঙ্গে আপনার কি বিশেষরূপ সৌহার্দ্দ ও ঘনিষ্টতা জন্মে নাই? ইহারই প্ররোচনায় আপনি খদ্দর ব্যবহার ও আপনার পূর্ব্ব-সমাজের সমস্ত পরিচিত বন্ধুদের কি পরিত্যাগ করেন নাই?

উত্তর হইল, "করিয়াছি এবং ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দও জন্মিয়াছিল। এই পত্রখানি পড়িলেই আপনারা এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার রূপে সকল কথাই বুঝিতে পারিবেন যে, কি জন্যে এই আসামীর স্ত্রীর মনে তাহার স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার স্বামীর লিখিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থযুক্ত পত্রের পূরা রাজ-নৈতিক অপরাধযুক্ত অর্থ প্রয়োগ করিয়া উত্তর তাহার ভগ্নীপতি তরুণচন্দ্র লাহা দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া লিখিত হইয়াছিল। আসামীর স্ত্রীর ও মাতার সাক্ষ্য লওয়া হইলে এ বিষয়টী সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইতে পারিবে। আপাততঃ আমার

প্রদত্ত মিষ্টার তরুণচন্দ্র লাহার এই স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠ করিয়াই এই ব্যক্তির নির্দ্দোষীতা সম্বন্ধে যে আপনারা নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই।”

আদালত-গৃহের বিপুল জনতা একেবারে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া এই রূপসী তরুণীর অদ্ভুত জোবানবন্দী শুনিতেছিল। ঘর এম্‌নি নিস্তব্ধ যে, একটি সূচিকাপাত হইলেও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই মুখে ব্যগ্র-কৌতূহল, এবং অধিকাংশের মনেই মিথ্যা অভিযোগে প্রাণ সঙ্কট বিপন্ন বিনয়কুমারের প্রতি গভীর সহানুভূতি। কিন্তু যে ঐ অবিচলিত সাহসে, অকুতোভয়ে নিজের গূঢ় রহস্যের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সহস্র নেত্রের মাঝখানে অকম্পিত জিহ্বায় প্রচার করিতে দৃঢ়পদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এত লোকের মধ্যে একজনমাত্র কেহই তাহার সেই উচ্ছৃঙ্খল অপরাধের অভিযোগে তাহাকে ধিক্কার পর্য্যন্ত দিতে পারিল না, বরং অনেকের মনেই বেদনা পুঞ্জীভূত হইল।

আসামী-পক্ষীয় ব্যারিষ্টার কৃষ্ণার প্রদত্ত মিঃ লাহার লিখিত পত্র পাঠ করিলেন। সমস্ত পত্রখানাই অদ্যোপান্ত পঠিত হইয়া অবশেষে ইহার শেষাংশে বর্ত্তমান মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে আসিলেন।

“—এখন একটিমাত্র কর্ত্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসৎ-লোক তোমার ও আমার নামে অযথা অকথ্য গ্লানি সহস্র লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া তোমায় ও আমায় অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার জন্য আমার পবিত্র-স্বভাবা, চির-সুখ-লালিতা আনন্দময়ী কিরণ আজ জনসাধারণের হাস্য-কৌতুকের পাত্রী, সেই অহেতুক-বৈর-সাধনকারীর সমুচিত শাস্তি বিধান বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি! তুমি সেদিন নিতান্ত মর্ম্মাহতচিত্তে ঐ পাষণ্ডকে ‘কুকুর দিয়া খাওয়াইবার’ ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই! তারপর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে তার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব এখনও যে আমার শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে একটা দিন তোমার কাছে কাটাইয়া আসি। তবে ইহা নিশ্চিত যে বিনয় শীলের সঙ্কটকাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে, এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, যদি কেহ তাহাকে ইহার জন্যই প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাহাকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তারপর —বিনয় শীলের নির্ব্বাসনের দিনই আমাদের বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যাইবে। কেমন, তাহা হইলে তোমার প্রতিশোধ স্পৃহাটা সম্পূর্ণরূপেই মিটেনা কি?”

শ্রোতাদল নীরব নিস্পন্দ। সকলেই যেন রঙ্গমঞ্চে কোন ভীষণ বিয়োগান্ত অভিনয় দর্শন করিতেছে, এম্‌নি তন্ময়। আর আসামী? সে তখন একেবারেই বজ্র-স্তম্ভিত। শরীরে তাহার সংজ্ঞা ছিল কিনা সন্দেহ। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুপেশীগুলা শিথিল হইয়া পড়িয়া এ পৃথিবীর আলো, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অন্তর্বাহ্য যত কিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিয়া দিয়াছিল। সে যে কি শুনিল, কি বুঝিল, কিছু বুঝিল কি না, ঠিকমত অনুভব করিতেও পারিল না। শুধু একটীমাত্র বজ্রশর কর্ণের একাঘ্নী-অস্ত্রের মতই তাহার বিশ্বস্ত সরল চিত্তে বজ্রবলেই বিদ্ধ হইয়াছিল যে, ঊর্ম্মিলা নয়—এই কৃষ্ণাই তাহার ধ্বংসের জন্য হীন চক্রান্তের সৃজনকারিণী! তাহার প্রেমাস্পদ ও বন্ধু মিঃ লাহার সে

সহকারিণীমাত্র! তবে এতদিনকার সে সমস্ত ত্যাগের খেলা, মহত্ত্বের মহিমান্বিত অভিনয়, মহোচ্চ আদর্শের সুগভীর অনুরাগ সে সকলই তাহার এই গূঢ় ও হেয় কার্য্যসাধনেরই ভাণ মাত্র? তবে এই বিনয়ের প্রতিও সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সহকারীত্ব এবং সেই একটা আরও কিছু,—যাহাকে এ জগতের অনেক উর্দ্ধে দিব্যলোকেই সে আসন পাতিয়া বসাইয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অতিশয় শুচী-শুদ্ধ চিত্তেই সন্তর্পণে প্রদান করিয়া থাকে, সেও একটা মিথ্যা অভিনয়?

বিনয়ের মাথার মধ্যে দারুণ অবসন্নতা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। এই মানুষ? এত হীনতা এবং এত দীনতা এই মানুষেরই মধ্যে ছদ্মবেশ ধরিয়া লুকানো থাকিতে পারে? এত বিশ্বাসের এই পরিণাম! সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই যেন তাহার চোখে একটীক্ষণে বদলাইয়া গেল। রাজা এবং রাজ-পুরুষেরা তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রীতির মোহে কূট-নীতির আশ্রয়ে অনেক কিছুই করিয়া থাকেন; প্রজাও তার ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির খাতিরে এই রাজনীতিকেই অনুসরণ করিতে শিখিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণা যখন সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল;—বিশৃঙ্খল জনতা নিজেদের মধ্যে সরিয়া সরিয়া তাহাকে পথ করিয়া দিল। উপহাস, ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ অথবা শ্রদ্ধা মনের মধ্যে যার যাহাই থাক্, প্রকাশ্যভাবে কোন একজনও তাহা প্রচার করিতে সমর্থ হইল না। আর সব কিছুকেই আড়াল করিয়া তাহার সাহসে মণ্ডিত ত্যাগ—সে যে কত বড় ত্যাগ—সেইটাই সেই সমবেত ইতর ভদ্র শিক্ষিত নিরক্ষর সবাকারই মুগ্ধ মনে জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়া উঠিল। এই যে নারী কোথা হইতে অকস্মাৎ খসিয়া পড়া উল্কার মত আসন্ন বিপৎপাতের মধ্যে অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া দিয়া, আবার ঠিক তেমনি নির্ভীক ও নির্ব্বিকার-ভাবে কোন দিকে দৃক্পাত পর্য্যন্ত না করিয়াই সোজা চলিয়া গেল, অগ্নি-শুদ্ধ নিখাদ স্বর্ণের মত, তাহার গৌরব-দৃপ্ত মূর্ত্তি স্বতঃই জনতার মস্তক নত করিয়া রাখিল, শ্রদ্ধা ও করুণায় নেত্র সজল করিয়া তুলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সরকার বিনয়ের উপর হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া লইলেন। বিনয়ের ব্যারিষ্টার প্রথমতঃ ইহাতে একটুখানি আপত্তি করিলেও 'কুমীরের সঙ্গে বাদ সাধিয়া জলে বাস করা নিরাপদ নহে' এই চলিত বাক্যের হিসাবে অগত্যাই চুপ করিয়া গেলেন। সন্দিগ্ধাবস্থায় মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ড বহন করাও ভাল, মর্য্যাদারও ইহাতে লাঘব ঘটিতেছে বলিয়া বিনয়েরও এরূপ মুক্তি বিশেষ রুচিকর হইল না।

সে যখন আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, বাহিরের জগৎ ঠিক সেই একই রকম চিরপরিচিত মূর্ত্তিতেই তাহাকে স্বাগত জানাইতেছে! কিন্তু এই স্বল্প কয়টি মাসের মধ্যেই ভিতরটা তাহার কি ভীষণভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল! যে বিনয় হরিণ-বাড়ীর জেলের মধ্যে তিন মাস পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বিনয়—সেই জীবনী-স্রোতে পরিপূর্ণ চঞ্চল ও আনন্দময় কিশোর বিনয় আজ আর সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিল না—আজ যে আসিল, সে চিন্তাশীল, সংসারাভিজ্ঞ, জীবন-স্রোতোহত গম্ভীর প্রকৃতির পরিণত বুদ্ধি যুবক বিনয়কুমার।

বাহিরে সাম্‌নেই সেই অপরিচিত 'সিনিয়র' ব্যারিষ্টারটী কতকটা উৎসুক হইয়াই কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিনয় সম্মুখীন হইয়া দুই হাত ললাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে উদ্যত হইতেই তিনি তাহার সেই দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্য-মুখে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহ অলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—"বল্‌তো বিনু! আমি কে?"

বিনয় নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিয়া তাহার কপালে-পড়া রুক্ষ ও দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ সযত্নে সরাইয়া দিয়া স্নেহ-গভীর-কণ্ঠে তাহার বিস্ময়-নির্ব্বাক্ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "আমার নাম অজয়কুমার শীল, আমি—"

"দাদা এসেছেন! তাই আপনার জন্যেই আমি মুক্তি পেলুম!"—বলিয়া বিনয় অকৃত্রিম ও অপরিসীম আনন্দে মগ্ন হইয়া তাহার সাহেবদাদাকে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিল।—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে কৃষ্ণার শেষ গৌরবটুকুও তাহার সমস্ত পূর্ব্ব স্মৃতির চিতাভস্মের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার দাদাই তাহা হইলে এই রহস্যের উদ্ঘাটনকর্ত্তা; এবং খুব সম্ভব যে তিনিই উহাকে কোনরূপে বাধ্য করিয়া ওই স্বীকারোক্তিটা করাইয়া লইয়াছেন!—

মনকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল—"মা'র কাছে গিয়েছিলেন?

অজয় কহিলেন "এতদিন পরে এসে মা'র কান্না সইতে পার্‌বো না বলে ভরসা করে যেতে পারিনি; আজ তোকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে যাব।"

"তবে চলুন।"—বলিয়া বিনয় অনেকখানি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াই দাদার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

রাস্তায় পূর্ব্বের মতই জনারণ্য; কর্ম্ম-কোলাহল,—সহস্র লোকের সহস্র প্রকারের উদ্দীপনা,, ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বের পদতলে দারিদ্রের মাৎসর্য্য ভাব যথাযথ একইরূপে প্রবাহিত।

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি, তার সমস্ত জানালাগুলা বন্ধ করা, কেবল একখানা ঝিলমিলি মাত্র একটুখানি ফাঁক, গেটের বাহিরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। তার কোচবাক্সে বিশ্রামশীল কোচ্‌ম্যানের পার্শ্বে যে দরওয়ানজাতীয় লোকটী বসিয়াছিল, তাহার প্রতি নজর পড়িতেই অজয় বিনয়ের কাণের কাছে ঈষৎ কুণ্ঠিত ও মৃদুস্বরে কহিল, "এই গাড়ীতে মিস্ মল্লিক রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না, বিনয়? তাঁর জন্যই তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে।"

যেদিকে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়াছিল, তার উল্টা দিকের ফুটপাথে বাহির হইয়া পড়িয়া বিনয় শুধু জবাব দিল, "দরকার নেই।"

* * * বাড়ীতে যোড়া সত্যনারায়ণের পূজা খুব ঘটা করিয়া হইতেছিল। ধামা ধামা ফেনি-বাতাসা ও সন্দেশ, চাঙ্গারি ভর্ত্তি পান সুপারি ও হলুদ। পূজার উপকরণ প্রকাণ্ড রূপার থালে থরে থরে সজ্জিত। ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে রাস্তা ও প্রতিবেশীদের গৃহ পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পাড়া ঝাঁটাইয়া সমস্ত হিন্দু মুসলমান (এই ব্রতের নিয়মানুসারেই) আজিকার এই শুভদিনের মঙ্গলোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া শীলেদের বাড়ীর মস্ত বড় অঙ্গনে আসিয়া চাঁদোয়ার নীচে বসিয়াছিল। সকলের জন্যই সন্দেশ বাতাসার হাঁড়ি ও বড় বড় গামলা-ভর্ত্তি কাঁচা সিন্নি নানাবিধ ফল-ফুলারির প্রসাদ বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়া আছে। ঠাকুরমহাশয় তখন পূজা সমাধা করিয়া পুঁথি হাতে ব্রত-কথা শুনাইতেছেন,—

"ফিরে এল পতিধন দুঃখ গেল দূর,
অতুল আনন্দ হৈল বিভব প্রচুর।—

বধূ ও জননীর ভক্তি-মুদিত চারি চক্ষু হইতে সুগভীর ও অসহনীয় আনন্দের অশ্রুজল এই পরম-কারুণিক দেবতার পায়ের অর্ঘ্যরূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের ভাষাহীন কৃতজ্ঞতার অফুরন্ত মৌনবাণী তাদেরই আনন্দ-সিন্ধু মন্থন করা বুকের মধ্য হইতে নীরবে উঠিয়া যেন তাঁহার সকল পূজার উপর দিয়া সুললিত ও সুরচিত স্তোত্র পাঠের ন্যায় অজস্র স্তুতির বাণীতে মুখর হইয়া উঠিল। যে আশা হতাশার সীমানাতেই আট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল, আজ শুধু সর্ব্বক্ষম-শক্তির সহায়তা-বলে তাহা বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে। ওগো দয়াময়! ওগো দয়াময়! এত দয়া তোমার?—তবু আমরা তোমার করুণায় সংশয় বোধ করিয়া দুঃখ পাই!

বাহিরের দিক্ হইতে একসঙ্গে যুগল শঙ্খধ্বনির মত, অনাবৃষ্টির আকাশে অপ্রত্যাশিত মেঘ গর্জ্জনের মত, প্রবাস-প্রবাসী এবং কারাগৃহ-বাসী যুগল সন্তানের চিরপরিচিত এবং বহুদিন অশ্রুত যুগলকণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল, "মা।"

সে রাত্রে বন্ধু পরিচিত ও আত্মীয়গণের স্নেহ-সাদরসম্ভাষণাদি হইতে অবসর পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে আসায় বিনয়ের অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। প্রায় মধ্যরাত্রে সে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘরের সমস্ত সাজসজ্জাই যথাপূর্ব্ব সজ্জিত ও সযত্ন সংন্যস্ত রহিয়াছে। টেবিলের উপর সেই তাহার ছেলেবেলার সাজান আগ্রার সাদা পাথরের কাগজ চাপা মোরাদাবাদী দোয়াতদান,—কাশীর পিতলের ফুলদানী সকলই সেই এক ভাবেই রহিয়াছে। অধিকন্তু সেগুলি সব ঝাড়ামোছা ও সুমার্জ্জিত এবং ফুলদানীতে একটি গুচ্ছ রজনীগন্ধা ঘরখানিতে অত্যন্ত মৃদু একটী সুরভি দান করিতেছিল।

বিনয় আসিয়া সেদিনকার সেই চেয়ারখানাতেই বসিয়া পড়িল। টেবিলে তেলের সেজ জ্বলিতেছে, দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া। তাহার আর এক রাত্রের কথা মনে পড়িল। সেই নিশীথ অভিসার—তাহার নিষ্ফল অভিমানে আজ যেন বিনয়ের চোখের সাম্‌নে চোখের জলে ভিজিয়া, নিবিড় লজ্জায়—রাঙ্গিয়া; নিজের সুপ্ত যৌবনের ব্যর্থ দিবসকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। উর্ম্মিলাকে যদি সে সেদিন নিজের কাছে টানিয়া লইতে পারিত, তবে হয়ত আর তার জীবনটা অত বড় বিড়ম্বনার পাকে জড়াইয়া পড়িত না, এবং সে জাল খুলিবার চেষ্টায়—যাক্ গতানুশোচনা সম্পূর্ণই নিরর্থক।

প্রতীক্ষা যখন অসহিষ্ণুতায় পরিণত হইয়া আসিল, তখন উঠিয়া আসিয়া বাহিরে পা দিতেই ঢাকা দালানের এক পাশ হইতে যেন একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাহত চাপা কান্নার গুম্‌রাণি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিত ও বিস্মিত হইয়া শব্দানুসরণে অগ্রসর হইতেই অস্ফুট নক্ষত্রালোকে একটা অর্দ্ধ-মলিন-বস্ত্রাবৃত মনুষ্যাকৃতি সে দেখিতে পাইল। মানুষটা তাহার সান্নিধ্য জানিতে পারিয়া কান্না চাপিতে চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; তাহা তাহার ফুলিয়া ফুলিয়া ও ফোঁপাইয়া ওঠা হইতেই সেই স্পষ্ট টের পাইল। এই নির্জ্জন নিশীথে একাকিনী বিবশা রোদনপরায়ণা ভূ-লুণ্ঠিতা নারীকে এক লহমার মধ্যে চিনিয়া লইয়াই তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, "উর্ম্মিলা!"—এবং জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল।

"ঊর্ম্মিলা!—ঊর্ম্মিলা!—আমি যে এতক্ষণ তোমাকেই খুঁজছিলুম। তুমি আমার কাছে গেলে না কেন?"

ঊর্ম্মিলা আবার অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ছাড়াইয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, কান্নাধরা ভগ্নকণ্ঠে কোনমতে কহিল, তবে কি আমায় তুমি এবারও ক্ষমা কর্‌বে? তবে কি আমায় তুমি এখনও দূর করে তাড়িয়ে দেবে না?"

বিনয়ের চোক দিয়াও জল পড়িল, সেও প্রায় রুদ্ধস্বরে উত্তর করিল, "তুমি তো দোষী নও ঊর্ম্মিলা!"

ঊর্ম্মিলা আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত করিয়াই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, "তুমি তাহলে জান্‌তে পেরেছ? আমি যে ইচ্ছা করে কিছুই করিনি,—বড্ড বোকা, আর বড্ড মুখ্যু বলে না বুঝে না জেনে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই যে করে ফেলেছিলুম, সেই দেবকন্যাটী কি সে কথা তোমার সব বুঝিয়ে দিয়েছেন? তা' হলে আর আমায় ঠেলে ফেলো না, আমায় তোমার ইচ্ছামত করে গড়ে নাও,—আমি এই দেখ, তোমার মতন মোটা কাপড় পরেছি, চরকা কিনেছি, পড়তে শিখ্‌ছি। আমাকে কি তুমি তোমার মনের মতন করে নেবে? তুমি যা কর্‌তে বল্‌বে, আমি সমস্ত শুন্‌বো।"

"আমিও সেই আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বন্ধু, প্রেয়সী, সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী একাধারে সবটুকুই আমি যেন এবার হতে তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারি। নিজের স্ত্রীকেই যদি না গড়ে নিতে পার্‌বো, তবে পরকে গঠিত কর্‌তে যাবো কোন্ মুখ নিয়ে?"

এই বলিয়া নূতন পাওয়া চির-পুরাতন জীবন-পথের সঙ্গিনীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বিনয় তাহার আনন্দাশ্রুসিক্ত গণ্ড ও ওষ্ঠ অজস্র আদরের চুম্বনে প্লাবিত করিয়া দিল।

* * * *

সকাল হবো হবো হইয়াছে, তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই—এমন সময় বিনয় আসিয়া একান্ত ধৈর্য্যহারা অসহিষ্ণুভাবে ঘুমন্ত অজয়ের পা ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ডাকিয়া উঠিল, "দাদা! ও দাদা!"

সদ্য নিদ্রাভঙ্গের স্খলিত-জড়িত-কণ্ঠে "উঁ?" করিয়া উত্তর দিয়া অজয় পাশ ফিরিয়া আর একবার নিদ্রা দিবার উপক্রম করিলেন।

"দাদা! মিস্-মল্লিককে আপনি কেমন করে খুঁজে পেলেন, আর ঐ চিঠির বিষয়ই বা জান্‌লেন কেমন করে বলুন ত?"

অজয় ততক্ষণে ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া আলস্য ভাঙ্গিতেছিলেন; ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিলেন, "মিস্ মল্লিককে আমি খুঁজে পেলুম, না তিনিই আমায় আবিষ্কার করে খুঁজে বার কর্‌লেন? কেমন করে তা' তিনিই জানেন। আমি তো এসে সরাসরি রামকৃষ্ণ-মিশনে ঢুকে পড়্‌বার মতলবে বেলুড় গিয়ে জুটেছিলুম, তোমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা কর্‌ছিল বলে।"

"তিনি নিজ হতেই কি তা' হ'লে ওই চিঠির কথা আপনাকে বলেছিলেন?"

"না, চিঠির কথা আমায় তিনি মোটেই বলেন নি, সবশুদ্ধ এই কথাই বলেন যে, বিনয়-বাবুকে যেমন করে হয় বাঁচাতেই হবে, তার জন্যে আমায় যা' ক'র্‌তে হবে আমি সমস্তই ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। আপনারা চেষ্টা করুন, নেহাৎ যদি না পারেন, আমায় তখন সাক্ষী মান্‌বেন,

শেষ উপায় আমার হাতে আছে। আমি সে উপায়টা কি, জান্‌তে চাইলে বললেন যে, এখন সেটা বল্‌বো না, কারণ নিতান্ত নিরুপায়ে একজন নির্দ্দোষীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যা' করতে প্রস্তুত হচ্চি, অপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়, যেহেতু যতই অন্যায়কারী হোন্, এতে যাঁ'কে অপদস্থ ক'র্‌তে হবে, এক সময় অনেক উপকারও তিনি আমাদের করেছেন। কিন্তু বিনয়—কাল তাঁর সম্বন্ধে তুমি একটু অবিচার করে এলে—ভাই! আমি শুনেছি, তোমার পক্ষাবলম্বন করার জন্য মিঃ লাহার কোপে পড়ে তিনি হৃত-সর্ব্বস্ব পিতৃহীন এবং অশেষ রকমে লাঞ্ছিতা হয়েছেন, তবু তাঁকে বিয়ে ক'র্‌তে কিছুতেই সম্মত হন্‌নি, এবং নিজের ও তাঁর সম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েও এই তো তোমার প্রাণরক্ষাও করলেন, দেখলে!"

বিনয়ের বক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল, সে বিষণ্ণ পাংশুমুখে ম্লানভাবে বলিতে গেল, "কিন্তু সেই চিঠিখানায়—"

অজয় স্থির-দৃষ্টি ভাইএর মুখে মেলিয়া ধরিয়া মৃদু-হাস্যে বাধা দিলেন, "চৌদ্দ বচ্ছর বারিষ্টারী করছি বিনয়! ও চিঠিখানা যে মিঃ লাহার 'চাল', সে তুমি ছেলে-মানুষ না বুঝ্‌তে পেরে থাক, আমার বুঝ্‌তে বাধেনি। কিন্তু ভাগ্যে ও রকম করে মিস্ মল্লিককে ভয় দেখাবার জন্যও সে ওই চিঠি লিখেছিল; না হলে তোমায় আজ ফিরিয়া আনে কার সাধ্য!"

* * * *

... ...লেনের একখানি অপরিসর ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ীর সাম্‌নে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর সদর দরজার দিকে চাহিতেই বিনয়ের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। দরজায় তালাবন্ধ!

পাশের ঘড়ির দোকানে একটি যুবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র-সাহায্যে পুরাতন ঘড়ি মেরামত করিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওই বাড়ীতে কে থাকেন বল্‌তে পারেন?"

ছেলেটি মুখ না তুলিয়াই ইহার উত্তরে বলিল, "থাক্‌তেন বটে, আপাতক কেউ ত থাকেন না।"

একটা অজানা আশঙ্কার ঢেউ বিনয়ের অনুতপ্ত-চিত্তে সহসা উত্তাল হইয়া দেখা দিল, তথাপি সে নিজের ভ্রম হওয়ার শেষ আশায় ঈষৎ আশ্বস্ত হইতে চাহিয়া পুনশ্চ এই প্রশ্ন করিল, "মিস্ মল্লিক কি ওই বাড়ীতেই থাক্‌তেন?"

ছেলেটী এবার নিজের কার্য্য-নিযুক্ত দৃষ্টি উঠাইয়া প্রশ্নকারীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল, এবং তারপর বিশদার্থপূর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, মিস্ মল্লিক ওই বাড়ীতেই থাক্‌তেন বটে;—ও বাড়ী আমার কাকার, তবে আজ ভোরেই তিনি বাড়ী-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। হাবড়া ষ্টেশনের পথে যেতে দেখেছি, তবে কোথায় যে যাবেন তা কারুকেই তিনি বলে যান্‌নি, তাই আমরা কেউই তা জানিনে।"

বিনয় হাতড়াইয়া একটা জানালার গরাদ চাপিয়া ধরিয়া চোক বুজিল। তারপর বহুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া সে অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্ফুট স্বরে যেন আত্মগতই উচ্চারণ করিল, "চলে গেছেন!! একাই গেছেন হয়ত!"

ছেলেটি তাহার এই মুহ্যমান ভাব দৃষ্টেও বিশেষ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, সে পুনরপি একটুখানি মুচকি, হাসি হাসিয়া—অজিজ্ঞাসিত স্বগতোক্তির, গায়েপড়া হইয়াই এই উত্তর দিল,

"একা নয়, সঙ্গে গেছে তার সেই পুরাণো দরোয়ানটা।—তা শুধু তিনি আপনাকে ফাঁকি . . নি। আপনার আগে আর একজন বাঙ্গালী-সাহেব একখানা টু-সীটারে করে এসে এম্নি ক.ই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তবে তিনি আপনার মতন হালছাড়া লোক নন্,—তখনই হাবড়া ষ্টেশনের দিকে মটর ছুটিয়ে দিলেন।"

শুনিয়াই বিনয় দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া একখানা চলন্ত ট্যাক্সির ড্রাইভারকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল।

রাস্তায় ফেরিওয়ালারা ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্র ফেরি করিতে করিতে হাঁকিতেছিল, "বিনয় শীলের রহস্যপূর্ণ মোকদ্দমার অদ্ভুত সমাধান! মিস্ মল্লিকের আশ্চর্য্য রহস্যভেদ!—যশোরের সেই স্বনামধন্য স্বদেশী-দলন মহামহিম-ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রবর মিঃ লাহার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ!"

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা......................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
[illegible]			
[illegible]			
৪.৭.[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফৎ নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃসৃত হইতে পারে।